কেন্দ্রীয় সম্মেলন

স্মারক

২০১৫



ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন



কেন্দ্রীয় সম্মেলন

স্মারক ২০১৫

ইসলামী
শাসনতন্ত্র
ছাত্র আন্দোলন



সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
মুহাম্মাদ আবদুর রহমান গিলমান

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মুহাম্মাদ ইলিয়াস

প্রকাশকাল
জানুয়ারি ২০১৫
রবিউস সানী ১৪৩৬
মাঘ ১৪২১

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
ইবরাহীম কোব্বাদী
আবিষ্কার, ঢাকা

শুভেচ্ছা বিনিময়
ষাট টাকা মাত্র

প্রকাশনায়
কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন
৫৫/বি পুরানা পল্টন [৩য় তলা]
ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৫৭১৩১
Web : www.iscabd.org



যেভাবে সাজানো

- বাণী
- সম্পাদকীয়
- উদ্বোধনী বক্তব্য
- ইসলামী খিলাফত কি ও কেন?
- খুলাফায়ে রাশেদীনের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস
- উমাইয়া খিলাফত : স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য
- স্পেনে মুসলিম শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
- আব্বাসিয়া খিলাফত
 ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়
- ইতিহাসের আলোকে ফাতিমী খিলাফত
- খিলাফতে উসমানিয়া
 ইতিকথার কয়েকটি ছেঁড়া পাতা
- ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিহাস
 পতনের কারণ ও সমকালীন ভাবনা
- শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. থেকে সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.
 যুগে যুগে মহামনীষীদের বিপ্লবী কর্মধারা
- সাবেক কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণের তালিকা

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর
মুহতারাম আমীর
মুফতী সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম
[পীর সাহেব চরমোনাই]-এর

বাণী

THE MESSAGE

আলহামদু লিআহলিহী ওয়াসসালাতু লি আহলিহা আম্মাবাদ।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া যে, প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আরও আনন্দিত হলাম, ইসলামী খিলাফতকে উপজিব্য করে কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক'১৫ প্রকাশিত হচ্ছে জেনে।

হামদ ও সালাতের পর, আজ অত্যন্ত আনন্দের সাথে বলতে হচ্ছে যে, ১৯৯১ সালে আল্লাহর কুতুব মরহুম সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. যে উদ্দেশ্য সামনে রেখে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আজ আমরা তার বাস্তবায়ন দেখছি। ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠায় তাঁর লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারাই ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছে প্রত্যেকেই ছাত্রদেরকে নিজেদের ক্ষমতায় আরোহনের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। বই খাতা কলমের পরিবর্তে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। যার ফলে লেখা পড়ার পরও তারা পশুর স্বভাব-চরিত্রে গড়ে উঠছে। তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। মিনি ক্যান্টনমেন্টে রূপান্তরিত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গন।

সর্বোপরি দেখা গেছে ছাত্ররা নীতি-নৈতিকতা হারিয়ে নিজেদের ইহ ও পরকালীন জীবন ধ্বংস করার খেলায় মেতে উঠেছে। জাতির ভবিষ্যত কর্ণধার ছাত্র সমাজের এই করুণ অবস্থা দেখেই মূলত মরহুম আল্লাহর কুতুব ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আল্লাহর কুতুবের সেই উদ্যোগের কারণেই ছাত্র রাজনীতির এই চরম অবক্ষয়ের মাঝেও ইশা ছাত্র আন্দোলন ছাত্র রাজনীতিতে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। সে ধারা রূহানিয়াত ও জিহাদের সমন্বিত ধারা। এজন্যই দেখা যায়, ছাত্র আন্দোলনের ছেলেরা গায়ে জোব্বা ও মাথায় পাগড়ি পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যাচ্ছে। সত্যান্বেষী ছাত্ররা আজ দলে দলে এদিকে ঝুঁকছে। অভিভাবক তার প্রিয় সন্তানকে এ কাফেলায় শরীক করাতে পেরে গর্ববোধ করেন। ছাত্র আন্দোলন প্রতিষ্ঠার তাঁর আরেকটি মৌলিক লক্ষ্য ছিল আগামী দিনের ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব সৃষ্টি করা। আলহামদুলিল্লাহ, ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে গড়ে ওঠা অনেকেই আজ বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আগামীতে এদের মাধ্যমেই এদেশে ইসলামী বিপ্লব হবে, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাত্রদের মেধা, শ্রম তাঁর দীনের জন্য কবুল করুন। আমাদের সবাইকে মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর দীনের সাথে সম্পৃক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন।

THE MESSAGE

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর
মহাসচিব
অধ্যক্ষ হাফেজ মাওলানা ইউনুছ আহমাদ-এর

বাণী

নাহমাদুহু ওয়া নাশকুরুহ, ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৫ উপলক্ষে স্মারক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে শত কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ছাত্রসমাজ আজ পথহারা। ব্যর্থ বস্তুবাদী রাজনীতির গ্যারাকলে পড়ে নষ্ট হচ্ছে তাদের জীবন-যৌবন, হারিয়ে ফেলছে তাদের জীবনের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। ফলে ছাত্র রাজনীতি এখন পরিণত হয়েছে আতংকের বিষয়ে। প্রায়ই শোনা যায় ছাত্র রাজনীতি বন্ধের দাবী তোলা হচ্ছে। কিন্তু আঙ্গুলে বিষফোঁড়া হলে সমগ্র হাত কেটে ফেলা যেমন বোকামী, ছাত্রদের আদর্শের পথে আনার চিন্তা না করে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়াও তেমনই বোকামি। আমি মনে করি এ সমস্ত দাবী যারা করেন তারা হয়তো না বুঝে করেন অথবা দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে মেধাহীন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র সমাজ সকল যুগেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ৫২-এর ভাষা আন্দোলন, ৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনসহ সকল আন্দোলনেই দেখা গেছে ছাত্রদের সরব উপস্থিতি। তারপরও ছাত্র রাজনীতির বর্তমান দূরাবস্থার একমাত্র কারণ আদর্শহীন বস্তুবাদী রাজনীতি। যারা ছাত্রদের হাতে তুলে দিচ্ছে বই-খাতার পরিবর্তে অস্ত্র, অবৈধ অর্থ।

এমনই এক প্রেক্ষাপটে ১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের জন্ম। নৈতিকতা বিবর্জিত মেধাহীন ছাত্র রাজনীতির ধ্বংসস্তুপ থেকে ইশা ছাত্র আন্দোলন আদর্শের আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দৃঢ়পদে। বাতিলের প্রাসাদে চূড়ান্ত আঘাত হানার প্রস্তুতি দেখে আমি ছাত্র আন্দোলনের প্রতি আশান্বিত। তার প্রমাণ তারা ইতোমধ্যেই দিয়েছে। ২০০২ সালে ঢাকার বায়তুল আজিম শহীদী মসজিদ রক্ষার্থে ৪জন শাহাদাত বরণ করেছে, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে বোরকা নিষিদ্ধের প্রতিবাদে আন্দোলনের ফলে ছাত্রীরা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে। শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলন, সরকারের পর্দা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি বৈষম্যের প্রতিবাদ, প্রতিটি জায়গায় তাদের বলিষ্ঠ পদচারণা আমরা দেখেছি। একটি দোয়াই শুধু তাদের জন্য, আল্লাহ তা'আলা তাদের মনজিলে মকসুদে পৌঁছে দিন। আমিন।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর
কেন্দ্রীয় ছাত্র ও যুব বিষয়ক সম্পাদক
মুফতী সৈয়দ এসহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের
-এর

বাণী

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। ওয়াল আকিবাতু লিলমুত্তাকীন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সায়্যিদিল মুরসালীন।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন-২০১৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ অগ্রণীভূমিকা পালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে ছাত্রসমাজের ভূমিকাই সবচে' বেশী। কালের স্মারকে সে সব ঘটনা আজও অম্লীন হয়ে আছে। ইশা ছাত্র আন্দোলন-এর জন্মও হয়েছে সে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ছাত্র আন্দোলন সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মোকাবিলায় মর্দে মুজাহিদের ভূমিকা নিয়ে ময়দানে দূর্বার আন্দোলন করে যাচ্ছে। যার বাস্তব প্রমাণ ঢাকার মালিবাগে মসজিদ রক্ষার আন্দোলনে যে চার জন শাহাদাৎ বরণ করেছে তন্মধ্যে তিন জনই ছাত্র আন্দোলনের নির্ভীক সৈনিক। আশাকরি ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা অতীতের ন্যায় আগামী দিনেও এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসহ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার যে কোন আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর নেতৃত্বে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে, ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় সম্মেলন'১৫ সুন্দর ও সার্থক হোক, মহান আল্লাহর দরবারে এটাই একান্তভাবে কামনা করছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমীন।

THE MESSAGE

EDITORIAL
সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

১৯৯১ সালের ২৩ আগস্ট। বাংলার ইতিহাসে একটি শুভ দিন। সেদিন বাংলার সূর্য উদয় হয়েছিল এক নতুন বার্তা নিয়ে। ক্যাডারনির্ভর ছাত্র রাজনীতির আস্তানাকে গুড়িয়ে দিতে, ক্ষমতালিপ্সুদের অপব্যবহার থেকে ছাত্রসমাজকে মুক্ত করতে, তাগুতের খোলসমুক্ত একটি একত্ববাদী ও নববী আদর্শের পতাকাবাহী সংগ্রামী কাফেলা সৃষ্টি করতে, জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য মানবতাবাদী একদল তারুণ্য উপহার দিতে, সেদিন প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সত্যসন্ধানী ও সত্য প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত তারুণ্যের শ্রেষ্ঠ আবাসন ও শেষ ঠিকানা 'ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন'।

সূচনা থেকেই এ কাফেলা সাহাবায়ে কিরামের অনুসৃত পথে, আল্লাহর ফয়সালায় পরিপূর্ণ সমর্পিত হয়ে, অনুকূল-প্রতিকূল সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহর হুকুম পালনে তৎপর থেকে, পাহাড়সম ধৈর্য ও সহনশীলতা বুকে ধারণ করে, জ্ঞানার্জনে উৎসর্গীত হয়ে, রাতে জায়নামাজে দাঁড়িয়ে রুকু-সিজদা ও মুনাজাতে, আর দিনে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জানবাজীতে পথ চলছে অবিরাম।

দীর্ঘ দু'যুগ সময়ে এ কাফেলা প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির কলুষমুক্ত থাকার গৌরব অর্জন করেছে। দেশব্যাপী জ্যোতির্ময় আত্মা, দৃঢ়চেতা মন, দুঃসাহসী এক নূরাণী কাফেলা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

এই কাফেলা এখন ক্ষমতাপূজারীদের তখত-তাউসের জন্য বড় হুমকি। কারণ, এরা উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করছে যাবতীয় আরাম-আয়েশ, সম্পদ ও সম্ভোগকে। অত্যাচারী শাসকের মুখের ওপর এরা হক্ব কথা বলছে নির্দিধায়।

এ পথে চলতে গিয়ে তারা উপেক্ষা করছে মুনাফিকিয়্যাতের খলচাতুরী, ফেরাউনিয়্যাতের ঔদ্ধত্য-অহংকার, নমরুদিয়্যাতের রক্তচক্ষু আর কারুনিয়্যাতের মোহ ও প্রলোভন।

কাফেলার যাত্রীরা রচনা করেছে জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়নভোগের এক বিষণ্নময় ইতিহাস। অবশ্য ছাত্র আন্দোলনের এই বটবৃক্ষকে তার লালনকারীরা বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে সিঞ্চিত করেছে আরও আগে। এখন এই বৃক্ষ বাংলার ৫৬ হাজার বর্গমাইলে মজবুত শিকড় গাঁড়তে সক্ষম হয়েছে। কোন সে আবু জাহাল-আবু লাহাবের প্রেতাত্মারা এই বটবৃক্ষকে উপড়ে ফেলতে সক্ষম হবে?

না; কেউ পারবে না এর একটি তাজা পাতাও ছিঁড়তে। উত্তপ্ত রাজনীতির তাপদাহে জ্বলে পুড়ে দিশেহারা তারুণ্য এখন এর ছায়াতলে আশ্রয় নিচ্ছে।

কাফেলার সহযাত্রী বন্ধুরা! আমাদের পথচলা কিন্তু এখনও শেষ নয়। আমাদেরকেতো এগিয়ে যেতে হবে আরও বহু দূর-দুরান্তে। আমাদের লক্ষ্যতো তাগুতী শাসনব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ইসলামী হুকুমত তথা খিলাফত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর জমীনে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ দীনের বাস্তবায়ন।

বন্ধু! খিলাফত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমে খিলাফতের গৌরবময় ইতিহাস জানতে হবে। আজকের মুসলিম উম্মাহ ভুলতে বসেছে তাদের পূর্বসূরীদের গৌরবগাঁথা ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সুমহান কীর্তি। যে কারণে তারা হারিয়ে ফেলেছে বুলন্দ হিম্মত ও উন্নত মনোবল।

খিলাফতে রাশেদার ইতিহাসেতো তারা পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করেছিল। রাষ্ট্রময় প্রতিষ্ঠা করেছিল সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা। নিশ্চিত করেছিল মানুষের মৌলিক অধিকার। শুধু

মানুষ নয়, হিংস্র প্রাণীরাও উপকৃত হয়েছিল তাঁদের ইনসাফপূর্ণ শাসন দ্বারা। তাইতো হযরত ওমর ফারুক রা. বলেছিলেন, 'যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি উট না খেয়ে মারা যায়, আমি ওমর ভয় করি-এর জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কিনা'? খিলাফতে উমাইয়া, খিলাফতে আব্বাসীয়া ইসলামী শাসনেরই ইতিহাস বহন করে। এক সময় মুসলমানরা গোটা বিশ্বকে জয় করেছিল। ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়েছিল মুসলিম মুজাহিদরাই। আজকের এই স্পেন মুসলমানদের রাষ্ট্র ছিল। স্পেনে আটশত বছর শাসন করেছিল মুসলিম খলীফাগণ। কার্ডোবা, গ্রানাডাসহ বিভিন্ন নগরীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বড় বড় মসজিদ, পাঠশালা। সেখানে বসে আলেমরা কুরআন-হাদীসের দরস দিতেন। প্রতিটি মসজিদে মসজিদে তাফসীরের বড় বড় কিতাব রচিত হয়েছে। তাফসীরে কুরতুবীর মত ৩০ খণ্ডের বিশাল তাফসীরগ্রন্থ স্পেনের মাটিতে রচিত হয়েছিল। বর্তমানের হোয়াইট হাউজের মত বিশাল রাজকীয় প্রাসাদ ছিল 'আল হামরা'। ভারতবর্ষে মুসলমানরা শত শত বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেছিল।

তবে কেন সে ইসলামী শাসনের পতন হলো? মুসলমানদের গৌরবগাঁথা ঐতিহ্য ধুলোয় মিশে গেল? এর কারণগুলো আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে পথচলা সহজ হবে। লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। আজকে অশান্তির দানাবলে জ্বলে পুড়ে ভস্মিত এ পৃথিবীতে শান্তির সুবাতাস বয়ে দিতে, জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশায় নিমজ্জিত এ ধরণীতে ইসলামিয়াতের সূর্যের উদয়ন ঘটাতে, আবার খিলাফত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য দাবী বাস্তবায়নের চেষ্টা আমাদেরকেই করতে হবে।

তোমরাই বল বন্ধু! আমরা যদি এ পথে এগিয়ে না আসি, কঠিন সংগ্রাম ও সাধনা না করি, তাহলে আর্তমানবতার পাশে কে দাঁড়াবে? 'মা-আনা আলাইহি ওয়া আসহাবিহী'র পূর্ণ অনুসারী কে হবে?

'আ-ইয়ানকুসুদ্দীন ওয়া আনা হাইয়ুন'এর শ্লোগান কে দেবে?

এসব প্রয়োজনীয়তাকে সম্মুখে রেখেই এবারের কেন্দ্রীয় সম্মেলন স্মারক ২০১৫ এর বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে ইসলামী খিলাফত। খিলাফতে রাশেদা থেকে নিয়ে বর্তমান সময় পর্যন্ত যুগে যুগে ইসলামী ইসলামী খিলাফিত, মুসলিম শাসন ও ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় আকাবিরদের কর্মতৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসের জন্য যেখানে বিশালাকার চৌদ্দটি গ্রন্থাগারও যথেষ্ট নয়, সেখানে চৌদ্দ ফর্মার চেয়েও কম কাগজে এই বিস্তৃত ইতিহাস লেখা আসলেই অসম্ভব। তারপরও খিলাফতপ্রত্যাশী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য শুধুমাত্র তার নির্যাস অংশটুকু তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। স্মারক প্রকাশে সর্বপ্রথম শুকরিয়া আদায় করছি মহান রাব্বুল আলামীনের- যার রহমতের বারিধারা বর্ষণ না হলে তা কোনভাবেই সম্ভব হতো না। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি লেখকগণের- যারা তাদের মূল্যবান সময় কুরবানী করে লেখা দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি স্নেহাস্পদ নূরুল করীম আকরাম ও নিজামুদ্দীন আল গাজীর- তাদের আন্তরিক সহযোগিতা না পেলে স্মারক হয়তো আলোর মুখ দেখতো না। এ ছাড়াও যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, সকলের জন্য আল্লাহ তাআ'লার দরবারে উত্তম প্রতিদানের দোআ' করছি। সময়ের স্বল্পতা ও জ্ঞানের অপর্যাপ্ততার কারণে সম্পাদনার পুরোপুরি হক আদায় করতে পারি নি। তাই বিজ্ঞ পাঠকের নিকট পাঠান্তে ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হওয়ার পর ক্ষমাসুলোভ দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। যেহেতু ইতিহাসের স্মারক, তাই মৌলিক কোন তথ্যবিভ্রাট হলে তা জানিয়ে দেওয়ার আহ্বান থাকলো। আল্লাহ তাআ'লা এই স্মারককে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশীদের জন্য পাথেয় হিসেবে কবুল করুন।

-মুহাম্মাদ আবদুর রহমান গিলমান

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের
কেন্দ্রীয় সম্মেলন'২০১৫-এ
কেন্দ্রীয় সভাপতি

মুহা. আরিফুল ইসলাম প্রদত্ত

উদ্বোধনী বক্তব্য

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়িদিল মুরসালিন, ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বা'দ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন 'নিশ্চই আমি মু'মিনদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছি জান্নাতের বিনিময়ে'। (আল-কুরআন)

মেধাবী ছাত্রদের প্রিয় সংগঠন, শান্তিকামী মুক্তিপাগল ছাত্র বন্ধুদের একান্ত ঠিকানা, নির্যাতিত নিপীড়িত ছাত্র ভাইদের আস্থার প্রতিক, এশিয়া মহাদেশের ইসলামী ধারার সর্ববৃহৎ ইসলামী ছাত্র সংগঠন, এ দেশের ইসলামী সহীহ ধারার সর্ববৃহৎ ছাত্র সংগঠন, বিপ্লবকামী শহীদী কাফেলা ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত কাজী বশির মিলনায়তনে কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৫ এর-এর মুহতারাম প্রধান অতিথি, শাষিত-বঞ্চিত মানুষের একান্ত আপনজন, গরীবদুঃখী মেহনতী মানুষের আস্থাভাজন, নির্যাতিত-নিপীড়িত মজলুম মানুষের একান্ত বন্ধু, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে টিপাইমুখ অভিমুখে ঐতিহাসিক লংমার্চের নেতৃত্ব দানকারী অবিসংবাদিত নেতা, মুসলিম জনতার ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক রাহবার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের বিপ্লবী আমীর, আলহাজ্ব হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই), মুয়াজ্জাজ ওলামায়ে কেরাম, বরেণ্য শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, কেন্দ্রীয় ও জাতীয় নেতৃবৃন্দ, জাতির মুখপাত্র সাংবাদিক বন্ধুগণ, আইন-শৃঙ্খলায় নিয়োজিত প্রশাসনের ভাইয়েরা, সম্মানিত সুধিমণ্ডলী, সারাদেশ থেকে আগত ইসলাম, জাতি ও দেশ রক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ বিপ্লবী সহযোদ্ধা ছাত্র বন্ধুগণ! জালিম শাহীর বন্দিশালা থেকে মুক্তি পেয়ে শত প্রতিকূলতা, সীমাবদ্ধতা ও ঝঞ্ঝার মাঝেও কেন্দ্রীয় সম্মেলনের আয়োজন করতে পেরে রাব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি, আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম প্রেরণ করছি, মানবতার মুক্তির দিশারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি।

সহযোদ্ধা সাথী ও বন্ধুগণ!

সম্মেলনের উদ্বোধনী মুহূর্তে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি আমাদের প্রাণপ্রিয় রাহবার, এ দেশে ইসলামী রাজনীতির প্রাণপুরুষ, কুতুবুল আলম, মরহুম হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ফজলুল করীম রহ. কে, আল্লাহ তা'য়ালা তাকে মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। এছাড়াও যুগ যুগ ধরে যারা দীনের পতাকাকে উড্ডীন

করতে জীবনের সর্বোচ্চ ত্যাগ করে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন তাঁদেরকে জান্নাতের উচ্চাসন দান করুন। বিশেষ করে যারা আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করতে গিয়ে হাসিমুখে অমূল্য সম্পদ জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তা'য়ালা তাদের যথাযথ প্রতিদান দিন। এ মুহূর্তে স্মরণ করছি ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের সে সকল সৌভাগ্যবান ভাইদের, যারা দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ বিলিয়ে দিয়ে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন। সাথে সাথে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের যে সকল ভাই জালিমের জুলুমের শিকার হয়েছেন তাদের প্রতি জানাচ্ছি সংগ্রামী অভিনন্দন।

স্বাধীনতাকামী ভাই ও বন্ধুগণ!

আমরা স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী। অন্যায়-অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন, টেন্ডারবাজ-চাঁদাবাজ এবং দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম সর্বদা ও সর্বত্র। দুর্নীতি, দুঃশাসন, লুটেরা ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার। মাতৃভূমির মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষায় আমরা সদা জাগরুক। সন্ত্রাসবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধে আমরা প্রচণ্ড বিদ্রোহী। দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষায় আমরা আপোষহীন। আমরা চাই হৃদয় নিংড়ানো স্নেহ-মমতার মাধ্যমে তরুণ ও যুবসমাজকে ধ্বংসের করালগ্রাস থেকে মুক্ত করে আলোকিত মানুষে রূপান্তরিত করতে। জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের সুমহান পথে পরিচালিত করতে। আমরা চাই তাদেরকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে। আমরা আদর্শ ও দক্ষ জাতি গঠনে চাই বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মমূখী সর্বজনীন ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা। তরুণ ও যুব সমাজের মাঝে দেশাত্মবোধ ও ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত করে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিতে। আমরা চাই সুদক্ষ শিক্ষিত জাতি, সুষম অর্থনীতি ও সুখী-সমৃদ্ধশালী কল্যাণময় রাষ্ট্র গঠন করতে।

সংগ্রামী সাথী!

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ইসলামই একমাত্র ইহলৌকিক শান্তি ও পরলৌকিক মুক্তির পথ। এ পথে চলাই আমাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। কোন অপশক্তি আমাদের সে সুমহান পথ থেকে সামান্যতম বিচ্যুত করতে পারবে না। আমরা কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তোয়াক্কা করিনা। আমরা কোনো জালিম শাহীর রক্ত চক্ষু, হামলা-মামলা আর বাতিলের জিন্দানখানার পরোয়া করি না। শিরক, বিদয়াত, মওদুদীবাদ নাস্তিক্যবাদ ও ইসলামের নামে কোন ভণ্ডামী বরদাস্ত করা হবে না। ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থানকারী সকল অপশক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলছি, ৯২ ভাগ মুসলমানদের দেশে, পীর আউলিয়ার এই পুণ্যভূমিতে সুমহান ইসলামের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করবেন না। অন্যথায় এদেশের মুসলমানরা আপনাদেরকে ঝেটিয়ে বিদায় করবে। ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের অগ্রযাত্রা দেখে যাদের গাত্র দাহ সৃষ্টি হয়, তাদেরকে লক্ষ করে বলছি, আমাদের অগ্রযাত্রাকে বাধা প্রদানের অপচেষ্টা করবেন না, এ পথ পরিহার করুন। আমরা দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করছি সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আদর্শবাহী সংগ্রামী বন্ধুগণ! ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন একটি বিপ্লবী

কাফেলার নাম, একটি আদর্শের নাম। আর এই আদর্শ হচ্ছে ইসলাম। ইসলাম ছাড়া আর কোন মতাদর্শই মানবতার মুক্তি দিতে পারে না। এ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্র আন্দোলনের অনেক ভাইকে জালিমের জুলুমের শিকার হতে হয়েছে, জালিমের জিন্দানখানায় বন্দি হতে হয়েছে। অনেকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ। এমনকি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করতে হয়েছে অনেককেই। তথাপিও তাঁরা ইসলামের সুমহান আদর্শের পথ থেকে পিছপা হননি। তাই আমাদেরকেও মনে রাখতে হবে, ইসলামী আদর্শ প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যত বাধা আসুক না কেন, অত্যাচার নির্যাতন সইতে হোক না কেন, কারাবরণ করতে হোক না কেন, রক্ত আর জীবনের প্রয়োজন হোক না কেন, আমরা এ পথ থেকে কিঞ্চিতও সরে আসব না ইনশাআল্লাহ। হক-বাতিলের সংঘাত চিরন্তন। ছাত্র আন্দোলনের সাথেও বাতিলের সংঘাত শুরু থেকেই চলে আসছে। যেকোন প্রকার অন্যায় অবিচার, জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন সদা সোচ্চার। ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে : প্রচলিত ছাত্র রাজনীতি নয়, বরং আমরে বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের ঈমানী দায়িত্ব পালনের একটি প্রক্রিয়া। অতএব আমাদের কাজ হচ্ছে, যে সকল ছাত্র বন্ধুগণ কালের আবর্তে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে, সে সকল ছাত্রবন্ধুদেরকে সঠিক পথে তথা জান্নাতের পথে উঠিয়ে দেয়া। সাথে সাথে যে বা যারা ছাত্র, তরুণ ও যুব সমাজকে ইসলামী আদর্শের পথ থেকে সরিয়ে রাখতে চায়, তাদের সকল অপতৎপরতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ! আমাদের এ প্রিয়মাতৃভূমিতে যখন ইসলামের পতাকা উড্ডীন করতে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, ঠিক সে সময় ঠিকানাহীন ভাসমান কিছু নাস্তিকের পরামর্শে সংবিধানের মূলনীতি থেকে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস উঠিয়ে দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে। যা কখনোই একজন মুসলমান মেনে নিতে পারে না। আমি সরকার বাহাদুরকে বলছি, সংবিধানের মূলনীতিতে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস পুনঃস্থাপন করুন। অন্যথায় মুসলিম জাতি আপনাদেরকে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে। আজ ছিন্নমূল কিছু নাস্তিকরা আমাদের প্রিয় এ দেশ থেকে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা নাস্তিক-মুরতাদদের সাবধান করে দিচ্ছি- ইসলামী রাজনীতি নিয়ে সামান্যতম নাক গলাবার চেষ্টা করবেন না। অন্যথায় এ দেশের তাওহীদী ছাত্র-জনতাকে সাথে নিয়ে দূর্বার গণআন্দোলনের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেশ ছাড়া করা হবে। বন্ধুগণ, এ অবস্থায় আমাদের বসে থাকার সময় নেই। ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলার জমিনে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন এক ঝাঁক সৎ, যোগ্য, আত্মবিশ্বাসী ও খোদাভীরু, মেধাবী নেতৃত্ব। যারা ঈমানের বলে বলিয়ান হয়ে দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠাই জীবনের লক্ষ্য হিসেবে বেছে নেবে। আমরা সাহাবায়ে কেরামদের সোনালী জীবনের ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো যে, দীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র মিশন ও ভিশন। এটিই ছিল তাঁদের মৌলিক কাজ। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁরা বিশ্বব্যাপী দীনের দাওয়াত পৌঁছে দিতে পেরেছেন। শুধু তাই

নয়; বিশাল এক ভুখণ্ডে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও যদি ইসলামকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করতে জীবনের মূল লক্ষ্য বানাতে পারি তাহলে আমাদের মাধ্যমে অচিরেই ইসলামের সোনালী সূর্য আবারও উদিত হবে ইনশাআল্লাহ।

দেশ ও জাতির কর্ণধার ছাত্র বন্ধুগণ!

আমাদের সোনার বাংলাদেশ আজ রক্ত আর লাশের বাংলাদেশ হিসেবে বিশ্বের কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। রক্ত আর রক্ত, লাশ আর লাশ। প্রতিদিন রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে মাতৃভূমি। পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাই লাশের স্তূপ। যা দেখে একজন মানুষ স্থির থাকতে পারে না। শরীর শিউরে উঠে! এসবের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে গুম, ধর্ষণ, ছিনতাই, যানবাহন আর বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ। স্বজন, সম্পদ আর সম্বল হারানোর কান্নায় আজ বাংলার আকাশ ভারি হয়ে উঠেছে। এসব কিছু দেখে মনে হয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি যেন আজ এক মৃত্যুকুপ, যা খুনীদের দখলে। সম্প্রতি নারায়ণগঞ্জের সাত খুন বাংলার ইতিহাসে এক অন্যতম কালো অধ্যায়। যা বিশ্বের বিবেকের বিবেচনায় আইন শৃংখলার অন্যতম পদস্খলন। বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার গলাবাজি স্লোগানে ব্যস্ত। অথচ সরকারের অপব্যবস্থাপনা ও এনালগ পদ্ধতির কারণে সম্প্রতি ঢাকার শাহজাহান পুরে ঝরে গেল এক ফুট ফুটে জিহাদের নিস্পাপ প্রাণ। এতে করে প্রমাণিত হলো সরকারের ডিজিটালের স্লোগান জাতির সাথে এক চরম প্রতারণা। অন্যদিকে চলছে মাদকের ছড়াছড়ি যা এখন সহজলভ্য। আমাদের দেশের পাশ্ববর্তী রাষ্ট্রীয় সিমান্তগুলি আজ মাদকের আর অস্ত্রের খোলাবাজার। শিশু থেকে নিয়ে মন্ত্রী পর্যন্ত এ পাগল নেশায় মেতে উঠেছে। মাদক সমাজে আজ মহামারি আকার ধারণ করেছে।

ইসলাম প্রিয় ছাত্র বন্ধুগণ!

আজ দেশে দুর্নীতির মহাবাণিজ্য চলছে। সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে দূর্নীতি আজ জেকে বসেছে। বিশেষ করে বিগত সরকারের আমলে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা অনেক মন্ত্রী, এমপি দুর্নীতি করে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে দেয়া হলফনামায় তার সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে নতুন মন্ত্রি পরিষদে তাদের স্থান হয়নি। পদ্মা সেতুর দুর্নীতি নিয়ে যখন আলোচনা হচ্ছিল তখন বর্তমান মহামান্য রাষ্ট্রপতি তৎকালীন স্পিকার থাকা অবস্থায় বলেছিলেন, প্রতিবছর দেশে যে পরিমাণ দুর্নীতি হয় তার অর্থ দিয়ে একটি করে পদ্মা সেতু তৈরি করা যায়। এই দুর্নীতি বন্ধ করে নীতি ও আদর্শের শাসন দেশকে সুখী সমৃদ্ধ ও কল্যাণময় রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে ইসলামী অনুশাসনের কোন বিকল্প নেই। আজ মনে পড়ে যায় সেই বিপ্লবী মহাপুরুষের কথা, যিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন 'শুধু নেতা নয় নীতিরও পরিবর্তন চাই'।

সচেতন ছাত্র বন্ধুগণ!

পৃথিবীতে মজলুম মানবতাকে মুক্তির দিশা দেখানোর জন্য অনেক তন্ত্র-মন্ত্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু কোন মতবাদই মানবতার কাঙ্ক্ষিত মুক্তি দিতে পারেনি। বরং একটি

নির্দিষ্ট সময় পর সে মতবাদ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। গণতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের গলায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নতুন সুর শোনা যাচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ছত্রছায়ায় আজ ধর্ম অবমাননাকারী নাস্তিকদের জন্ম হয়েছে। এদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সার্বিক সহযোগিতা করেছে সরকার। যার কারণে নাস্তিকরা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্ম অবমাননা করে যাচ্ছে অবলিলায়। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। বিগত চার দলীয় জোট তথা নামধারী ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের সময়ও এদেশে স্ব-ঘোষিত বেশ কিছু নাস্তিক ছিল, কিন্তু সরকার তাদের কোন বিচার করেনি এবং সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সংবিধানে কোন শাস্তির আইন পাশ করেনি। বর্তমান সরকারও সেই একই পথে হাটছে। এতে করে বুঝা যায়, বিএনপি ও আওয়ামীলীগ সরকার উভয়েই নাস্তিক-মুরতাদদের দোষর। বাংলাদেশে যদি কোন সম্মানিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মানহানিকর কথা বলায় শাস্তির বিধান থেকে থাকে, তাহলে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা এবং পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহি আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়, ইসলামের কোন বিধান নিয়ে কুমন্তব্য করে তার ব্যাপারে সংসদে কেন আইন পাস হবে না? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী! আজকে এ সম্মেলন থেকে ঘোষণা করছি, নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সংসদে সর্বোচ্চ শাস্তির আইন পাস করুন। অন্যথায় নাস্তিক মুরতাদদের দোষরদের শেষ রক্ষা হবে না ইনশাআল্লাহ।

সচেতন ছাত্র বন্ধুগণ!

বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির প্রসঙ্গ আসলেই একজন সচেতন নাগরিক, একজন সচেতন অভিভাবক আঁতকে ওঠেন। ছাত্র রাজনীতি শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে সবাই ধারণা করেন টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, মারামারি, হলদখল আর অস্ত্রের মহড়া। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের ত্রাস আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের নৈরাজ্যের কারণে- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বেশ কিছু বিদ্যাপীঠ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ ছিল এবং এখনও আছে। তারা মেতে উঠেছে রক্তের হোলি খেলায়। তাদের হাতে ঝড়ে গেছে বেশ ক'জন শিক্ষার্থীর প্রাণ। তাদের হাত থেকে নিস্তার পায়নি জাতির মেরুদণ্ড গঠনের সূদক্ষ কারিগর সম্মানিত শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলি, স্কুল থেকে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সর্বত্র চলছে ভর্তি বাণিজ্য। আর এদেরকে সার্বিক সহযোগীতা করছে ঐ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কিছু অসাধু শিক্ষক। গত একটি বছর ছিলো বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার এ যাবত কালের অন্যতম নৈতিক অবক্ষয়। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁশের মহা উৎসব চলছে। কালোবাজারে বিক্রি হয়েছে প্রশ্নপত্র। এতে করে শিক্ষার্থী বন্ধু এ অসাধু পথ বেছে নিয়ে নিজেকে করেছে জ্ঞানহীন। বিশেষ করে ২০১৪ সালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ডখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে কয়েকবার। আর তা পাওয়া গিয়েছে মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে। এর সাথে জড়িত শিক্ষামন্ত্রণালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজি প্রেসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী। তাই নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে গিয়েই ধ্বংস করা হয়েছে হাজার হাজার মেধাবী শিক্ষার্থীকে। ভর্তি হওয়ার সুন্দর পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এসমস্ত বিষয়গুলি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছি

এবং মনে করছি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত। আমরা সরকার বাহাদুর কে বলছি, এ সমস্ত বিষয়ের সাথে যে বা যারা জড়িত অবিলম্বে তাদেরকে গ্রেফতার করুন এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুন। অন্যথায় আমরা দেশের সকল মেধাবী ছাত্রদের দিয়ে এ সমস্ত সন্ত্রাসবাদ ও নকলবাজদের বিরুদ্ধে গন আন্দোলনের মাধ্যমে এদের কে শিক্ষাঙ্গন থেকে বিতাড়িত করব।

নবাগত ছাত্র বন্ধুগণ!

ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এর কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যোগদান করার জন্য আপনাদেরকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন এক তারুণ্য দীপ্ত দূরন্ত মিশনের নাম। ছাত্র আন্দোলন একটি আদর্শবাহী কাফেলা। যার কারণে ২৩টি বছর অতিক্রম করেছে কোন অপশক্তি ছাত্র আন্দোলনের গায়ে কালিমা লেপন করতে পারেনি। যেখানে ছাত্র রাজনীতির কথা শুনলেই অভিভাবক তার সন্তানকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন, সেখানে ছাত্র আন্দোলনের নীতি-নৈতিকতা, আর আদর্শ দেখে নিজ সন্তানকে হাত ধরে ছাত্র আন্দোলনে শরিক করিয়ে দিয়ে দুচোখের অশ্রু ফেলে আত্মতৃপ্তি পান, গৌরববোধ করেন। ইশা ছাত্র আন্দোলন কারও শত্রু নয় সকলের বন্ধু। তবে হ্যাঁ, যে বা যারা দেশ ও ইসলামের শত্রু আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহী। ইশা ছাত্র আন্দোলনের প্রত্যেকটি সদস্য, কর্মী ও মুবাল্লিগ এর কাছে এদেশের ষোল কোটি মানুষের জান ও মাল নিরাপদ, ইনশা আল্লাহ। আজ ছাত্র আন্দোলনের অগণিত ভাই এখান থেকে বিদায় নিয়ে দেশ বিদেশে ইসলামী আদর্শ ধরে তার কর্মজীবন চালিয়ে যাচ্ছেন। ইসলাম, দেশ ও জাতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। এর একমাত্র কারণ হলো এ সংগঠন সৃষ্টি হয়েছে দীনদার, আল্লাহওয়ালা, হক্কানী ওলামায়ে কেরামের পরামর্শে। বিশেষকরে এ সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল হযরত পীর হুজুর রহ. এর হাতে। যিনি সবসময়ই চাইতেন এমন একদল জানবাজ সাহসী কর্মী বাহিনী, যারা সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত পথে নিজের জীবনকে পরিচালিত করবে। তাঁর মাকসাদ ছিল একঝাঁক খোদাভীরু নেতৃত্ব তৈরি করা। ছাত্র আন্দোলন অদ্যাবধি সে কাজটি আঞ্জাম দেয়ার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্মেলনে আগত সকল নবাগত বন্ধুদেরকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, আসুন! সুশিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে আদর্শ নেতৃত্ব সৃষ্টি ও কল্যাণময় রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হই।

প্রিয় সহযোদ্ধা! আপনারা সকলেই অবগত আছেন, এই আওয়ামী সরকারের বিগত বছর ইসলাম, দেশ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের প্রতিবাদ করায় ছাত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলদের অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে যে অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আজও সেই নির্যাতনের কথা মনে পড়লে শরীর শিউরে উঠে। আমাদের গ্রেফতারসহ ছাত্র আন্দোলনের প্রতিটি ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতিতে আপনারা যে ভূমিকা রেখেছেন তা সত্যিকার অর্থে স্মরণ করার মত। শত প্রতিকূলতার মাঝেও আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজ সফলতা দিয়েছেন। তাই সমসাময়িক কোন সংকট ও প্রতিকূলতাই যেন আমাদের পথচলাকে কখনোই রুখতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বাধা আসলে সাহস,

ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে মোকাবেলা করতে হবে। আমরা যদি এভাবে এগিয়ে যাই আর মুহতারাম আমীরের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে পারি, তাহলে বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবেই ইনশাআল্লাহ।

সমবেত বন্ধুগণ!

ইশা ছাত্র আন্দোলনের এ মহান দাওয়াতকে পৌঁছে দিতে হবে দেশের সকল প্রতিষ্ঠানে। সকল ছাত্র জনতার কাছে। সর্বত্র গঠন করতে হবে মজবুত কমিটি। মনে রাখবেন, আমাদের এ প্রিয় সংগঠনটি যৌবনে পদার্পণ করেছে। প্রতি মুহূর্তেই এর আয়তন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামের শত্রুরা এ বৃদ্ধিকে মোটেও সহ্য করতে পারে না। আমাদের এই মজবুত ঐক্য তারা কোনভাবেই মেনে নিতে পারছে না। যুগে যুগে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর সহচররা সদা তৎপর ছিল এবং আছে। এদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে। এরা যেন কোনক্রমেই ছদ্মবেশে আমাদের মাঝে প্রবেশ করে আমাদের ঐক্যে চিড় ধরাতে না পারে। মনে রাখতে হবে এরা বহুরূপী। এদেরকে চিহ্নিত করা কঠিন। আমাদের হাজার কাজের মাঝেও এদেরকে চিহ্নিত করে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পরিশেষে সম্মেলনের সার্বিক সফলতার জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে সাহায্য কামনা করছি। সেই সাথে আবারও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আজকের এই সম্মেলনে আগত মেহমানদের প্রতি, যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও তাদের অত্যন্ত মূলবান সময় ব্যয় করে আমাদের দাওয়াতে সাড়া দিয়েছেন। অসংখ্য শুকরিয়া জানাই বিভিন্নভাবে যারা আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে শুভাকাঙ্ক্ষী সুধীদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বন্ধুগণ, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যবৃন্দের প্রতি। সম্মেলন প্রস্তুতির জন্য যে সকল সহকর্মী দায়িত্বশীল ভাইয়েরা রাত দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে এ সম্মেলনকে সার্থক ও সফল করতে ভূমিকা রেখেছেন আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আপনাদের স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণের জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে জানাই সংগ্রামী শুভেচ্ছা।

আজকের এ সম্মেলনকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দীন বিজয়ের পথে অন্যতম মাইলফলক হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

ইসলামী খিলাফত কি ও কেন?

মুহাম্মাদ আবদুর রহমান গিলমান

খিলাফত কি?

খিলাফত শব্দটি আরবী খুলুফুন শব্দ হতে নির্গত হয়েছে। যার অর্থ হচ্ছে, প্রতিনিধিত্ব করা, স্থলাভিষিক্ত হওয়া, অনুসরণকারী, কারও মৃত্যুর পর তার স্থানে উপবেশন ইত্যাদি।

A Modern Arabic Dictionaryতে খিলাফতের অর্থ বলা হয়েছে- Vicarship, Successionship,

ইমাম রাগিব ইস্পাহানী রহ. বলেন, খিলাফত হল কারও অনুপস্থিতিতে অন্য কোন ব্যক্তি তার প্রতিনিধিত্ব করা। চাই তার অনুপস্থিতি মৃত্যু, অপসারণ বা অন্য যে কোন কারণে হোক। যাকে প্রতিনিধি করা হয়েছে তাকে সম্মানিত করা উদ্দেশ্য। পারিভাষিকভাবে খিলাফত বলা হয়, ইসলামী সরকার পদ্ধতিকে, অর্থাৎ যে রাষ্ট্রের সকল নিয়ম-কানুন ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী হয় তাকে খিলাফত বলে। আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. খিলাফতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন, আল্লাহর মনোনীত দীন ইসলাম সংরক্ষণ, তা অনুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা। হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী রহ. বলেন, খিলাফত এমন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত বিধান ও রাসূল সা. প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হয়। সার্বিকভাবে বলতে গেলে, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তাকেই ইসলামী খিলাফত বলে।

খিলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মহান রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের প্রেরণের উদ্দেশ্য হল আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আর একারণেইতো আল্লাহ তা'আলা কুরআনুলকারীমে মানবজাতীকে খলীফা হিসেবে উল্লেখ করেছেণ। যেমন, 'যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদেরকে বলল, আমি দুনিয়াতে খলীফা (প্রতিনিধি) বানাতে যাচ্ছি'। সূরা বাকারা:৩০

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেহেতু সমস্ত নবী রাসূলকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে খলীফা হিসেবে প্রেরণ করেছেন, তাই এর দ্বারা বুঝা যায়, খিলাফতের গুরুত্ব কত অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনুল কারীমে উল্লেখ রয়েছে, 'তিনি সেই সত্বা যিনি তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়েত ও সত্যধর্ম সহকারে যাতে (রাসূলের সাথে প্রেরিত ধর্ম) সকল ধর্মের ওপর বিজয়ী হয়'। সূরা সফ:০৯

আর রাসূল সা. এর আনিত দীন (মতবাদ) সকল মতবাদের ওপর বিজয়ী থাকার অর্থ হল খিলাফত প্রতিষ্ঠা। অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, হে দাউদ! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে দুনিয়াতে খলীফা (প্রতিনিধি) হিসেবে পাঠিয়েছি। সূরা: সাদ: ২৬

খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কুরআনে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, অবশ্যই তাদেরকে পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদেরকে ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন'। সূরা নূর-৫৫

উপর্যুক্ত আয়াতে খিলাফতের গুরুত্বের কয়েকটি দিক ফুটে ওঠেছে।

(ক) আল্লাহ তা'আলা খিলাফত প্রদানের ওয়াদা করেছেন।

(খ) খিলাফতের মাধ্যমে দীনকে সুদৃঢ় করবেন।

(গ) খিলাফতের মাধ্যমে শান্তি দান করবেন।

এছাড়াও খিলাফতের প্রয়োজনীয়তার আরও কয়েকটি দিক হল– (১) আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি হিসেবে মানুষের দায়িত্ব পালনের জন্য খিলাফত প্রয়োজন। যেমন, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন'। সূরা আনআম: ১৬৫

(২) উম্মতের নেতৃত্বের জন্য খিলাফত প্রয়োজন। রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, 'বনী ইসরাঈলে আম্বিয়ায়ে কিরাম নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইন্তেকাল করতেন তখনই পরবর্তী নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী আসবেনা। তবে আমার পরে খলীফা হবে'। (বুখারী)

(৩) ইসলামী আইন বাস্তবায়ন। ইমাম গাযালী রহ. বলেন, 'স্বর্গীয় আইন বাস্তবায়নে খিলাফতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম'।

সর্বোপরি কথা হল, ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলে মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবে, সকলেই শান্তিতে বসবাস করবে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা থাকবে, যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু মানুষ নয়, ইসলামী খিলাফতের প্রভাব পড়বে হিংস্র প্রাণীর ওপরও। তারাও উপকৃত হবে এর থেকে। তাইতো হযরত ওমর ফারুক রা. বলেছিলেন, 'যদি ফোরাত নদীর তীরে একটি উট অনাহারে মারা যায়, তাহলে আমি ওমর ভয় করি, তার জন্য আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কিনা'? তাবাকাত ইবনে সা'দ খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-২৮৪

খিলাফতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানবজাতীর হেদায়েতের জন্য প্রত্যেক নবীর সাথে আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। সে হিসেবে আখেরী নবীর ওপর নাযিল করেছেন সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআনুল কারীম। রাসূলে আরাবী সা. তাঁর জীবদ্দশায় এই কুরআনুল কারীমের বিধান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। পরবর্তীতে যারা তাঁর খলীফা হয়েছেন তারাও সেই কুরআনের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ফলে বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে । উপর্যুক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, রাসূলে করীম সা. ও তাঁর পরবর্তী খলীফাগণ যে খিলাফত তথা ইসলামী

রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তার লক্ষ্য ছিল ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠা। তাই সংক্ষেপে খিলাফতের লক্ষ্য আমরা এভাবে বলতে পারি- 'আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে খিলাফতের দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন, তাই আল্লাহর দেওয়া সেই দায়িত্ব পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করাই হলো খিলাফতের উদ্দেশ্য।

খিলাফতের প্রকারভেদ

দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন মুহতামিম মাওলানা কারী তাইয়িব সাহেব রহ. খিলাফতকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে খিলাফত, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আম্বিয়া আ. এবং মানব জাতির ওপর যে খিলাফতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য। যেমন, সূরা বাকারা: ৩০ ও সূরা সাদ: ২৬ দ্রষ্টব্য

দুই. আম্বিয়া আ. এর পক্ষ হতে খিলাফত, অর্থাৎ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামগণের ইন্তেকালের পর যারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন তারা। এ সম্পর্কেও বুখারী শরীফের একটি হাদিস আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন, বনী ইসরাঈলে আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. নেতৃত্ব দিতেন। যখনই কোন নবী ইন্তেকাল করতেন তাঁর পরবর্তী নবী তাঁর স্থলাভিষিক্ত হতেন। কিন্তু আমার পরে আর কোন নবী আসবে না; বরং আমার পরে খলীফা হবে। বুখারী, হাদিস নং ৩৪৫৫

এছাড়াও শাহ ওয়ালী উল্লাহ রহ. খিলাফতের প্রকার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, খিলাফত দুই প্রকার, এক. আধ্যাত্মিক খিলাফত, দুই. জাগতিক খিলাফত। আধ্যাত্মিক খিলাফত হচ্ছে, তাসাউফের জগতে কোন হক্কানী পীর কর্তৃক তার মুরীদ বা অন্য কাউকে বাইআতের ইজাযত প্রদান। আর জাগতিক খিলাফত হল, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপ্রধানের স্থলাভিষিক্ত হওয়া।

খিলাফতের মূলনীতি

যে কয়টি মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হবে তা হল-

১। সার্বভৌমত্ব

অর্থাৎ-সুপ্রিম পাওয়ার বা সর্বোচ্চ ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার। কিয়ামতের দিবসে যেভাবে সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য থাকবে, ঠিক একইভাবে দুনিয়াতেও সর্বোচ্চ ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাই খিলাফত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সার্বভৌমত্ব বা সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ ছাড়া কারও নির্দেশ চলেনা'। সূরা ইউসুফ:৪০

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব তাঁরই | সূরা হাদীদ:২৫

২। মজলিসে শুরা কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা

মজলিসে শুরা বা পরামর্শ পরিষদই হল ইসলামী খিলাফতের মূল কেন্দ্রবিন্দু এবং এই থেকেই সমস্ত খিলাফত ব্যবস্থা পরিচালিত হয়। পরামর্শের মাধ্যমে ইসলামী খিলাফত পরিচালনা করতে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে কুরআনুল কারীম। রাসূলে কারীম সা. কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, 'আপনি কাজে কর্মে তাদের সাথে

(সাহাবায়ে কিরাম) পরামর্শ করুন'। সূরা আলে ইমরান:১৫৯
অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, '(ঈমানদার বান্দাগণ) পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করে'। সূরা শূরা:৩৮

৩। সুবিচার নিশ্চিত করা

এটি ইসলামী খিলাফতের অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর ওয়াস্তে ন্যায়সঙ্গত সাক্ষ্য দান কর, তাতে তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার অথবা নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যদি ক্ষতি হয় তবুও | সূরা নিসা:১৩৫
অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটাই খোদাভীতির অধিক নিকটবর্তী। সূরা মায়িদা:০৮
রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন ,বনী ইসরাঈল এজন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন উচ্চবংশীয় লোক চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত, যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তাহলে তার ওপর বিচার কার্যকর করত। আল্লাহর শপথ, যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমাও চুরি করত তাহলে তার হাতও কর্তন করা হতো। সহীহ বুখারী-হাদিস নং ৩৭৩২,৩৭৩৩

৪। মুমলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব তৈরি ও সসগ্র মানবজাতীর কল্যাণসাধন

ইসলামী খিলাফতের অন্যতম মূলনীতি হচ্ছে, মুসলমানদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা। সমগ্র মুসলিম জাতিকে এক দেহের ন্যায় তৈরি করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'মুমিনরাতো পরস্পর ভাই ভাই'। সূরা হুজরাত:১০
রাসূলে আরাবী সা. ইরশাদ করেন, 'সমগ্র মুসলিম জাতি এক দেহের ন্যায়। যদি কোন একটি অঙ্গে আঘাত আসে, তখন গোটা শরীর তার ব্যাথা অনুভব করে'। মুসলিম শরীফ

৫। কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা

ইসলামী খিলাফতের শাসনব্যবস্থা হবে কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক। সংবিধানসহ রাষ্ট্র পরিচালনার সকল নিয়ম-নীতি এর আলোকেই প্রণিত হবে।
তাইতো রাসূলে কারীম সা. বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছেন, তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি বস্তুকে আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। সেই দু'টি বস্তু হল - আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাত'।

৬। নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করণ

ইসলামী খিলাফতের অধীনে বসবাসরত সকল নাগরিকের সকল অধিকার নিশ্চিত করা রাষ্ট্র প্রধান তথা খলিফার অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য। সকল নাগরিকের জান-মাল ,ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তা, তাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। যেমন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও, আর যখন তোমরা মানুষের কোন বিচার মীমাংসা করতে আরম্ভ কর, তখন মীমাংসা কর ন্যায়ভিত্তিক। (সূরা নিসা :৫৮) উপর্যুক্ত আয়াতে আমানতের হুকুমটি যদিও ব্যাপক, কিন্তু অনেক মুফাসিসরীনে কিরাম এর দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক তার প্রজাদের অধিকার নিশ্চিত

করার কথা বলেছেন।

৭। যিম্মীদের অধিকার নিশ্চিত করা

যিম্মী বলা হয়- মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে। যেহেতু তারা জিযিয়া বা টেক্স প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রের বৈধ নাগরিক, তাই তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রুর হেফাজত করা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব। আইনের দৃষ্টিতে তাদেরকে সমান চোখে দেখতে হবে। অন্যায়ভাবে তাদের ওপর জুলুম-নির্যাতন বা তাদেরকে হত্যা করা যাবে না। রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন যিম্মীকে হত্যা করে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবেনা'। মিশকাত: পৃ: ২৯৯

অন্য এক হাদিসে ইরশাদ করেন, 'সাবধান! কেউ যদি কোন যিম্মীর প্রতি জুলুম করে অথবা তাকে তার অধিকার থেকে কম দেয় কিংবা সাধ্যের বহির্ভূত কোন কাজ তার ওপর চাপিয়ে দেয়, কেয়ামতের দিন আমি ঐ যিম্মীর পক্ষ নেব'। মিশকাত পৃ: ৩৫৪

৮। ঐক্যবদ্ধ জাতি ও বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হলে সমগ্র বিশ্ব ক্রমান্বয়ে ইসলামী খিলাফতের অন্তর্গত হবে এবং এক খলীফার অধীনে একই নীতিতে পরিচালিত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন, 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না'। সূরা আল ইমরান: ১০৩

উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হয় । তাহল গোটা বিশ্বে একই সময়ে একাধিক খলীফা থাকা যাবেনা। একজন খলীফার অধীনেই সমগ্র ইসলামী খিলাফত পরিচালিত হবে। এই বিষয়ে অধিকাংশ উলামায়ে কিরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে হুজুরে পাক সা. ইরশাদ করেন, যদি শরীয়ত সম্মত কোন খলীফা থাকা অবস্থায় অন্য কেউ খিলাফতের দাবী করে, সেক্ষেত্রে তাকে তিন দিন সময় দেওয়া হবে। যদি এর মাঝে সে পরিবর্তন না হয়, তখন তাকে হত্যা করা হবে। কারণ এর দ্বারা ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং এতে প্রচুর লোক নিহত হবে। হযরত আরফাজা রা. থেকে বর্ণিত আরেকটি হাদিসে হুজুর সা. ইরশাদ করেন, অচিরেই নানা প্রকার ফিৎনা ফাসাদের উদ্ভব হবে, যে ব্যক্তি সংঘবদ্ধ উম্মতের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রয়াস চালাবে, তরবারী দিয়ে তার গর্দান উড়িয়ে দিবে, চাই সে যে কেউ হোক না কেন। সহীহ মুসলিম হাদিস ন - ৪৬৪২

তবে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.- বলেছেন, যোগাযোগের দূরত্ব বা ভৌগলিক সমস্যার কারণে একাধিক খলীফা থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই দুই জায়গায় একই নিয়ম-কানুন থাকতে হবে এবং দুই খলীফার মাঝে সুসম্পর্ক থাকতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা বলা যায়, এশিয়া মহাদেশের কিছু রাষ্ট্র নিয়ে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হল, আবার ইউরুপ মহাদেশেও কিছু রাষ্ট্রে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা হল, আর এই দুজনের মাঝে অনেক শত্রু রাষ্ট্র রয়েছে, এমতাবস্থায় এই দুই মহাদেশে দুইজন খলীফা থাকতে পারে। এর মাধ্যমে ফিৎনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

৯। স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতিমুক্ত শাসন প্রতিষ্ঠা

এ প্রসঙ্গে রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের কোন কর্তৃত্বভার

লাভ করে কোন ব্যক্তিকে অনুরাগবশত বা আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে দায়িত্ব প্রদান করল, সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম জাতির প্রতি খিয়ানত করল। আস সিয়াসাতুশ শারঈয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ১৬

১০। দীন প্রতিষ্ঠা করা

রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে যেন পূর্ণাঙ্গ দীন প্রতিষ্ঠা হয় সে বিষয়ে ইসলামী খিলাফত সদা তৎপর থাকবে। পবিত্র কুরআনে কারীমে এ বিষয়ে ইরশাদ হচ্ছে, 'তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি সামর্থ দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। সূরা হজ্জ: ৪১

ইমাম, সুলতান, আমীর, খলীফা

ইসলামী খিলাফতের যিনি প্রধান থাকবে তাকে বলা হয় খলীফা। খলীফার পাশাপাশি আরও কয়েকটি শব্দ এক্ষত্রে ব্যবহার হয়। যেমন, আমীর, সুলতান ও ইমাম। যতদূর তাহকীক করা হয়েছে এর দ্বারা বুঝা যায়, এই শব্দগুলোর মাঝে যদিও অর্থগত পার্থক্য আছে কিন্তু উদ্দেশ্য এক। কুরআন ও হাদিসের আলোকে এটাই প্রতিয়মান হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের জন্য এক এক জায়গায় এক এক শব্দ ব্যবহার হয়েছে। যেমন, হযরত ওমর রা. নিঃসন্দেহে তিনি খলীফা ছিলেন। কিন্তু তাকে 'আমিরুল মু'মিনীন' বলা হত। খিলাফতে বনু উমাইয়া, আব্বাসিয়া ও উসমানিয়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানদেরকে খলীফা বলা হয়, এর মাঝে আবার দেখা গেছে হযরত মুআবিয়া রা. আমীর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। রাসুলুল্লাহ সা. এর যুগেও আমীর শব্দ ব্যবহার হতো, তবে তা রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নয়; বরং যুদ্ধের সেনাপতির জন্য। যেমন হাদিসে বর্ণিত রয়েছে- 'যে আমীরের অনুসরণ করল সে যেন আমার অনুসরণ করল'। এ হল খলীফা ও আমীরের সম্পর্ক। সুলতান শব্দটিও খলীফার স্থলে ব্যবহার দেখা যায়। যেমন রাসূলে কারীম সা. বলেছেন, 'আসসুলতানু জিল্লুল্লাহি ফিল আরদি' অর্থাৎ শাসকগণ পৃথিবীতে আল্লাহর ছায়া স্বরূপ। অনুরূপভাবে সালাহউদ্দীন আইউবী ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা ছিলেন; কিন্তু তিনি সুলতান হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ইমাম শব্দটিও খলীফার অর্থে হাদিসে ব্যবহার হয়েছে। যেমন রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, 'ঐ ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) যে জনগণের ওপর দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে'। কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত দাউদ আ. কে খলীফা বলেছেন, আবার হযরত ইবরাহীম আ. কে ইমাম বলেছেন। উপরের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল খলীফা, ইমাম, আমীর ও সুলতান শব্দগত দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও উদ্দেশ্যগত দিক দিয়ে এক। যদিও কেউ কেউ এগুলোর মাঝে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন।

খলীফার যোগ্যতা ও গুণাবলী

ইসলামী খিলাফতের যিনি খলীফা হবেন তাঁর নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও গুণাবলী থাকা আবশ্যক।

(১) মুসলিম: পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, 'আল্লাহ কাফেরদেরকে মুসলমানদের ওপর বিজয় দান করবেন না'। সূরা নিসা:১৪১

(২) পুরুষ: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'পুরুষেরা নারীদের ওপর

কর্তৃত্বশীল'। সূরা নিসা: ৩৪
রাসূল সা. ইরশাদ করেন, 'সে জাতি কখনও সফল হবেনা, যারা কোন নারীকে তাদের শাসক বানিয়েছে'। বুখারী শরীফ, হাদিস নং: ৪৪২৫

(৩) বালেগ বা প্রাপ্তবয়স্ক: রাসূলে কারীম সা. বলেন, 'তিন ধরণের লোকের কাজ কখনও লিপিবদ্ধ করা হয়না, তারা হল **(ক)** অপ্রাপ্তবয়স্ক, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত, **(খ)** ঘুমন্ত ব্যক্তি, জাগ্রত হওয়া পর্যন্ত, **(গ)** পাগল ব্যক্তি, জ্ঞান আসা পর্যন্ত'।

(৪) বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 'আর যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবন-যাত্রার অবলম্বন করেছেন, তা অর্বাচীনদের হাতে তুলে দিওনা'। সূরা নিসা:০৫

(৫) স্বাধীন: গোলাম যেহেতু তার মুনীবের অধীনে থাকে, তাই তার দ্বারা খলীফা হওয়া সম্ভব নয়।

(৬) বিচক্ষণ: আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, '(হে নবী) আপনি বলে দিন, এই আমার পথ, আমি আল্লাহর পথে আহ্বান করি বিচক্ষণতার সাথে'। সূরা ইউসুফ: ১০৮

(৭) ইসলামী শরীয়তের জ্ঞান সম্পন্ন: ইমাম রাগীব ইস্পাহানী রহ. বলেন, 'তোমরা ফিকাহ সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জন ও আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল না হয়ে নেতৃত্ব দিতে যেওনা'।

(৮) নৈতিক চরিত্রের অধিকারী: রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম।

(৯) পদলোভহীন: হুজুরে পাক সা. ইরশাদ করেন, আমরা আমাদের কোন কাজেই এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ করিনা, যে তার আকাঙ্খা করে। মুত্তাফাক আলাইহি, মিশকাত পৃষ্ঠা: ৩২৬

খলীফা/রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

খলীফা/রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য মৌলিকভাবে দশটি যথাঃ

১. শরী'আতের প্রতিষ্ঠিত নীতি ও পূর্বসূরীদের ঐক্যমত অনুসারে দীনের হেফাজত করা, বিদআত প্রতিহত করা, ফরজ ওয়াজিবের ওপর মানুষকে টিকিয়ে রাখা ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে সকলকে দূরে রাখা।

২. বিবাদমান লোকদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করে দেয়া।

৩. রাষ্ট্রের সংরক্ষণ করা এবং জান-মালের নিরাপত্তা বিধান করা।

৪. রাষ্ট্রের সীমানা সংরক্ষণ করা এবং সীমান্ত প্রহরার ব্যবস্থা করা, যাতে সীমান্তের বাহিরে থেকে কেউ অনুপ্রবেশ করে দেশের লোকদের জান-মালের ক্ষতিসাধন করতে না পারে।

৫. শরী'আত নির্ধারিত হুদুদ বা শাস্তির বিধানাবলী যথাযথভাবে প্রয়োগ করা।

৬. ইসলামের দাওয়াত প্রদান করা। দাওয়াত গ্রহণ না করলে ইসলামের জিহাদের নীতি অনুসারে জিহাদ পরিচালনা করা।

৭. কোন রূপ জুলুম অবিচার না করে শরী'আতের বিধান ও ফিকাহর মাসায়েল অনুসারে খারাজ (রাজস্ব/খাজনা/ট্যাক্স) ও যাকাত উসূল করা।

৮. বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন ভাতা নির্ধারণ করা এবং যথাযথভাবে (প্রয়োজনের চেয়ে কমও নয় বেশিও নয়) নির্দিষ্ট সময়ে তা পরিশোধ

করা।

৯. দীনদার, আমানতদার, যোগ্য ও নির্ভরযোগ্য লোকদেরকে মন্ত্রী, গভর্নর, প্রতিনিধি ইত্যাদি দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করা।

১০. নিজে সমস্ত রাজ্যের সবকিছুর তত্ত্বাবধান করা এবং খোঁজ-খবর রাখা।

খিলাফত প্রতিষ্ঠার অন্তরায়

বর্তমান বিশ্বে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় অন্তরায় তার মৌলিক কয়েকটি হল এই-

১. ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের খিলাফত বিরোধী ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত

এই চক্রান্ত তারা বিভিন্নভাবে করে যাচ্ছে। যেমন, (ক) মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোকে তাদের গোলামীতে আবদ্ধ করে সেখানে তাদের পা চাটা, আজ্ঞাবহ শাসক নিয়োগ করেছে। যার ফলে ঐ সকল রাষ্ট্রগুলো থেকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কোন কার্যকরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়না।

(খ) বিশ্বব্যাপী খিলাফত বিরোধী অপপ্রচার ও খিলাফত ব্যবস্থাকে জঙ্গী, উগ্রবাদ, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর বিশ্ব মিডিয়ার একক নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে থাকার কারণে একাজটি তারা সহজেই করতে পারছে। তাদের এই অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সাধারণ মানুষের মাঝেও খিলাফত সম্পর্কে বিরূপ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে।

(গ) বিশ্বে যে সকল ইসলামী সংস্থাগুলো রয়েছে, সেগুলোকে তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে, যাতে তাদের মাঝ থেকে খিলাফতের কোন আলোচনা না আসে। যার কারণে বর্তমানে ওআইসি, আরবলীগসহ আরও কয়েকটি সংস্থা থাকা সত্ত্বেও খিলাফত দূরে থাক, মুসলমানদের পক্ষে কোন কথাই তাদের মাঝ থেকে শুনা যায়না।

২. মুসলিম উম্মাহর মাঝে অনৈক্য

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এটি একটি বড় অন্তরায়। বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রগুলো যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেত তাহলে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা সময়ের ব্যাপার ছিল।

৩. ইসলামী বিশ্বে অইসলামীক চিন্তা চেতনার উপস্থিতি

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের মাঝে ইসলামী চিন্তা চেতনার পরিবর্তে ইসলামবিরোধী চিন্তা-চেতনার চর্চা বেশি হচ্ছে। ইসলামবিরোধী বিভিন্ন মতবাদ-মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের কারণে সেগুলোর কুপ্রভাব মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করছে। যার কারণে ইসলামের বিজয় তথা ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে খোদ মুসলমানরাও আগ্রহী নয়।

৪. মুসলমানদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিয়ে হতাশা

বর্তমান বিশ্বের অনেক মুসলমানই মনে করে, এই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে ইসলামের বিজয় অসম্ভব। তারা মনে করে, এই দূরাবস্থা থেকে মুসলমানদের মুক্তির কোন উপায় নেই। তারা মনে করে, খিলাফত প্রতিষ্ঠা বা ইসলামী পুনর্জাগরণের চেষ্টা করা 'অরণ্যে রোদন' এর সামিল। কিছু মানুষের এই ধরণের মন্তব্যে তারা যেমন নিজেরা হতাশাগ্রস্থ হয়ে গেছে, তাদের এ কথার কারণে যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠায় নিরলস

কাজ করে যাচ্ছে তারাও হতাশাচ্ছন্ন হচ্ছে।

৫. খিলাফত প্রতিষ্ঠায় মুসলমানদের যথাযথ কর্মতৎপরতার অভাব

খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, তাদের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও উপকরণের অপর্যাপ্ততার কারণে যথাযথ কর্মতৎপরতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। একদিকে যেমন তাদের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে, আবার অপরদিকে রয়েছে উপকরণের অপর্যাপ্ততা। ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতার ক্ষেত্রে রয়েছে অযোগ্যতা, ত্যাগের মানসিকতার অভাব, কাজের ধারাবাহিকতা ও আন্তরিকতা বা নিষ্ঠার অভাব ইত্যাদি। উপকরণাদির ক্ষেত্রে রয়েছে অর্থ, মিডিয়া ও প্রয়োজনীয় রসদের অপর্যাপ্ততা।

তথ্যসূত্র

১. ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রহ.
২. হাদিস ও সামাজিক বিজ্ঞান : লেখকমণ্ডলী, ইফাবা
৩. ইসলাম ও রাজীনীতি : আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা.
৪. www.dorar.net
৫. আরবী উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ব্লগ

.....

লেখক পরিচিতি

কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি

মেয়েদের জন্য উত্তম দীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সুযোগ্য ও পরহেযগার উলামাগণের পরিচালনায়, মেধাবী শিক্ষিকাদের পাঠদানে, দ্বীনি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয়ে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে মেয়েদের আর্দশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মাদরাসাতুল কিতাব ওয়াস সুন্নাহ
মহিলা মাদরাসা

প্রধান উপদেষ্টা
হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান [দা.বা.]
উপদেষ্টা
মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী [দা.বা.]

ভর্তি চলছে

- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন হিফয বিভাগ
- নূরানী মক্তব ও নাযেরা বিভাগ
- প্রথম শ্রেণী থেকে হিদায়াহ জামাত পর্যন্ত কিতাব বিভাগ
- স্কুল ছাত্রীদের সুবিধাজনক সময়ে কুরআন ও মাসায়েল শিক্ষা
- বেফাক ও মাদরাসা বোর্ডে পরীক্ষা
- সহীহ পর্দা, স্বাস্থ্যসম্মত খাবার, পূর্ণ নিরাপত্তা ও
- সার্বক্ষণিক পানি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

১৫/১, শেরশাহসুরী রোড়, [টাউন হল বাজারের উত্তরে] মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ০১৮১৯ ১১৮০১৫, [প্রিন্সিপাল] ০১৯১৮ ৯০৭৮১৫ [প্রধান শিক্ষক]

রা. উপস্থিত সকলকে তাদের গুণাবলী সম্পর্কে স্মরণ
কাছ থেকে তিনি এ ব্যাপারে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন যে,
ীফা নিযুক্ত হবেন তিনি যেন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করেন
রত আবু বকর রা. ও উমর রা.-এর অনুসরণে রাষ্ট্র

লে আসা কিছু লোকও তাদের সাথে যোগ দেন। প্রবীণ
ওয়ান ইবন হাকাম, সাঈদ ইবন আসসহ বহু সাহাবায়ে
রা বিদ্রোহের মন্ত্র ছড়াতে থাকে এবং বসরা, কুফা ও
ীদেরকে বিদ্রোহে যোগদানে উৎসাহিত করতে থাকে।
াত্র চার মাস পরে তিন হাজার সৈন্যের বিদ্রোহী বাহিনী
ত্রা করেন। বিদ্রোহী বাহিনী বসরায় পৌঁছে গভর্নর
ষ্ট হয়। গভর্নর হানিফ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হয়।
ায়ের রা.-এর হস্তগত হয়। তারা উসমান হত্যায় অংশ
ন্দী করে শিরচ্ছেদ করেন এবং কিছু সংখ্যক সুযোগে
স সানী ৩৬ হিজরী সালে ঘটে।

দ্ধে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আয়েশা রা.-এর স্বদলবলে
র অভিযান স্থগিত করে ইরাক গমনের ইচ্ছা করলেন
জানালেন। আলী রা. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর
াবাসী এটাকে অপছন্দ করলেন এবং তা হতে দূরে
না পেয়ে আলী রা. কুফাবাসীর সাহায্যের আশায় ৩৬
দিকে বসরা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং জিকার নামক

ফাবাসীর সাহায্য কামনা করে মুহাম্মদ ইবন আবু বকর
াবাসী খুব একটা সাড়া দিলো না। এ কারণে পরক্ষণে
আস রা. কে পাঠালে তারা কুফার জামে মসজিদে
াষণের ফলে কুফাবাসীর মনোভাব কিছুটা পরিবর্তিত
একটি দল আলী রা.-এর সাহায্যার্থে এগিয়ে এলো।
নের লক্ষ্যে কাকা ইবনে আমরকে সন্ধি প্রস্তাব দিয়ে
রা.-এর নিকট পাঠালেন। কাকা রা. যুক্তি-তর্কের
ত সক্ষম হলেন। তারাও বিপদ উপলব্ধি করে আলী
লিত হলেন। দু'পক্ষ সামনা সামনি অবস্থান করলো,
কলো। আলী রা. তালহা, যুবায়ের রা. কে রাসূল
রিয়ে দিলেন- 'রাসূল সা. বলেছেন, একদিন তোমরা
দ্ধে যুদ্ধ করবে'। এতদশ্রবণে তারা তাদের ইজতিহাদী
দ্ধ বিরতির সিদ্ধান্ত নিলো।

দ্ধ

ান্তির আলোচনায় শঙ্কিত হয়ে পড়লো। তাদের বুঝতে
ক্তি সফল হলে তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ হয়ে ভূগর্ভ থেকে
তাদের রক্ত দিয়েই সন্ধির সীলমোহর করা হবে। তাই
নিলো, মুক্তির একমাত্র পথ যুদ্ধ।
আলী রা.-এর দলভূক্ত ছিলো। তারা আলী রা.-এর
হতেই আয়েশা রা.-এর তাঁবুর উপর আকস্মাৎ হামলা

এসে বিদ্রোহ দানা বাধে এবং এর মধ্য দিয়ে খিলাফত কাল শেষ হয়।

নতুন খলীফার প্রথম বিচার

যেদিন ভোরে আবু লু'লু হযরত উমর রা. কে শহীদ করে সেদিন রাতেই আবদুর রহমান বিন আবু বকর রা. দেখেন যে, ঘটনার নেপথ্য নায়ক হরমুজান ও জুফাইনাসহ আবু লু'লু কানাঘুসা করছিল। তাকে দেখে তারা পালাতেই একটি

চালালো। শুরু হয়ে গেল উভয়পক্ষের সংগ্রাম। মুসলমানদের তরবারি নিজ ভাইয়ের কণ্ঠে আঘাত হানতে লাগলো। আয়েশা রা. যুদ্ধ বন্ধের আহবান নিয়ে উষ্ট্রে চড়ে ময়দানে গেলেন। বসরীয় সমর্থকরা আয়েশা রা. কে ময়দানে দেখে বিপরীত বুঝে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলো। আয়েশা রা. কাব ইবনে ছাওরকে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান নিয়ে ময়দানে প্রেরণ করলে সাবায়ীরা তীর নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করে। সাথে সাথে সাবায়ীরা আয়েশা রা.-এর হাওদাজের দিকে তীর বৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। বসরাবাসী নবী পরিবারকে বিপদগ্রস্ত দেখে হাওদাজ ঘিরে ফেলে। আয়েশা রা. কে রক্ষা করতে একে একে সত্তর জানবাজ প্রাণোৎসর্গ করেন। নাজুক অবস্থা পরিদৃষ্টে আলী রা.-এর নির্দেশে আয়েশা রা.-এর উষ্ট্রের পা কেটে দেন ফলে উটটি পড়ে যায় এবং যুদ্ধ বিরতি ঘটে। এ যুদ্ধে দু পক্ষের প্রায় দশ হাজার মুসলমানের জীবনহানি ঘটে।

সিফফীনের যুদ্ধ

জামালের যুদ্ধ শেষে আলী রা. কুফায় ফিরে আসেন। কুফায় তার সমর্থক বেশি হওয়ার কারণে মদীনার স্থলে কুফায় তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। তথায় মুআবিয়ার সাথে সংগ্রামের পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। সংগ্রামের ন্যায্যতার সাপেক্ষে তিনি ফের মুআবিয়া রা. কে ৩৬ হিজরি ১২ রজব বায়আতের আহ্বান জানিয়ে জারির ইবনে আব্দিল্লহ আল-বাজালিকে একটা পত্রসহ মুআবিয়ার নিকট সিরিয়া প্রেরণ করেন, কিন্তু সেখান থেকে সদুত্তর পাওয়া যায়নি। আলী রা. সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সিরিয়া আগমন করেন। সংবাদ পেয়ে মুআবিয়াও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নিজ বাহিনী নিয়ে ময়দানে উপস্থিত হন। উভয় দল কাতারবদ্ধ হয়ে সামনা-সামনি দু'দিন অবস্থানের পর সন্ধি প্রচেষ্টা করা হলো।

সন্ধির প্রচেষ্টা

আলী রা.-তাঁর পক্ষ হতে বশীর ইবনে আমর আল-আনসারি, সাইদ ইবনে কায়েস আল-হামদানি ও শীস ইবনে রবয়ী তামিমীকে প্রেরণ করলেন। প্রথমে বশির মুআবিয়া রা.-এর সাথে সৌহার্দপূর্ণ আলোচনা করছিলেন। কিন্তু শীস তামীমী 'উসমান হত্যার ব্যাপারে মুআবিয়াকে দায়ী করে ক্ষমতা হস্তগত করার লিপ্সায় মেতে রয়েছেন' বলে রূঢ় আচরণ করেন। এতে মুআবিয়া রা. ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন 'চলে যান আপনার ও আমার ফয়সালা অসির মাধ্যমে হবে'। প্রতিনিধি দল ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলো।

যুদ্ধ শুরু

৩৬ হিজরি সালের জিলহজ্ব মাসে নিরুপায় হয়ে উভয় পক্ষ যুদ্ধক্ষেত্রে নেমে পড়লো। প্রথমে একজন একজন করে যুদ্ধ চালাতে থাকে। পরে প্রত্যেক সেনা নায়ক নিজ সৈন্য নিয়ে স্বদলবলে নেমে পড়ে। এভাবে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে জিলহজ্ব মাস অতিবাহিত হয়ে ৩৭ হিজরীর মহররমের চাঁদ উদয় হলো। তাই তারা যুদ্ধ বন্ধ করে সাময়িক সন্ধি করলো। সাময়িক সন্ধির জের ধরে পূর্ণাঙ্গ সন্ধির প্রচেষ্টা করা হলো এবং আলী-মুআবিয়া উভয়ে সন্ধির ব্যাপারে আগ্রহীও ছিলেন। আদী ইবনে হাতেম তাঈ-এর নেতৃত্বে আলী রা.এর পক্ষ থেকে ফের সন্ধি প্রতিনিধি গেল। কিন্তু শীস ইবনে তামীমী সাবায়ী গোষ্ঠীর বিশিষ্ট বক্তি ছিলো। ইতিপূর্বেকার সন্ধি

উমাইয়া খিলাফত
(৬৬১-৭৫০)
স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য

ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

ইসলামের ইতিহাসে উমাইয়া খিলাফত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ শাসনকাল। খুলাফায়ে রাশেদীনের (৬৩২-৬৬১খ্রি.) পর ৬৬১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মোট ১৪ জন খলিফা ৮৯ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কাতিবে ওহী হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হযরত হাসান রা. এর পক্ষ হতে সন্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ পর্যন্ত উমাইয়া খিলাফত স্থায়ীত্ব লাভ করে। উমাইয়াদের মাধ্যমে সাধারণতন্ত্রের পরিবর্তে বংশানু ক্রমিক রাজতন্ত্রের উদ্ভব হলেও ইসলামের ব্যাপক বিস্তৃতি, ন্যায়বিচার নি শ্চয়তা,জ্ঞান চর্চা, স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ, নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে উমাইয়া খলিফাদের রয়েছে গৌরবময় ভূমিকা। দীনদারী, মেধা, দক্ষতা ও নৈতিকতার দিক দিয়ে সব খলিফা সমান না হলেও হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রা., আবদুল মালিক, আল ওয়ালিদ, সুলায়মান, ওমর ইবন আবদুল আযিয ও হিশামের চরিত্র, কৃতিত্ব ও অবদান ইতিহাসে সোনালী অধ্যায়ের সূচনা করে। তৎকালিন বিশ্বের সাম্রাজ্যগুলোর মধ্যে উমাইয়া খিলাফত সর্ববৃহৎ। উমাইয়া খিলাফতের আয়তন ছিল মোট ৫.৭৯ মিল্লিন বর্গমাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কি.মি.) যা আটলান্টিক হতে পিরেনিজ পর্বত এবং ভারতের সিন্ধু হতে চীনের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উমাইয়া খলিফাদের তালিকা

(১) হযরত মুআবিয়াইবনে আবু সুফিয়ান৬৬১-৬৮০ (২) ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া ৬৮০-৬৮৩ (৩) মুআবিয়া ইবনেইয়াযিদ ৬৮৩-৬৮৪ (৪) মারওয়ান ইবনে আল হাকাম ৬৮৪-৬৮৫ (৫) আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৮৫-৭০৫ (৬) আল ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ৭০৫-৭১৫ (৭) সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক ৭১৫-৭১৭ (৮) উমর ইবনে আবদুল আজিজ ৭১৭-৭২০ (৯) ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক ৭২০-৭২৪ (১০) হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ৭২৪-৭৪৩ (১১) আল ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ৭৪৩-৭৪৪ (১২) ইয়াযিদ ইবনে আল ওয়ালিদ ৭৪৪ (১৩) ইবরাহিম ইবনে আল ওয়ালিদ ৭৪৪ (১৪) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ৭৪৪-৭৫০ পর্যন্ত।

(১) হযরত মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান ৬৬১-৬৮০

আমীরে মুআবিয়া রা. ৬৬১ থেকে ৬৮০ পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। তিনি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, উন্নতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেন এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে খিলাফতের কলেবরও বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে খিলাফতের সীমানা ব্যাপকহারে বিস্তৃতি ঘটে। অসাধারণ কর্মকৌশলতা ও অশেষ দক্ষতা দিয়ে তিনি অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বহিঃশত্রুর আগ্রাসন থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেন। তাঁর শাসনামলে হুজার ইবনে আদি রা. বিদ্রোহ করলে ইরাকের গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবু সুফিয়ান এ বিদ্রোহ্সহজেই দমন করে দেন। আমিরে মুআবিয়া রা. উত্তর আফ্রিকা জয় করে তিউনিসিয়ার দক্ষিণে কাইরাওয়ান নামে একটি সামরিক শহর প্রতিষ্ঠা ও বার্বারদের সাথে যুদ্ধ করে তাদেরকে ইসলামের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন। মধ্য এশিয়ায় কাবুল, কান্দাহার, গজনী, বলখ, বুখারা ও সমরকন্দে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। ইসলামের ইতিহাসে তিনি সর্বপ্রথম নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করে সাইপ্রাস, রোডস ও এশিয়া মাইনরের অনেক গ্রীক অঞ্চল বিজয় করতে সক্ষম হন। তাঁর নৌবহরে রণতরীর সংখ্যা ছিল ১৭০০। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের পরাজিত করে আর্মেনিয়ায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্রীকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপলের বিরুদ্ধে নৌ ও স্থল বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু এ অভিযান পূর্ণ সফল না হলেও সাইজিকাস দ্বীপটি নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসেন। সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিনি কেন্দ্র ও প্রদেশে সচিবালয় (Secretariate) প্রতিষ্ঠা করেন। ধনীদের কাছ থেকে নির্ধারিত হারে যাকাত আদায়, রাজস্ব সংস্কার, নিবন্ধন বিভাগ চালু, ১২ মাইল অন্তর ডাকঘর স্থাপন তাঁর শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তিনি অমুসলিম জনগণের সাথে উদার ব্যবহার করতেন। খ্রিস্টান চিকিৎসক ইবনে উসাল ও কবি আল আখতাল তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞানচর্চার সুযোগ লাভ করেন। জ্যাকোবাইট ও ম্যারোনাইট খ্রিস্টানগণ তাঁদের পারস্পরিক বিবাদ ও কলহ নিরসনে তাঁর মধ্যস্থতা মেনে চলতেন। এতে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তাঁর ব্যাপক জনপ্রিয়তার পরিচয় মেলে। ১৯ বছর শাসন পরিচালনা করে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে এ মহান খলিফা ইন্তেকাল করেন।

(২) ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া ৬৮০-৬৮৩

আমীর মুআবিয়া রা. এর ইন্তিকালের পর ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইয়াযিদ ইবনে মুআবিয়া খিলাফতের মসনদে বসেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের নীতি আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে নিজের খেয়াল খুশী অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করেন।অনেক খ্যাতনামা সাহাবী ইয়াযিদের ক্ষমতা গ্রহণকে সমর্থন করেননি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ও হযরত হুসাইন ইবনে আলী রা.।

৬৮০ খ্রিস্টাব্দের ১০ অক্টোবর (৬০ হিজরীর ১০ মুহাররম) কারবালা প্রান্তরে মহানবীর দৌহিত্র হযরত হোসাইন রা. মর্মান্তিক শাহাদাত ইতিহাসের বহুল আলোচিত ঘটনা। এ হত্যাকাণ্ড উমাইয়া খিলাফতকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দেয়। খিলাফত ব্যবস্থাকে নবুওয়াতী আদর্শে ফিরিয়ে আনাই ছিল হযরতহোসাইন রা.-এর সংগ্রামের মূল লক্ষ্য। মুসলিম জাহানের বিপুল মানুষের সমর্থন ছিল তাঁর পক্ষে। তৎকালীন শাসক ইয়াযিদের বিরুদ্ধে হযরত হোসাইন রা.-এর গৃহীত পদক্ষেপ ছিল

যথার্থ ও বীরত্বপূর্ণ। মদীনার পরিবর্তে দামিস্কে রাজধানী স্থানান্তর, উমাইয়াদের অনৈসলামিক কার্যকলাপ, ইয়াযিদের দুরভিসন্ধি, কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা সর্বোপরি ইয়াহূদী আবদুল্লাহ ইবনে সাবা'র ষড়যন্ত্র কারবালা হত্যাকাণ্ডের জন্ম দেয়। ইয়াযিদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে কুফাবাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হয়ে হযরত হোসাইন রা. স্ত্রী, পুত্র, বোন ও ঘনিষ্ট ২০০ অনুচর সহকারে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কুফার উদ্দেশে রওনা হন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী কারবালা নামক স্থানে পৌঁছলে কুফার গভর্নর ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ তাঁকে বাধা প্রদান করেরক্তপাত বন্ধের উদ্দেশ্যে ইমাম হোসাইন রা. তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন, প্রথমত তাঁকে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হোক নতুবা দ্বিতীয়ত, তুর্কী সীমান্তের দূর্গে অবস্থান করতে দেয়া হোক; অথবা তৃতীয়ত, ইয়াযিদের সাথে আলোচনার জন্য দামিস্কে প্রেরণ করা হোক। কিন্তু ওবায়দুল্লাহইবনে যিয়াদ নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ করে তার হাতে আনুগত্যের শপথনিতে আদেশ দেন। হযরত হোসাইন রা. ঘৃণাভরে তার এ আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর ইমাম হোসাইন রা.-এর প্রস্তাব সম্পর্কে বলেন, 'এ অনুরোধ যদি মেনে নেয়া হতো, উমাইয়াদের জন্য মঙ্গল বয়ে আনতো' (Well had it been for the Umayyad house, if the prayer had been agreed to.)।

অবশেষে ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ-এর ৪ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী ইমাম হোসাইন রা.-কে অবরুদ্ধ করে ফেলে এবং ফোরাত নদীতে যাতায়তের পথ বন্ধ করে দেয়। হযরত হোসাইন রা.-এর শিবিরে পানির হাহাকার উঠে। তিনি ইয়াযিদ বাহিনীর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, আমি যুদ্ধ করতে আসিনি এমন কি নিছক ক্ষমতা দখল আমার উদ্দেশ্য নয়; খিলাফতের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার আমার কাম্য। ১০ মুহাররম ইয়াযিদ বাহিনী তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংঘটিত এ অসম যুদ্ধে একমাত্র পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন ব্যতীত ৭জন পুরুষ শহীদ হন। ইমাম হোসাইন রা. মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে যান; অবশেষে শাহাদত বরণ করেন। ইমাম হোসাইন রা.-ছিন্ন মস্তক বর্শাফলকে বিদ্ধ করে দামিস্কে প্রেরিত হয়। ইয়াজিদ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে ছিন্ন মস্তক প্রত্যার্পণ করলে কারবালায় পবিত্র দেহসহ তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ইতিহাসবিদ গীবন বলেন, 'সেই দূরবর্তী যুগে ও পরিবেশে হযরত হোসাইনের মৃত্যুর শোকাবহ দৃশ্য কঠিনতম পাঠকের হৃদয়ে সমবেদনার সঞ্চার করবে' (In a distant age and climate the tragic scene of the death of Husayn will awaken the sympathy of the coldest reader.)। ইতিহাস সাক্ষী, ইমাম হোসাইন রা.-কে কারবালা প্রান্তরে যারা নির্মমভাবে হত্যা করেছিলো, মাত্র ৫০ বছরের ব্যবধানে তাদের প্রত্যেকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে করুণপন্থায়।

কারবালার যুদ্ধে জয়লাভ ইয়াজিদ তথা উমাইয়া বংশের জন্য ছিল পরাজয়ের নামান্তর। এ বিয়োগান্তক ঘটনা বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়, পারস্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায় এবং সর্বোপরি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সমূহ বিপর্যয় ডেকে আনে। কারবালার শোকাবহ হত্যাকাণ্ড মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ত্রাসের শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ইমাম হোসাইন রা. এর শাহাদাত ছিল ন্যায়, সত্য ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য। তিনি অন্যায় ও অসাধুতার সাথে আপোষ করেননি। তাঁর এ

আত্মাহুতি সর্বকালে গৌরবোজ্জ্বল আদর্শরূপে পরিগণিত হয়। ইয়াযিদের তিন বছরের শাসনামলে তিনটি ঘটনা বড্ড করুণ ও নির্মম। কারবালার পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড, হাররার লজ্জাজনক ঘটনা ও মক্কা অবরোধের কারণে ইয়াযিদ মুসলিম বিশ্বে এতটা নিন্দিত যে, কনস্টান্টিনোপল যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন, খোরাসান, সিজিস্তান, মরক্কো ও আফ্রিকা বিজয় তাঁর মর্যাদাকে ম্লান করে দিয়েছে। কারবালার নির্মম হত্যাকাণ্ড শিয়া মতবাদকে বেগবান করে এবং মুসলিম ঐক্যে ফাটল ধরায়। ৬৮৩ খ্রিস্টাব্দে মক্কা অবরোধ চলাকালে ইয়াযিদ ৩৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং উমাইয়া সৈন্যরা দামেস্কে ফিরে আসে। তাঁর খিলাফতের সময় ছিল ৩বছর ৮মাস ১৪দিন।

(৩) মুআবিয়া ইবনে ইয়াযিদ ৬৮৩-৬৮৪

ইয়াযিদের মৃত্যুর পর তার পুত্র দ্বিতীয় মুআাবিয়া ৬৮৩ সালে ক্ষমতায় আসীন হন। মাত্র ৪০দিন ক্ষমতায় থাকার পর ২১বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। সিরিয়বাসী তাঁর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করলেও সিরিয়ার বাইরে খলিফা হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন না। সিরিয়ার ভেতর দুটি দল তৈরী হয়, একটি হল কায়সদের দল, এরা আবদুল্লাহ ইবনুল জুবায়েরকে সমর্থন করত, আরেকটি হল কুদা -এর দল যারা প্রথম মারওয়ানকে সমর্থন করত। মারওয়ানের সমর্থকরা মারজ রাহিতের যুদ্ধে বিজয়ী হয় এবং ৬৮৪ তে মারওয়ান খলিফার পদে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় মুআবিয়া ছিলেন সৎ, সজ্জন ও ধর্মপরায়ণ। (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮খণ্ড, পৃ. ২৩৭)

(৪) মারওয়ান ইবনে আল হাকাম ৬৮৪-৬৮৫

প্রথম মারওয়ানের সর্বপ্রথম কাজ ছিলো সিরিয়া, মিসর ও হেজায জুড়ে খলিফা হিসেবে স্বীকৃত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের বিদ্রোহী দলের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সাহাল ইবন সাআদসহ অনেক সাহাবী এবং তাবেয়ীদের মধ্যে অনেকে মারওয়ান থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ছিলেন তাঁর যুগের অন্যতম ফকীহ। হযরত হাসান রা. ও হযরত হোসাইন রা. তাঁর পেছনে জামায়াতে নামায আদায় করতেন। মারওয়ান মিসর অধিকার করেন ও ৯মাস ১৮দিন শাসন করার পর ৬৩ বছর বয়সে ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় মারওয়ান-এর শেষ বাক্য ছিল 'জান্নাত ওই ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব, যে জাহান্নামকে ভয় করে'। তাঁর আংটিতে উৎকীর্ণ ছিল 'সম্মান একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই প্রাপ্য'(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৬০; আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩খণ্ড, পৃ. ৪৫৫)।

(৫) আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৮৫-৭০৫

মারওয়ানের পর তাঁর পুত্র আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হন। তিনি উমাইয়াদের কর্তৃত্ব সংহত করেন। ৬৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর শাসনের প্রথম দিকে কুফাভিত্তিক আল-মুখতারের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। মুখতার কুফার গভর্নর আবদুল্লাহ বিন মুতীকে পরাজিত করে কুফার ক্ষমতা ছিনিয়ে নেন। কিছু দিনের মধ্যে ইরাকের অন্যান্য এলাকা দখল করেন এবং তিনি হুসাইন রা. এর হত্যাকারীদের খুঁজ খুঁজে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেনআল-মুখতার ৬৮৬ সালে উমাইয়াদের সাথে ও ৬৮৭ সালে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে লড়াই করে

পরাজিত হন। ফলে তাঁর বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। ৬৯১ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া শাসক আবদুল মালিক পুনরায় ইরাক অধিকার করেন। অতঃপর আবদুল মালিক আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের সাথে যুদ্ধ করে মক্কা দখল করেন। যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. নিহত হন। আবদুল মালিক ৬৯২ সালে বাইজান্টাইন সম্রাট দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ানকে পরাজিত করে আর্মেনিয়া, সাইপ্রাস ও এশিয়া মাইনরের বহু দূর্গ তাঁর শাসনাধীনে নিয়ে আসেন।

৬৯১ খ্রিস্টাব্দে আবদুল মালিক মহানবী সা. জেরুজালেমে যে পাথরের উপর পা রেখে মি'রাজ-এ গমণ করেন সে পাথরকে কেন্দ্র করে অষ্টকোণাকার 'প্রস্তর গম্বুজ' (Dome of the Rock) নামক সৌধ নির্মাণ করেন। এর পাশে স্থাপিত আল আকসা মসজিদকে তিনি সুশোভিত করেন। তিনি টাইগ্রিস নদীর তীরে 'ওয়াসিত' নামে একটি সামরিক শহর গড়ে তোলেন। আরবীকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা প্রদান, আরবী বর্ণমালার উন্নতি সাধন, স্বতন্ত্র মুসলিম মুদ্রা প্রচলন, রাজস্ব ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস, ডাক বিভাগের আধুনিকীকরণ তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। সরকারী মুদ্রায় 'কুল হুয়াল্লাহু আহাদ' উৎকীর্ণ করা হয় (ইবন আছীর, আল কামিল, ৪খণ্ড, পৃ. ৪১৩-৪১৭)। তাঁর আগে রোমান, পারস্য ও হিমারীয় মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। আবদুল মালিক বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করে সেবাস্টপলিসের যুদ্ধে বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করে এবং আর্মেনিয়া ও কর্কেসিয়ান ইবেরিয়ায় কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেও ছিলেন উঁচু স্তরের জ্ঞানী ও ফকীহ। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে জ্ঞানী গুণীদের তিনি কদর করতেন। সারজিয়াস নামক এক খ্রিস্টান পণ্ডিত তাঁর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশাসনিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণে তাঁকে উমাইয়া খিলাফতের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। ২১ বছর রাজত্ব করে আবদুল মালিক ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬০বছর।

(৬) ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক ৭০৫-৭১৫

আবদুল মালিকের ৭০৫ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওয়ালিদ খলিফা হন। সুযোগ্য শাসক ও সর্বশ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে ওয়ালিদ ইবনে 'আবদুল মালিক (৮৬-৯৬/৭০৫-৭১৫) ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। কূটনৈতিক দক্ষতা, মৌলিকত্ব ও বিদ্যাবত্তার দিক দিয়ে তিনি তাঁর পিতা 'আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের সমকক্ষ না হলেও পুরো দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি শৃঙ্খলার প্রবর্তক ও বিজেতা হিসেবে পিতার তুলনায় অধিকতর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হন, এতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি ছিলেন, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নীতিজ্ঞান সম্পন্ন শাসক। বিশাল ইসলামী খিলাফতের অধিপতি হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করে স্থূলবুদ্ধির পরিচয় দেননি। অবশ্য শাসন পরিচালনায় তাঁর যে কিছুটা কঠোর ভূমিকা ছিল, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আরব ইতিহাসবিদগণ বিশেষতঃ মাস'উদী ও ইবনে আছীর, ওয়ালীদ ইবনে আবদুল মালিককে দুরাত্মা ও স্বৈরাচারী নৃপতি বলে অভিহিত করেন। তিনি হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফকে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর নিয়োগ করায় হয়ত এরূপ মন্তব্যের প্রধান কারণ। নির্যাতন, নিবর্তন ও মানবহত্যা ছিল হাজ্জাজের শাসন কার্যক্রমের নিকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু পিতা 'আবদুল মালিকের মত ওয়ালিদ হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের

প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ছিলেন না বরং মাত্রাতিরিক্ত আতিশয্য প্রকাশ করলে তিনি হাজ্জাজকে নিবৃত্ত করতে দ্বিধা করতেন না। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উমাইয়া বংশকে নিষ্কন্টক রাখা এবং মুসলিম আধিপত্য ভারত উপমহাদেশ ও মধ্য এশিয়ায় বিস্তার লাভ করতে পারত কিনা সন্দেহ আছে। প্রফেসর ফিলিপ কে. হিট্টি এ প্রসঙ্গে বলেন- 'ন্যায় সঙ্গত হোক বা না হোক, আল-হাজ্জাজ যে কঠিন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা বিদ্রোহীদের দমন করতে এবং আইনের শাসন ফিরিয়ে আনতে কার্যকর ভূমিকা রাখে (ফিলিপ কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, পৃ.২৩৪)।

ইংরেজ ইতিহাসবিদ উইল এর দৃষ্টিতে ওয়ালিদ ছিলেন আমীরুল মুমিনীনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও যোগ্যতম (ড. সাইয়্যেদ মাহমূদুল হাসান, ইসলামের ইতিহাস, পৃ.৩৯৫) ওয়ালিদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করতে গিয়ে সাইয়্যেদ আমীর আলী বলেন, 'এতকাল পরে আমরা কেবল তাঁর সৎকর্মগুলোর কথাই স্মরণ করতে পারি। তিনি যে তাঁর পিতাআবদুল মালিক ও পিতামহ মারওয়ানের চেয়ে দয়ালু ছিলেন সে ব্যাপারে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। নিশ্চিতভাবে তাঁর অনেক উত্তরাধিকারীর চেয়ে তিনি দয়ালু ছিলেন। স্বভাবতই সিরীয়রা তাঁকে খলীফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করে' (সাইয়্যেদ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব সারাসিন্স,পৃ. ১১৫)। ওয়ালিদের শাসনকাল নিঃসন্দেহে উমাইয়া খিলাফতের স্বর্ণালী যুগ। 'আবদুল মালিক ইতঃপূর্বে সরকারের পথে রক্ষিত সব কাঁটা দূর করতে সক্ষম হন। খারেজী ফিতনা, শীয়া আহলে বায়তের উদ্দীপনা এবং উমাইয়া বংশের প্রতিপক্ষ শক্তি চুর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। ফলে বহিঃর্বিশ্বে অভিযান পরিচালনা ও অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে বেশ সময় ও সুযোগ লাভ করেন। সৌভাগ্যক্রমে মুহাম্মদইবনে কাসিম সাকাফী, কুতায়বা ইবনে মুসলিম, মুসাইবনে নুসাইর, তারিক ইবনে যিয়াদ ও মাসলামা ইবনে আবদুল মালিকের মত অপ্রতিদ্বন্দী সেনানায়ক তাঁর অধী নে থাকার কারণে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে সক্ষম হন (মুফতী যায়নুল আবেদীন মিরাঠী, খিলাফতে বনী উমাইয়া, পৃ. ১৬২-১৬৩) ।

তিনি জাতীয় কল্যাণার্থে বহু কাজ সম্পাদন করেছেন। শাসিত সকল সাম্রাজ্যে রাস্তা-ঘাট পুনঃনির্মাণ করেন। মাইলপোষ্ট স্থাপন করেন, নদী খনন করেন, সরাইখানা নির্মাণ করেন। হাসপাতাল ও দুস্থ মানুষের জন্য আশ্রয় শিবির স্থাপন করেন। প্রতিটি পঙ্গুদের জন্য একজন করে সেবক, প্রতিটি অন্ধের জন্য একজন করে পথদিশারী রাষ্ট্রীয় খরচে নিযুক্ত করেন। ধর্মীয় ব্যাপারেও তার রয়েছে অনেক অবদান। তার শাসনামলেই কুরআন শরীফের হরকত লাগানো হয়। তিনি ক্বারী ও হাফেজদের সরকারী ভাতা নির্ধারণ করেন। তিনি মদীনার মসজিদে নববী ও দামেস্কের দারুল খিলাফত মসজিদ নির্মাণ করেন এবং সেগুলোর শিল্পায়নে বহু অর্থ ব্যয় করেন যা ইতিহাসে চির স্মরণীয়।

অবশেষে ৯বছর ৭মাস গৌরবজনকভাবে রাজত্ব চালিয়ে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি (৯৬ হিজরীর ১৫ জমাদিউচ্ছানী) খলিফা ওয়ালিদ ৪৫বছর বয়সে দাইর মাররান নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন এবং বাবুস সাগীর কবরস্থানে দাফন করা হয়। উমর ইবনে আবদুল আযীয জানাযার নামাযে ইমামতি করেন এবং লাশ সমাহিত করার উদ্দেশ্যে তিনি যখন কবরে নামেন, দেখা গেল ওয়ালিদ তাঁর দুই পা মাথার

দিকে সংকোচিত করছেন। এ দৃশ্য দেখে ওয়ালিদের ছেলে বলে উঠল, আমার পিতা কী জীবিত? উমর জবাবে বলেন, যাদের দাফন করা হয় তিনি এখন তাদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহর কসম! তোমার পিতা আগেই বিদায় নিয়েছেন। লাশ কবরে রেখে উমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন, 'আপনাকে এমন বিছানায় রেখে যাচ্ছি যেখানে কোন বালিশ-তোষক নেই; আপনজন হতে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন; মাটি আবাসস্থল হয়ে গেল; এখনই জীবনের হিসাব দিতে হবে; যেসব আমল পূর্বে পাঠিয়েছেন আপনি তাঁর মুখাপেক্ষী আর যেসব কর্ম ফেলে গেলেন তা আপনার কাজে লাগবে না' (ইবনে আছীর, আল কামিল ফিত তারীখ, ৫খ.,পৃ. ৯-১০;ইবনে কাছীর, তারীখে ইবনে কাছীর, ৯খ., পৃ.২৪৮)। তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম উম্মাহর এক স্বর্ণালী যুগের অবসান ঘটল। ইবনে আছীরের মতে সিরীয়রা তাঁকে খলিফাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করেন। খলিফা ওয়ালিদ এক সঙ্গে তিনটি মহাদেশকে নিজের শাসনাধীন এনে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হবার গৌরব অর্জন করেন। প্রফেসর উইলিয়াম মূর বলেন, 'প্রথম হতে শেষ অবধি লক্ষ্য করলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খিলাফতের ইতিহাসে আল-ওয়ালীদ অপেক্ষা অন্য কারও খিলাফত এত গৌরবোজ্জ্বল নয়' (Looking at it from first to last, we shall not find in the annals of the Cliphate a more glorious reign than that of Al Walid.)। জ্ঞানচর্চায় উদার পৃষ্ঠপোষকতা, শিল্পানুরাগ, মসজিদ নির্মাণ, সংগঠন, নৌবহর প্রতিষ্ঠা ও রাজ্যবিস্তারের মাধ্যমে খলিফা ওয়ালিদ ইসলামের ইতিহাসে অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন (ড.ওসমান গনী, উমাইয়া খিলাফাত, কোলকাতা, পৃ.১১৮)।

হাজ্জাজ বিন ইউসুফ

ওয়ালিদের শাসনামলে ইরাকের গভর্নর ছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। তিনি কঠোর প্রকৃতির লোক ছিলেন। জালেম শাসক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তবে উমাইয়া রাজত্বকে দৃঢ় ও সুসংহত করতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইরাকীরা উমাইয়া শাসনের বিরোধী ছিলো। শান্তি বজায় রাখার জন্য হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সিরিয়া সেনাদের ইরাকে নিয়ে আসেন। বিদ্রোহ দমনে এই সেনারা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম,মূসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদের গৌরবান্বিত বিজয়ের পেছনে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলো হাজ্জাজেরই চিন্তা-চেতনা।

বুখারা বিজয়

৭০৮ খ্রিস্টাব্দে কুতায়বা বুখারার উদ্দেশে আমু দরিয়া অতিক্রম করে সুফলা নামক স্থানে পৌঁছে বিশাল শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হন। সেখানে প্রথমে কুতায়বা পরাজিত হয়ে পিছু হটেন, পুনরায় আক্রমণ করে বুখারা জয় করে।

সিন্ধু বিজয়

সিন্ধুর রাজা দাহিরের শাসনামলে দেবল বন্দরের কাছে কতিপয় জলদস্যু কর্তৃক সিংহল থেকে ইরাকগামী ৮টি জাহাজ ও নারী লুণ্ঠনের ঘটনায় উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ কর্তৃক প্রতিনিধি প্রেরণ করার পরও রাজা দাহির জলদস্যুদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেননি এবং লুণ্ঠিত মালামাল ও অপহৃত নারী উদ্ধারে অস্বীকৃতি জানান। ৭১০ খ্রিস্টাব্দে তরুণ সেনাপতি হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা মুহাম্মদ বিন

কাসিমের নেতৃত্বে ১২ হাজার সেনা সদস্য রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে হত্যা করে সিন্ধু বিজয় করেন।

মুলতান বিজয়

৭১৩ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাওয়ার বিজয় করেন। সেখান থেকে যাত্রা করে সুকার বিজয় করেন। অতপর বায়াস নদ অতিক্রম করে মুলতান পৌঁছেন। সু-কৌশলে দীর্ঘ দিন শহর অবরোধ রেখে মুলতান জয় করে।

স্পেন বিজয়

উমাইয়া খলীফা আল ওয়ালিদের রাজত্বকালে একটি চমকপ্রদ ঘটনা ছিল স্পেন বিজয়। এ অভিযানের মাধ্যমে আফ্রিকা ও ইউরোপের দূরতম অঞ্চল পর্যন্ত ইসলাম সম্প্রসারিত হয়। মূসাইবনে নুসাইর উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে ইউরোপের দক্ষিণ–পশ্চিম অঞ্চল আইবেরিয়ান দ্বীপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ইসলামের সামরিক ইতিহাসে স্পেন বিজয় সর্বশেষ ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করে। ফিলিপ কে. হিট্টি বলেন, 'সামরিক অভিযানের দ্রুততা ও সাফল্যের পরিপূর্ণতার দিক হতে স্পেনে এ অভিযানটি মধ্যযুগের সামরিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে' (ফিলিপ কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, পৃ.৫৬২)। খলিফা ওয়ালিদের আদেশক্রমে ৭১১ সালে মূসাইবনে নুসাইর প্রখ্যাত সেনাপতি তারিক ইবনে যিয়াদের নেতৃত্বে ৭০০০ সৈন্যের একটি বিশাল মূর বাহিনী স্পেন অভিযানে প্রেরণ করেন। জিব্রাল্টার অথবা জাবালুত তারিকে অবতরণ করে 'রায়াত' নামে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অতঃপর তিনি কারতোয়া, ল্যাগ দ্যা জান্দা ও কটেজ দখল করে স্পেনের মূল ভূখণ্ডে অভিযান পরিচালনা করেন। রাজা রডারিক মনোনীত আলজিসিরাস প্রদেশের গভর্নর থিয়োডমিরকে পরাজিত করে তিনি তিনি রাজধানী টলেডোর দিকে অগ্রসর হন। মুসলিম অভিযানের সংবাদ পেয়ে রাজা রডারিক এক লাখ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ওয়াদিলবেকা নদীর তীরে মেডিনা-সিডোনিয়া রণক্ষেত্রে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হন। ইতোমধ্যে মূসা, তারিকের সাহায্যার্থে আরও পাঁচ হাজার সৈন্য পাঠালে মুসলিম বাহিনী মোট বার হাজারে উন্নীত হয়। যুদ্ধক্ষেত্রে রডারিকের বিশাল ও সুসজ্জিত বাহিনী এবং বিপুল সমরাস্ত্র লক্ষ্য করে বীরদীপ্ত তারিক স্বল্প সংখ্যক মূর বাহিনীকে উৎসাহিত করার জন্য এক তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি ঘোষণা দেন- 'প্রিয় সৈন্যগণ, তোমাদের সম্মুখে শত্রু, পশ্চাতে সমুদ্র, পলায়নের কোন পথ নাই, সাহস ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ না করলে বাঁচার কোন আশা নেই। যেখানে আমাদের আল্লাহ আছেন, সেখানে আমাদের মাতৃভুমি'। ৭১১ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই (৯২হি.) মুসলিম ও খ্রিস্টান বাহিনীর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়। সাত দিন ব্যাপী এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়। অজানা অচেনা রণাঙ্গনে মুসলিম বাহিনী বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে অন্ততঃ পাঁচগুণ বেশী একটি সুসজ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হন। গথিক বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়ে যায় এবং রডারিক পলায়নকালে নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন। রডারিকের আকস্মিক মৃত্যু ও মুসলিম সেনাবাহিনীর উন্নত সমর কুশলতা ও আক্রমণের প্রচণ্ডতায় গথিক বাহিনী আতঙ্কিত ও বিহ্বল হয়ে পড়ে। এ যুদ্ধের ফলে স্পেনবাসীরা আরবদের সম্মুখীন হওয়ার উদ্যম হারিয়ে ফেলে এবং এ চমকপ্রদ

বিজয়ের শ্রেষ্ঠত্বকে কোন কিছুই ম্লান করতে পারে না। মুসলিম সেনানায়কের দ্রুত গতিবিধি ও আক্রমণের তীব্রতায় গথিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বিজয়দীপ্ত তারিক কারমোনার সিডোনিয়া, ইজিসা দখল করেন। মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে চারভাগে ভাগ করে মালাগা, গ্রানাডা, কর্ডোবা এবং টলেডোর দিকে প্রেরণ করা হয় এবং গথিক রাজ্যের বহু অঞ্চলে মুসলিম রাজত্ব কায়েম করা হয়। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ হয় বশ্যতা স্বীকার করে, না হয় পালিয়ে বেড়াতে থাকে স্থান হতে স্থানান্তরে; প্রধান ধর্মযাজকরা রোমে আশ্রয় গ্রহণ করে। জেনারেল তারিক স্বল্পসংখ্যক ইয়াহূদী ও মুসলিম সৈন্যের হাতে টলেডো নগরীর দায়িত্ব ছেড়ে দেন এবং উইটিজার ভাই অপাসের ওপর নগরীর শাসনভার ন্যস্ত করে তিনি পলায়নপর গথিকদের এসটর্গা পর্যন্ত ধাওয়া করেন। ইয়াহূদী, ভূমিদাস,দৈন্য-পীড়িত নাগরিকদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষ মুক্তিদাতা হিসেবে মুসলমানদের স্বাগত জানায়। সেনাধ্যক্ষ মূসা ৭১২ খ্রিস্টাব্দে (হি. ৯৩) আঠার হাজার আরব সেনাসদস্যের একটি বিশাল বাহিনী নিয়ে স্পেনে আগমন করেন এবং সিডোনিয়া, মেডিনা, কার্মোনা, সেভিল, মেরিডা, তালাভেরা অধিকার করেন। মূসা এবং তারিকের সম্মিলিত বাহিনী পর্যায়ক্রমে গ্যালিসিয়া, লিওন, অ্যাস্টুরিয়াস, সারাগোসা, আরাগন, ক্যাটালোনিয়া, বার্সিলোনা অধিকার করেন উত্তরে পিরেনীজ পর্বতমালা পর্যন্ত অগ্রসর হয়। কয়েক বছর পর পর্তুগালও অধিকৃত হয় এবং 'আল গারব' বা 'পশ্চিম দেশ' নামে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত হয়। ৭১২ হতে ৭১৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে খ্রিস্টানস্পেনের প্রায় সমগ্র অঞ্চল মুসলিম পতাকাতলে আসে। এটা মুসলমানদের অপূর্ব ও শ্রেষ্ঠ বিজয়। খ্রিস্টানদের যুগ যুগ ব্যাপী সঞ্চিত বিপুল ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং ইউরোপে মুসলিম আধিপত্যের সোপান স্থাপিত হল। এ চূড়ান্ত বিজয়ের পরে স্পেনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের অগ্রগতি একটি শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। সেনাধ্যক্ষ মূসা ১১,১৬৮ ফুট উঁচু পীরেনিজ পর্বতমালার উপর দাঁড়িয়ে সমগ্র ইউরোপ জয়ের পরিকল্পনা হাতে নেন এবং ইতালী প্রবেশের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের পূর্বে অবস্থিত নারবোন, অ্যাভিগনন এবং লিওর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি গ্যালিসিয়ায় প্রবেশ করে সেখানকার দুর্গগুলো শত্রুমুক্ত করেন। বহু বিদ্রোহী এস্টুরিয়াসের প্রস্তরময় গিরিসংকটে বিতাড়িত হয় এবং গেরিলা দলগুলি একের পর এক বশ্যতা স্বীকার করে। জয় যখন দ্বারপ্রান্তে ঠিক সেই মুহূর্তে অভিযান বন্ধ করে রাজধানী প্রত্যাবর্তনের জন্য দামিস্ক হতে ওয়ালিদের বার্তা গিয়ে পৌঁছে দূতের মাধ্যমে। দামিস্কের দ্বিধাগ্রস্থনীতির ফলে সমগ্র ইউরোপ জয়ের একটি চমৎকার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায়। আরবদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে এমন কোন নেতার আবির্ভাব খ্রিস্টান সাম্রাজ্যে তখনও পর্যন্ত ঘটেনি। স্পেন ত্যাগের পূর্বেই সেনাপতি মূসা দেশ শাসনের জন্য আবশ্যকীয় সমুদয় বন্দোবস্ত করে যান। তাঁর পুত্র আব্দুল আযীযকে নিযুক্ত করেন নতুন প্রদেশ সেভিল এর রাজপ্রতিনিধি, আরেক পুত্র ও প্রসিদ্ধ যোদ্ধা আব্দুল্লাহর ওপর ইফ্রিকিয়ার দায়িত্ব অর্পণ করেন; অন্যদিকে সর্বকনিষ্ঠ আব্দুল মালিককে দেন মরক্কোর (মাগরিব–উল–আকসা) শাসনভার এবং তাঞ্জীরের প্রধান সেনানিবাসসহ সমুদ্রোপকুল ওনৌবাহিনীর কর্তৃত্ব পান আবদুস সালেহ। তাঁর অধীনস্থ সরকারের যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ করে ৭১৪ সালে বহুসংখ্যক অনুচরসহ তিনি দামিস্ক অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করেন (R. Dozy,

Spanish Islam, pp.232-234; সায়্যিদ আমীর 'আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্‌স, পৃ.১০৫-১০৯; ড. এম. আবদুল কাদের/ড. সায়্যিদ মাহমূদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮৬-১৯১)।

স্পেন বিজয়ের ফলাফল

মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের ফলাফল ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। এটা মধ্যযুগের ইউরোপীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। উমাইয়া খিলাফতের অধীনে বিজিত প্রদেশ হিসেবে 'আন্দালুসিয়া'য় একটি জনমঙ্গলকর এবং কার্যকরী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। স্পেন বিজয়ে শুধু উমাইয়া বংশেররাজত্বই বিস্তৃতি লাভ করেনি, বরং মুসলিম রাজ্য সম্প্রসারণে ইউরোপে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভাব সুদুরপ্রসারী হয়। স্পেন বিজয়াক্ষান্তরে ইউরোপ বিজয়ের সূচনা করে, কিন্তু পিরেনীজ পর্বতে দণ্ডায়মান অবস্থায় মূসা এবং তারিক যখন ফ্রান্স তথা ইউরোপে অভিযানের পরিকল্পনায় ব্যস্ত, ঠিক তখনই তাঁদের দামিস্কে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হয়। এই আদেশের ফলে ইউরোপে ইসলামের বিস্তৃতি ব্যাহত হয়। এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, যদি মূসা ও তারিক যুদ্ধাভিযান অব্যাহত রাখতেন, তা হলে হয়ত প্যারিস ও লন্ডনের গীর্জাগুলিতে ঘণ্টাধ্বনির স্থলে আযানের সূর ধ্বনিত হত। ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে আব্দুর রহমান দক্ষিণ ফ্রান্সের টুর্‌স (Tours) শহরে অভিযান পরিচালনা করেন; কিন্তু চার্লস মার্টেল (Charls Martel)-এর নিকট টুর্‌সের যুদ্ধে(Battle of Tours) তিনি পরাজিত হলে 'এটাই মুসলিম বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর সর্বদূরবর্তী সীমানা নির্ধারণ করে দেয়।'

আরবদের স্পেন বিজয়ে আইবেরিয়ান উপদ্বীপে একটি নুতন যুগের সূচনা হয়; এটা নিঃসন্দেহে একটি সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের মন্দ ও ভয়াবহ পরিণামগুলো বাদে তার শ্রেষ্ঠ ফলাফলের সাথে এ বিপ্লবের ফল তুলনা করা যেতে পারে। স্পেনে মুসলিম শাসন হতে বর্তমান কালের বহু সরকারের শিক্ষা নেয়ার অনেক বিষয় রয়েছে। সুবিধাভোগী শ্রেণি বিশেষতঃ ধর্মযাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের তিনশ' বছরের অন্যায় অধিকার ও ক্ষমতা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। গথ বা ফ্রাংকদের উৎপীড়ন হতে মুক্তিলা ভের আশায় যেসব খ্রিস্টান সম্প্রদায় দেশ ত্যাগ করেছিল, তারা আবার নগর ও গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং নিজেরাই আরবদের শান্তিপূর্ণ, উদার ও হিতকারী শাসনব্য বস্থাকে গ্রহণ করে নেয় (সায়্যিদ আমীর 'আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব স্যারাসিন্‌স, পৃ. ১০৯-১১১)। এর ফলে সামাজিক বৈষম্য, অসন্তোষ, সংকীর্ণতা, হীনমন্যতা দূরীভূত হয়ে একটি সুষ্ঠু, সংঘবদ্ধ, শান্তি ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজ গড়ে ওঠে। বিজয়ী আরবদের সময় ব্যতীত আন্দালুসিয়া আর কখনও এত শান্তিপূর্ণ, ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞানবত্তার সঙ্গে শাসিত হয়নি। শ্রেণিহীন সমাজ গঠনে ইসলামের অবদান অপরিসীম। সুবিধাভোগী ধর্মযাজক ও অভিজাত শ্রেণির প্রাধান্য লোপ পায় এবং মুসলমান ও অমুসলমান মধ্যবিত্তদের করভার হ্রাস হয়। ভিজিগথিক আমলে ক্রীতদাসগণ ভারবাহী পশুর চাইতেও অধম ছিল, এবার তারা মনুষ্যোচিত মর্যাদা পেল এবং মুক্ত হয়ে স্বাধীন নাগরিকের মর্যাদা লাভ করে। ভূমিদাসগণ ভূমির মালিকানা পেল। জমির উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে ভূমি রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন

আসে। সাধারণতঃ উর্বর জমির উৎপন্ন ফসলের এক দশমাংশ খাজনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ইসলামের একটি অমোঘ বিধান। বলপূর্বক খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা, হত্যা, বিতাড়ন এমনকি পরস্পরের মধ্যে বলপূর্বক বিবাহবন্ধন নিষিদ্ধ করা হয়। কর্ডোভার খ্রিস্টানদের সেন্ট ভিনসেন্ট গির্জার স্বত্বাধিকার কেড়ে নেয়া হয়নি। খিলাফতের পতনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে নতুন গির্জা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় এবং উপাসনার জন্য গীর্জায় ঘণ্টা বাজানোর প্রতি কোন নিষেধাজ্ঞা ছিল না (Edwyan Hole, Andalusia: Spain under the Muslims. pp. 48)। ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলমানগণ জিযিয়া কর প্রদান করে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে থাকে। অবস্থানুযায়ী কেবল যুদ্ধক্ষম সুস্থ পুরুষদের ওপর বার্ষিক তিন হতে ষোল অথবা বার হতে আটচল্লিশ দিরহাম জিযিয়া ধার্য করা হয়। সন্ন্যাসী, নারী, শিশু, খঞ্জ, অন্ধ, রুগ্ন ও ভিক্ষুকদের জিযিয়া কর হতে অব্যহতি প্রদান করা হয়। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে খ্রিস্টান এবং ইয়াহুদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হত না। তাদের নিজস্ব বিচারকের ওপর আইন কানুন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সর্বপ্রকার সরকারী চাকরী, মর্যাদাপূর্ণ ও লাভজনক সমুদয় পদ মুসলমান, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সব নাগরিকের জন্য অবারিত ছিল। যোগ্যতা ও মেধা ছিল চাকরীপ্রাপ্তির মাপকাঠি। উপর্যুক্ত কল্যাণধর্মী ব্যবস্থার ফলে কৃষির ব্যাপক উন্নতি হয় এবং শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। স্পেনে মুসলমানদের উদার ও প্রগতিশীল শাসনব্যবস্থার ফলেই সুষ্ঠু ও সুসংহত পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে স্পেনিশ-মুসলিম কৃষ্টি ও সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। স্পেনের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ডাচ পণ্ডিত আর. ডোজী বলেন,

The Moors organised that wonderful kingdom of Cordova, which was the marvel of the Middle Ages, and which, when all Europe was plunged in barbaric ignorance and strife, alone held the torch of learning and civilization bright and shining before the Westwrn world.

'কর্ডোভায় মূরগণ যেই চমৎকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, তা ছিল মধ্যযুগের একটি বিস্ময়। সমগ্র ইউরোপ যখন বর্বরোচিত অজ্ঞানতা ও কলহে নিমজ্জিত তখন কর্ডোভা একাই পশ্চিমা দুনিয়ার সামনে শিক্ষা ও সভ্যতার উজ্জ্বল ও দীপ্ত মশাল বহন করে (R. Dozy, Spanish Islam, pp. 234-235)।'

মুসলিম আমলে রাজধানী কর্ডোভা, গ্রানাডা, সেভিল ও বার্সিলোনা কেবল সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হয়নি, বরং জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। স্থাপত্য, শিল্পকলা, সাহিত্য ও সুকুমারবৃত্তির চর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূরগণ অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। স্পেনে মুসলমানদের শাসনব্যবস্থা ও জ্ঞানসাধনা পরবর্তীতে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা করে। স্পেনে শিক্ষা-দীক্ষা, শিল্প-সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানগণ যে প্রভূত উন্নতি সাধন করে তার প্রভাব ইউরোপে পরিলক্ষিত হয়। কর্ডোভা পরিণত হয় আন্তর্জাতিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে। সত্তরটি গ্রন্থাগার, অসংখ্য বইয়ের দোকান, মসজিদ ও অট্টালিকা বিশিষ্ট এ শহরটি

দুনিয়া জোড়া খ্যাতি এবং পর্যটকদের মনে সম্মান ও শ্রদ্ধা জাগিয়েছিল। শহরটির বুকে মাইলের পর মাইল বাঁধান সড়ক ছিল এবং পথের ধারের বাড়িগুলি হতে সড়কে তীব্র আলো ফেলার ব্যবস্থা ছিল। অথচ এর কয়েক শতাব্দী পরে প্যারিসে বর্ষস্নাত কোন দিনে যে কেউ বাড়ির বাইরে পা বাড়াত তার পা গোড়ালী পর্যন্ত কাদায় ডুবে যেত। যে সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় স্নান করাকে ধর্মহীন বা অসভ্য ব্যক্তিদের আচরণ বলে মনে করত, সেসময় কর্ডোভার বিজ্ঞানীরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেখানকার বিলাসবহুল স্নানাগারে স্নান করার অধিকার ভোগ করে। মুসলিম স্পেনের রাজধানী কর্ডোভার খ্যাতি সুদূর জার্মানী পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। একজন স্যাক্সন সন্ন্যাসিনী এ রাজধানীটিকে 'বিশ্বের রত্ন' বলে মন্তব্য করেন। মুসলমানগণ কর্ডোভা নগরীতে যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন তা বিশ্বের শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে খ্যাতির দিক দিয়ে ছিল শীর্ষস্থানীয়। এ শিক্ষায়তনটি কায়রোর আল আযহার ও বাগদাদের নিযামীয়াকে ছাড়িয়ে যায়। স্পেন ছাড়াও ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রান্ত হতে খ্রিস্টান, ইয়াহুদী ও মুসলিম ছাত্রবৃন্দ এ বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার উদ্দেশ্যে ভীড় জমাত। রাজধানীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যা ছিল চার লাখ এবং চুয়াল্লিশ খণ্ডের একটি ক্যাটালগে বইগুলোর নাম নথিবদ্ধ ছিল (ফিলিপ কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, পৃ.৫৯৮, ৬০০,৬০৩)। ইউরোপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের নিকট ঋণী। মুসলমানদের মাধ্যমে কাগজ সর্বপ্রথম ইউরোপে প্রসার লাভ করে। যখন লন্ডন শহরের লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ লাখ তখন কর্ডোভা শহরের লোকসংখ্যা ছিল দশ লাখ, স্নানাগার ছিল নয় শত। ইংরেজ ঐতিহাসিক জে. ড্রেপার স্বীকার করেন যে, অষ্টম শতাব্দীতে কর্ডোভার রাস্তায় যখন বাতি জ্বলত তার সাত শ' বছর পরেও লন্ডনের রাস্তায় কোন সরকারী বাতি ছিল না (J.Draper, History of the Intellectual Development of Europe, vol. ii, London, 1910, pp. 230-231) ।

শাসন কাঠামো

সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উমাইয়া খলিফাগণ পুরো সাম্রাজ্যকে ৫ ভাগে বিভক্ত করেন এবং উক্ত ৫বিভাগে প্রদেশ ছিল ১৪টি। প্রদেশগুলো হল: ১. আরব, ২. ইরাক, ৩. জাযিরা, ৪.সিরিয়া, ৫. মিসর, ৬. আল- মাগরিব, ৭. প্রাচ্যদেশ, ৮. আদ দাইলাম, ৯.আল রিহাব, ১০ আল জিবাল, ১১. খুজিস্তান, ১২. ফারস, ১৩. কিরমান ও ১৪. সিন্ধু। প্রতিটি প্রদেশের অধীনে ছিল অনেক জেলা। প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন ভাইসরয় ও প্রতি জেলার জন্য একজন জেলা প্রশাসক (ওয়ালী) নিযুক্ত হতেন।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ

৭১১ খ্রিস্টাব্দে ওয়ালিদের শাসনামলেই জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় উৎকর্ষ শুরু হয়। এগারো শতকের পরও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় আরবদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় থাকে এই স্পেনেই। সিরিয়া এবং মিসরে রক্ষিত গ্রীক বিজ্ঞানীদের রচনা মুসলিমদের হাতে আসার পর গ্রীকদের উত্তরসূরী হিসেবে মানবজ্ঞানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল মুসলিমরা। আর স্পেনীয় মুসলিমদের রচনা থেকেই

আরবদের উৎকৃষ্ট জ্ঞান ছড়িয়ে পড়েছিলো ইউরোপে। মুসলিম স্পেন ছিল ইউরোপের জন্য জ্ঞানের বাতিঘর। যেই জ্ঞানের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল ছিলো পাশ্চাত্যের আধুনিক বিজ্ঞান, দর্শন। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের সদম্ভ পদচারণা ছিলো। এর মাঝে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হয়-চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medicine), রসায়ন (Chemistry), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), গণিত (Mathematics), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), দর্শন (Philosophy), ভূগোল (Geography), স্থাপত্যবিদ্যা (Architecture) এবং হস্তলিখন বিদ্যায় (Calligraphy)। এর বাইরেও আইনশাস্ত্র (Law), ইতিহাস (History), সমাজবিজ্ঞান (Sociology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science) ইত্যাদিতে উমাইয়াদের রয়েছে বিশাল অবদান।

উত্থানের কারণ

উমাইয়া শাসনামলে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায় স্পেনের উত্থানের পেছনে যেসব কারণ চিহ্নিত করা যায় সেগুলো হচ্ছে-

১। খলিফা এবং অন্যান্য শাসকদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা।

২। বহু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা এবং বই পুস্তকের বিশাল সংগ্রহ।

৩। মুক্ত এবং সহনশীল সাংস্কৃতিক পরিবেশে ফকিহ, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের স্বাধীনভাবে কাজ করার অবাধ সুবিধা।

(৭) সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক ৭১৫-৭১৭

ওয়ালিদের মৃত্যু পর তার ভাই সুলায়মান ইবনে আবদুল মালিক ৭১৫ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হন। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র ২বছর। হাজ্জাজ কর্তৃক ইরাকের কারাগারে বন্দিকৃত হাজার হাজার লেখককে তিনি মুক্তি দান করেন। তাঁর খিলাফতের প্রভাতেই কতিপয় বিশ্ববিজয়ী মুসলিম সেনাপতির রক্তে সে তার হাত রঞ্জিত করে।

১. হাজ্জাজের সাথে শত্রুতার জের ধরে তার ভ্রাতষ্পুত্র ও জামাতা সিন্ধুর শাসক মুহাম্মদ বিন কাসিমকে হত্যা করেন।

২. খুরাসান শাসক কুতাইবা বিন মুসলিম হাজ্জাজের স্বহস্তে গঠিত বীর সেনানী। সুলাইমানের চিন্তার পরিপন্থী ছিল বলে কালজয়ী সেনাপতি কুতাইবা বিন মুসলিমকে নৃশংস পন্থায় হত্যা করা হয়।

৩. সুলায়মানের মনোরঞ্জন বিরোধী কাজের কারণে জিঘাংসার শিকার হন আফ্রিকা ও স্পেন বিজয়ী বীর মূসা বিন নুসাইর ও তারিক বিন যিয়াদ। তাঁদের সহায় সম্পত্তি কেড়ে নেয়া হয়। অনাহারে অর্ধাহারে তাঁদেরকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেন।

সুলায়মান তাবারিস্তান ও জুরজান জয় করলেও কনস্টান্টিনোপল অবরো ধে ব্যর্থ হন। ৭১৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(৮) উমর ইবনে আবদুল আজিজ ৭১৭-৭২০

সুলায়মানের পর তার চাচাত ভাই উমর ইবনে আবদুল আজিজ ৭১৭খ্রিস্টাব্দে খলীফা হন। তাঁর মা ছিলেন উমর রা. এর দৌহিত্রী। উমাইয়া খলীফাদের মধ্যে তাঁর অবস্থান স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী। তিনিই একমাত্র উমাইয়া খলীফা, যিনি প্রচলিত অর্থে নয় বরং তিনি প্রকৃত অর্থে খলিফা ছিলেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় খুলাফায়ে রাশেদীনকে অনুসরণ করার কারণে তাঁকে 'পঞ্চম খলিফা' বলা হয়। স্বজনপ্রীতির

উর্ধে উঠে তিনি অত্যাচারী ও অনুপযুক্ত প্রাদেশিকগভর্নরদের বরখাস্ত করেন। মজলিসে শুরার মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও প্রজাবৎসল শাসন চালু করে তিনি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তিনি খলীফাদের আড়ম্বরপূর্ণ চালচলনের বিপরীতে হযরত উমর ইবন খাত্তাবের রা. এর ন্যায় সাদাসিধে ও সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন বলে 'দ্বিতীয় উমর' নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর হাশেমী নীতি, খারেজী নীতি, মাওয়ালী নীতি, রাজস্ব নীতি সর্বত্র প্রশংসা কুড়ায়। ষড়যন্ত্রকারীগণ বিষপ্রয়োগে ৭২০ খ্রিস্টাব্দে এ মহান খলিফাকে শহীদ করে দেয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৩৯ বছর।

(৯) ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক ৭২০-৭২৪

উমরের মৃত্যুর পর আবদুল মালিকের আরেক পুত্র দ্বিতীয় ইয়াযিদ ৭২০খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। ইয়াযিদ খিলাফতের সীমানার ভেতরে খ্রিস্টান ছবি মুছে ফেলার আদেশ দেন। তাঁর শাসনামলে খারিজী, বার্বার, শীয়া ও তুর্কীদের বেশ কয়েকটি মারাত্মক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। তিনি সেগুলো দমন করতে সক্ষম হন। উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য তাঁকে 'অমিতব্যয়ী উমাইয়া সন্তান'(Prodigal son of Umayyad) নামে পরিচিতি লাভ করেন।

(১০) হিশাম ইবনে আবদুল মালিক ৭২৪-৭৪৩

আবদুল মালিকের আরেক পুত্র হিশাম ইবনে আবদুল মালিক৭২৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় আরোহণ করেন। তিনি ধৈর্যশীল, শান্ত, কৌশলী ও যোগ্যতা সম্পন্ন শাসক ছিলেন। তার শাসনামলে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। তিনি ক্ষমতায় বসেই অনেক গভর্নরকে পদচ্যুত করে অন্যদের ক্ষমতায় বসান এবং একেরপর এক সৃষ্ট বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি অনেক যুদ্ধ পরিচালনা করেন। ৭২৫ খ্রিস্টাব্দে কাহতানী ও মুদারীর গোত্রের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।সেখানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে মুসলমানদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হয়।৭২৭ খ্রিস্টাব্দে খাতাল ও গোরের ওপর সৈন্য পরিচালনা করে সফলতা লাভ করে।

হিশামকে বিশেষ করে তুর্কীদের সাথে খুব বেশী রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। তুর্কীদের বিরুদ্ধে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানে মারওয়ান বিন মুহাম্মদকে প্রেরণ করেন। তিনি ৭৩৩ খ্রিস্টাব্দে একলক্ষ ত্রিশ হাজারের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একাধারে পদানত করেন। তিনি সাইরাকিউস, সার্ডিনিয়া ও জর্জিয়া জয় করতে সক্ষম হন। হামাজাইন, সাকাদান, সাকাজ ও শারওয়াযানের শাসকগণ থেকে জোর পূর্বক রাজস্ব ধার্য করেন। সে অঞ্চলে ইসলামী শক্তির প্রভাব বিস্তৃত হয়। অনারবদের মাঝে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটে। তবে অনারব মুসলিমদের অধিকারের প্রশ্নে উমাইয়াদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি হয়। হিশাম উত্তর সিরিয়ার রাসাফাতে তাঁর দরবার স্থাপন করেন। এটি দামেস্কের চেয়ে বাইজেন্টাইন সীমান্তের বেশী নিকটে ছিল। বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পুনরায় শুরু হয় এবং কনস্টান্টিনোপল শেষ বার অবরোধ করে ব্যর্থ হয়। ৭২৪ খ্রিস্টাব্দে হিশাম রাসাফা নামক এলাকায় ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ২০ বছর 'খিলাফতে বনু উমাইয়া, যাইনুল আবেদীন মিরাঠী, পৃ. ১৬২-১৭৭'।

॥(১১) ওয়ালিদ ইবনে ইয়াজিদ ৭৪৩-৭৪৪

হিশামের পর দ্বিতীয় ইয়াযিদের পুত্র দ্বিতীয় ওয়ালিদ ৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হন। ওয়ালিদ ছিলেন একজন বিলাসী, পর্যটনপ্রীয় যুবক। পার্থিব সুখ-ভোগে আগ্রহী। কেবল সঙ্গীত ও রক্তবর্ণ শরাব ছাড়া অন্য কিছুই তার হৃদয়গ্রাহী ছিল না। বিরোধিদের মৃত্যুদণ্ড দানে ও কাদারিয়াদের ওপর নির্যাতনের মাধ্যমে দ্রুত তিনি অনেকের শত্রুতে পরিণত হন। বিশেষ করে ইয়াহইয়া বিন যায়েদকে হত্যা করে জন সম্মুখে ঝুলিয়ে দেয়ায় সর্বস্তরের জনগণ তার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী খলীফা ইয়াযিদ তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করে তাঁকে হত্যা করে। ওয়ালিদ মাত্র তিন মাস ক্ষমতায় ছিল।

(১২) ইয়াযিদ ইবনে ওয়ালিদ ৭৪৪

ওয়ালিদ ইবনে আবদুল মালিক এর পুত্র ইয়াযিদ-ওয়ালিদকে হত্যা করে ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় বসে। ইয়াযিদ তার শাসনামলে ওয়ালিদ কর্তৃক সেনাবাহিনীর প্রতি বর্ধিত ভাতা মওকুফ করে দেয়ায় সুনাম অর্জন করেন এবং কাদারিয়াদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। শাসনের ছয় মাসের মাথায় তিনি প্লেগ রোগে মৃত্যুবরণ করেন।

(১৩) ইবরাহিম ইবনে আল ওয়ালিদ ৭৪৪

ইয়াযিদ তার ভাই ইবরাহীমকে তার উত্তরসূরী মনোনীত করেন। তাই ইয়াযিদের মৃত্যুর পর ইবরাহীম খলীফা হন। কিন্তু প্রথম মারওয়ানের নাতি মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ইবরাহীমের খিলাফতকে সমর্থন করেনি। যাযিরা থেকে একটি সেনাদল নিয়ে দামেস্কে প্রবেশ করেন। এখানে তিনি নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তার সৈন্যরা ইবরাহীমকে হত্যা করে।

(১৪) মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ ৭৪৪-৭৫০

মারওয়ান ইবনে মুহাম্মদ-ইবরাহীমকে হত্যা করে ৭৪৪ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে বসে। মারওয়ান ছিলেন একজন দুঃসাহসী সম্রাট। কিন্তু তিনি এমন দুর্যোগপূর্ণকালে শাসনভার গ্রহণ করেন, যখন সর্বত্র গোলযোগ ও রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধকরণে তার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। একেরপর এক বিদ্রোহ আরম্ভ হয়ে গেল, আবদুল্লাহ বিন মুআবিয়ার বিদ্রোহ, সিরিয়ার বিদ্রোহ, সুলায়মান বিন হিশামের বিদ্রোহ, ইরাকে খারেজীদের বিদ্রোহ। মারওয়ান বিদ্রোহ দমন করে ইরাকে পুনরায় কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হন, কিন্তু এসময় খোরাসানে আরও বড় হুমকির জন্ম হয়। তিনি সামরিক অভিযান চালিয়ে তুর্কিস্তান, খাযার ও লান প্রভৃতি অঞ্চল জয় করে উমাইয়া খিলাফতের আওতায় নিয়ে আসেন। ৫বছর ১০মাস রাষ্ট্র পরিচালনা করে তিনি দৃশ্যপট থেকে বিদায় নেন।

আব্বাসীয় আন্দোলন ও উমাইয়াদের পতন

অযোগ্যতা, আমোদ ও বিলাসে মত্ত উমাইয়াদের সামরিক শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে যায় এবং অর্থনৈতিক কাঠামো যখন বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে, তখন আরব অনারব, শিয়া, সুন্নী, খারিজী, মাওয়ালী সবাই আবু মুসলিম খোরাসানীর নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়।

৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কালো পতাকা উত্তোলন করে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করেন। উমাইয়া গভর্নর নাসর ইবনে সায়ারকে খুরাসান থেকে বহিষ্কার করেন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে বনু আব্বাসীয়গণ কুফা হস্তগত করেন। ইরাকে এটিই ছিলো উমাইয়াদের শেষ শক্ত ঘাঁটি। আবুল আব্বাস আস সাফফাহ কুফার মসজিদে খলিফা হিসেবে বায়আত গ্রহণ করেন এবং তাঁর বাহিনীকে মোসেল নগরীর দিকে অগ্রসর হতে নির্দেশ দেন। মারওয়ান উপায় না দেখে এক লক্ষ বিশ হাজারের বিশাল বাহিনী নিয়ে জাব নদীর পূর্ব তীরে কুসাফ নামক স্থানে অগ্রসর হন। ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারী দু'বাহিনী জাবের যুদ্ধে মুখোমুখি হয় এবং মারওয়ান শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফিলিস্তিন হয়ে মিসরে পলায়ন করেন। আব্বাসীয় সৈন্যরা পিছু ধাওয়া করে পথিমধ্যে তাঁকে হত্যা করে। ক্ষমতা আব্বাসীয়দের হাতে এসে পড়ে। দ্বিতীয় মারওয়ানের পতনের মধ্য দিয়ে ৮৯ বছরের উমাইয়া খিলাফতের প্রদীপ চিরকালের জন্য নিভে গেল 'খিলাফতে বনু উমাইয়া, যাইনুল আবেদীন মিরাঠী, পৃ. ১৯২'।

উমাইয়াদের পতনের কারণ

১. উমাইয়া-আব্বাসীয়া সকলেই মুসলিম, এক জাতি। নিজেদের মধ্যকার গোত্রীয় ও জাতিবিদ্বেষ-ই পতনের প্রধান কারণ।

২. ক্ষমতালিপ্সায় মত্ত হয়ে শাসকহত্যাকে ক্ষমতায় আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে নির্ধারণ।

৩. প্রতিহিংসা বশতঃ যোগ্য ও আদর্শিক নেতৃত্বকে অবমূল্যায়ন করা ও তাদেরকে হত্যা করা।

৪. ইসলামের দ্রুত প্রসারের কারণে ব্যাপক মাত্রায় অনারবরা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তাদের মাঝে সমতা না করার কারণে বিদ্রোহের সৃষ্টি ও কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

৫. বিনা ইস্যুতে গভর্নরদেরকে অপসারণ করে আত্মীয়দের ক্ষমতায় প্রদান করা।

৬. মর্যাদার দিক দিয়ে আরব-অনারবের বিভাজন। এর ফলে সাম্রাজ্যজুড়ে সমস্যার সৃষ্টি।

৭. ক্ষমতার মোহে আচ্ছন্ন হওয়া ও আত্ম কলহ।

৮.রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বুদ্ধিজীবি মহলে অসন্তোষ।

৯.সুষ্ঠু উত্তরাধিকার নীতির অভাব।

১০.পরবর্তী খলিফাদের অযোগ্যতা।

১২. শিয়া সম্প্রদায়ের ক্ষোভ।

১৩. গণসমর্থনের অভাব।

১৪. খারিজী বিদ্রোহ।

'খিলাফতে বনু উমাইয়া, যাইনুল আবেদীন মিরাঠী '।

উমাইয়াদের অবদান

১. মুসলিম বিশ্বের সীমানাকে বৃদ্ধি করে ৫.৭৯ মিলিন বর্গমাইল (১,৫০,০০,০০০ বর্গ কিমি.) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

২. আরবী ভাষাকে প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। রাষ্ট্রীয় দলিল ও মুদ্রা

আরবীতে জারি করা হয়।
৩. রাজনৈতিক সংস্কার ও প্রশাসনিক কাঠামোকে বিন্যস্ত করা হয়- ১.দিওয়ান আল খারাজ, ২.দিওয়ান আল রাসাইল, ৩.দিওয়ান আল খাতাম, ৪.দিওয়ান আল বারিদ, ৫.দিওয়ান আল কুদাত, ৬.দিওয়ান আল জুন্দ।
৪. স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটানো হয়।
৬. নৌবাহিনী প্রতিষ্ঠা করা হয়।
৪. বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাস্ত্রের উদ্ভাবন করা হয়- চিকিৎসা বিজ্ঞান (Medicine), রসায়ন (Chemistry), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy), গণিত (Mathematics), পদার্থবিজ্ঞান (Physics), দর্শন (Philosophy), ভূ গোল (Geography), স্থাপত্যবিদ্যা (Architecture) হস্তলিখন বিদ্যা (Calligraphy) আইনশাস্ত্র (Law), ইতিহাস (History), সমাজবিজ্ঞান (Sociology), রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)
৫. ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশদ খিদমাত আঞ্জাম দেয়া হয়-হাদীস শাস্ত্র, তাফসীর শাস্ত্র, ফিকাহ শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র ইত্যাদি।
৬. কুরআন শরীফের হরকাত লাগানো হয়।
৭. মাইলপোষ্ট স্থাপন, নদী খনন, সরাইখানা নির্মাণ, হাসপাতাল ও দুস্থ মানুষের জন্য আশ্রয় শিবির স্থাপন করা হয়। এক কথায় ৮৯ বছরের উমাইয়া খিলাফত সারা পৃথিবীর মানুষের জন্য আদর্শ স্থাপন করে গেছে ‘খিলাফতে বনু উমাইয়া, যাইনুল আবেদীন মিরাঠী, পৃ ১৬২-১৭৭’।

তথ্যসূত্র:

১. ড. ইনাম-উল হক, ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস, পৃ.২৭-২৮;
ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ. ৫৭৬;
Vidyha Dhar Mahajan, Muslim Rule in India, p. 25.
২. The crescent on the horizon was destined to rise to the zenith in the imperial sky, but it was to remain only a crescent and not a full moon.-S.R Sharma, Studies on Medieval Indian History.)
৩. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ ৫৭৬
৪. ড. তারা চাঁদ, ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব,পৃ. ২৭,৩৬
৫. ড. আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, পৃ.১৩; অধ্যাপক কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস [মধ্য ও আধুনিক যুগ], পৃ.১৮
৬. আবূ যফর নাদভী, তারীখে সিন্দ, পৃ. ৮৭, ১২৫,১২৬,১৬১; হামিদ আল কুফী, চাচনামা, পৃ. ৮৬; মুফতী মুহাম্মদ মুশতাক তিজারভী, বাররে সাগীর মে ইশা'আতে ইসলাম কী তারীখ,পৃ. ২৯-৬০
৭. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ ৫৭৭
৮. Dr. Iswari Prasad, A Short History of Muslim Rule in India, p.39)
৯. মাওলানা আবদুল হাই, নুযহাতুল খাওয়াতির, ১খ., পৃ.৫৯,৮১,৮৫,৮৬আবূ যফর নাদভী, তারীখে সিন্দ, পৃ.৩৭২; ড. আবদুল করিম, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন, পৃ.১১
১০. বুযর্গ ইবনে শাহরে ইয়ার, 'আজাইবুল হিন্দ, পৃ. ৩; আবূ যফর নাদভী, তারীখে সিন্দ, পৃ.৩৭০
১১. ড. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, ভারতের ইতিহাস কথা, পৃ ৫৭৬-৫৭৭
১২. ইবনে নাদীম, আল ফিহরিস্ত, পৃ, ৫৩০;
মুফতী মুহাম্মদ মুশতাক তিজারভী, বাররে সাগীর মে ইশা'আতে ইসলাম কী তারিখ, পৃ. ১১০
১৩. Havell, Aryan Rule in India, p. 250
১৪. অধ্যাপক হাসান আলী চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, পৃ. ৩০-৩৩
১৫. অধ্যাপক হাসান আলী চৌধুরী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস, পৃ. ৩০-৩৩

১৬. অধ্যাপক কে. আলী, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস [মধ্য ও আধুনিক যুগ], পৃ.১৯
১৭. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৮খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৬০;
১৮.আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩খণ্ড, পৃ. ৪৫৫;
১৯. আল ইসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩খণ্ড, পৃ. ৪৫৫;
২০.ফিলিপ কে. হিট্টি, আরব জাতির ইতিহাস, পৃ.২৩৪;
২১.সাইয়্যেদ আমীর আলী, এ শর্ট হিস্ট্রি অব সারাসিন্স,পৃ. ১১৫;
২২.মুফতী যায়নুল আবেদীন মিরাঠী, খিলাফতে বনী উমাইয়া, পৃ. ১৬২-১৬৩;
২৩. ইবনে কাছীর, তারীখে ইবনে কাছীর, ৯খ., পৃ.২৪৮;
২৪. ড.ওসমান গনী, উমাইয়া খিলাফাত, কোলকাতা, পৃ.১১৮;
২৫. Edwyan Hole, Andalusia: Spain under the Muslims. pp. 48;
২৬. R. Dozy, Spanish Islam, pp.232-234;
২৭.ড. এম. আবদুল কাদের/ড. সায়্যিদ মাহমূদুল হাসান, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস, পৃ. ১৮৬-১৯১;
২৮ J.Draper, History of the Intellectual Development of Europe, vol. ii, London, 1910, pp. 230-231;
২৯. মাওলানা রহমতুল্লাহ কাউসার নিযামী, খিলাফতে বনু উমাইয়া।

.....

লেখক পরিচিতি
অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ওমর গণি এম.ই.এস কলেজ, চট্টগ্রাম।

চরমোনাই মাদরাসা থেকে প্রায় ৩ কি. মি. উত্তরে চরমোনাই বুখাইনগর
মূল সড়কের পূর্ব পাশ্বে ডিংগামানিক গ্রামের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত

কারীমিয়া রূহানিয়া মাদরাসা

[ধর্মীয়ও পার্থিব জ্ঞানে সমৃদ্ধ]

পৃষ্ঠপোষক

আমীরুল মুজাহিদীন হযরত পীর সাহেব চরমোনাই

বিভাগ সমূহ

কিরআতুল কুরআন বিভাগ

বয়স্ক কুরআন শিক্ষা বিভাগ | কে. জি. বিভাগ

প্লে গ্রুপ থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত

পরিচালক

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্

মোবাইল ঃ ০১৭৪৭ ৭৮৩১১০

যোগাযোগ : ডিংগামানিক, বুখাইনগর চরমোনাই, বরিশাল

স্পেনে মুসলিম শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

আ হ ম আলাউদ্দীন

রোমানদের পর স্পেনকে শাসন করেছিল ভিজিগথিরা। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মধ্যে গথ বা ভিজিগথ একটি জাতি। খ্রিস্টীয় ৫ম শতকে ভান্ডালদেরকে বিতাড়িত করে তারা স্পেনের ক্ষমতা দখল কলে। প্রায় তিনশত বছর তারা স্পেন শাসন করে। তাদের বৈষম্যমূলক শাসনে স্পেনের সমাজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। রাজা, ধর্মযাজক, অভিজাতবর্গের জুলুমে স্পেনবাসী অস্থির হয়ে পড়ে। অভিজাতরাই ছিল দেশের ভূ-সম্পত্তির প্রকৃত মালিক। সাধারণ জনগণ ছিল ভূমিদাস। ভূমিমালিক ভূমি বিক্রয় করলে ভূমিদাসরাও এর সাথে বিক্রয় হয়ে যেত। তারা কোন মৌলিক চাহিদার দাবী করতে পারত না। শাসকদের অত্যাচারে অনেকে দেশ ছেড়ে চলে যায়। ফলে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা দেখা দেয়। সর্বশেষে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার কারণে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজা উয়াম্বারের সিংহাসনচ্যুতির পর ভিজিগথিদের শাসনের অবসান হয়ে রাজা রডারিকের শাসন-শোষণ শুরু হয়। রডারিকের শোষণ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা সর্বশেষ উত্তর আফ্রিকার গভর্নর মুসা বিন নুসাইরকে স্পেন অভিযানের আমন্ত্রণ জানায়।

মুসা বিন নুসাইর ছিলেন দামেস্কের উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদের অধীনে উত্তর আফ্রিকার গভর্নর। তারই সহচর সেনানায়ক তারিক বিন যিয়াদের নেতৃত্বেই ৭১১ খ্রি. স্পেন বিজয় হয়। তারিক বিন যিয়াদ ও মূসা বিন নুসাইরের নেতৃত্বে স্পেন বিজয় হলেও

তারা উভয়ে স্পেন শাসন করেছেন মাত্র তিন বছর। পরবর্তিতে তারা রাজধানী দামেস্কে ফিরে যায়। অতপর তাদের প্রতিনিধিগণ শাসন পরিচালনা করেন। নিম্নে তাদের নাম ও সময়কাল উল্লেখ করছি।

১। তারিক বিন যিয়াদ (৭১১ খ্রি.-৭১২ খ্রি.)
২। মূসা বিন নুসাইর (৭১২ খ্রি.-৭১৪ খ্রি.)
৩। আব্দুল আজিজ ইবনে মূসা (৭১৪ খ্রি.-৭১৬ খ্রি.)
৪। আইয়ূব ইবনে হাবিব আল- লাখমী (৭১৬ খ্রি.-৭১৬ খ্রি.)
৫। আল হোর ইবনে আব্দুর রহমান আস- সাকাফী (৭১৬-৭১৮ খ্রি.)
৬। আস সামাহ ইবনে মালিক আল- খাওলানি (৭১৯-৭২১ খ্রি.)
৭। আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ আল গাফিকী (৭২১-৭২১ খ্রি.)
৮। আনবাসা ইবনে সুহাইম আল-কালবি (৭২১ খ্রি.- ৭২৫ খ্রি.)
৯। উমর ইবনে আব্দুল্লাহ আল ফিহরী (৭২৫-৭২৫ খ্রি.)
১০। ইয়াহইয়া ইবনে সালামা আল কালবি (৭২৫-৭২৬ খ্রি.)
১১। উসমান ইবনে আবি উবায়দা (৭২৬-৭২৭ খ্রি.)
১২। উসমান ইবনে আবীনাস আল- কাসিমি (৭২৭-৭২৮ খ্রি.)
১৩। হুসায়ফা ইবনে আহওয়াস আল-কায়সি (৭২৮-৭২৯ খ্রি.)
১৪। আল হায়সাম ইবনে উবায়দ আল-কালবি (৭২৯-৭৩০ খ্রি.)
১৫। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-আশজি (৭৩০-৭৩০ খ্রি.)
১৬। আব্দুর রহমান আল-গাফিকি (৭৩০-৭৩২ খ্রি.)
১৭। আব্দুল মালিক ইবনে কাতান আল-ফিহরি (৭৩২-৭৩৪ খ্রি.)
১৮। উকবা ইবনুল হাজ্জাজ আস-সাহুলি (৭৩৪-৭৪১ খ্রি.)
১৯। আবদুল মালিক ইবনে কাতান আল-ফিহরি (২য় বার) (৭৪১-৭৪১ খ্রি.)
২০। বালজ ইবনে বিশর আল কুশাইরি (৭৪১-৭৪২ খ্রি.)
২১। সালাবা ইবনে সালাযা আল-আমিলি (৭৪২-৭৪৩ খ্রি.)
২২। আবুল খাততার হুসসাম ইবনে দিবার আল-কালবি (৭৪৩-৭৪৫ খ্রি.)
২৩। তৈয়ব ইবনে সালামা আল হাদ্দানি (৭৪৫-৭৪৭ খ্রি.)
২৪। ইউসুফ ইবনে আব্দুর রহমান আল-ফিহরি (৭৪৭-৭৫৬ খ্রি.)

হিন্দুকুশ থেকে পিরোনিজ, চীনের মহাপ্রাচীর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের তীর পর্যন্ত উমাইয়া সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমানা দামেস্কের অধীনে ছিল। এত বিরাট অঞ্চল শাসনের জন্য প্রয়োজন সুনিপূণ, দক্ষ, বিচক্ষণ ও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন খলিফা। কিন্তু দামেস্কের খলিফা হিশামের মৃত্যুর পর এমন যোগ্য খলিফা আর আসেনি। ফলে দূর্বল খলিফাদের ওপর নেমে আসে বিপর্যয়। আব্বাসীয় আন্দোলনে উমাইয়া খেলাফতের পতন হয় এবং ৭৫০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আব্বাসিয়া উমাইয়াদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করে। উমাইয়া শাহজাদা, তরুণ যুবক আব্দুর রহমান আদ দাখিল কোনো রূপে বেঁচে ছদ্মবেশে স্পেনের দিকে অগ্রসর হয়ে ৭৫৫খ্রি. সালে মরক্কোর সিউটা বন্দরে পৌঁছেন। সেখানে তার মাতুলগোষ্ঠী থাকায় তিনি বার্বারদের সমর্থন লাভ করেন।

আব্দুর রহমান আদ-দাখিল (১ম) ৭৫৬-৭৮৮ খ্রি.

ভাগ্বান্বেষী আব্দুর রহমান সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে কোন প্রতিরোধ

ছাড়াই একের পর এক অঞ্চল দখল করেন। ৭৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ মে মাসারবরাহ যুদ্ধে ইউসুফ আল-ফিহরিকে পরাজিত করে রাজধানী কর্ডোভা দখল করেন।
আব্বাসিয় খলিফা আল মানসুরের নামে তিনি খুৎবা পড়তেন। পরবর্তীতে নিজেই আমিরুল মুসলিমিন উপাধী ধারণ করেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্র ও অবিচলভাবে স্পেন বিজয় ও শাসন পরিচালনা করেন। এজন্যই আব্বাসিয় খলিফা আল মানসুর বিস্মিত হয়ে তাকে "সকরে কুরাইশ" বা কুরাইশদের বাজপাখি নামে অভিহিত করেন। তিনি নগর জীবনের অনেক উন্নতি সাধন করেন। বিভিন্ন ধরণের স্থাপনা নির্মাণ করেন। মাঝে মাঝে কঠোরতা প্রকাশ করলেও মূলত সদয়, উন্নতরুচিসম্পন্ন ছিলেন। ৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন। কর্ডোভাতেই তাকে সমাহিত করা হয়।

হিশাম (১ম) ৭৮৮-৭৯৬ খ্রি.

আব্দুর রহমান আদ-দাখিলের মৃত্যুর পর পরই পুত্র হিশাম ৩২ বছর বয়সে স্পেনের আমীর হন। তার নম্রতা, অমায়িক ব্যবহার, ধর্মীয় অনুশাসন ও ন্যায় বিচার তাকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলে। তিনি অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ আমীর ছিলেন।
ধার্মিক ও সৎ ব্যক্তিদের তিনি সরকারী কাজে নিয়োগ দিয়েছেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। ৮০ বছর বয়সে ৭৯৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

হাকাম (১ম) ৭৯৬-৮২২ খ্রি.

হিশাম পুত্র হাকাম ২২ বছর বয়সে পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। বিলাসি জীবনযাপনে অভ্যস্ত হওয়ায় উলামাদের সাথে তার বিরোধ দেখা দেয়। তার দুই জন চাচা ফ্রান্সের শার্লেমেনের সহযোগীতায় বিদ্রোহ করলে হাকাম তাদের দমন করেন। তার সময়ে অনেকগুলো বিদ্রোহ হয়। প্রায় সবগুলোই তিনি সফলতর সাথে দমন করেন। ৮২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

আব্দুর রহমান (২য়) (৮২২-৮৫২ খ্রি.)

আল হাকামের মৃত্যুর পর তার পুত্র আব্দুর রহমান কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। পাণ্ডিত্য, শৌর্যবীর্য ও প্রতিভায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তার রাজত্বকালে প্রজাসাধারণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করলেও খ্রিস্টানরা বিদ্রোহ করে। অমুসলিমদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা এমনকি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ প্রদান করা হতো, তা সত্ত্বেও খ্রিস্টানদের বিভিন্ন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ২য় আব্দুর রহমান এ সকল বিদ্রোহীদের কঠোরভাবে শাস্তি প্রদান করেন। ৮৫২ খ্রিস্টাব্দে ২য় আব্দুর রহমান ইন্তেকাল করেন।

প্রথম মুহাম্মদ (৮৫২-৮৮৬ খ্রি.)

প্রথম মুহাম্মদ তার পিতার কর্মধারা অব্যহত রাখেন। তার শাসনামলেও গোলযোগ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। ৮৮৬ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মুনজির (৮৮৬-৮৮৮ খ্রি.

১ম মুহাম্মদদের মৃত্যুর পর তার পুত্র মুনজির ৮৮৬ খ্রি.কর্ডোভার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার ভাই আব্দুল্লাহর চক্রান্তে চিকিৎসক তাকে বিষ প্রয়োগ করলে

৮৮৮ খ্রি. তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

আব্দুল্লাহ (২য়) (৮৮৮-৯১২ খ্রি.)

মুনজিরের কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তার ইন্তিকালের পর ভাই আব্দুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজ্যের অবস্থা ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ। ৯১২ খ্রি. তার মৃত্যুতে স্পেনে স্বাধীন আমিরদের শাসনের অবসান হয়।

তৃতীয় আব্দুর রহমান আল নাসির (৯১২-৯৬১ খ্রি.)

ভেতর ও বাইরের ষড়যন্ত্রে স্পেনের খিলাফত এ পর্যায়ে কর্ডোভা ও এর সন্নিহিত এলাকায় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে প্রথম আব্দুর রহমানের বংশ থেকেই আবির্ভাব ঘটে এক রাষ্ট্রনায়কের। তিনি হলেন তৃতীয় আব্দুর রহমান। তেইশ বছর বয়সে ৯১২ খ্রি. তিনি শাসনভার গ্রহণ করে একেরপর এক প্রদেশ পুনর্বিজয় করেন। সমকালিন জনগণ একজন খলিফার কাছে যেসব গুণ প্রত্যাশা করতো তৃতীয় আবদুর রহমান সেসব গুণের অধিকারী ছিলেন। আবদুর রহমান ৯২৯ খ্রি. ১৬ জানুয়ারী নিজেকে খলিফা ঘোষণা করেন। তিনি আমীরুল মুমিনীন উপাধি ধারণ করেন। স্পেনের উমাইয়া শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তার শাসন সম্পর্কে হিট্টি বলেন, এর আগে কর্ডোভা কখনও এত সমৃদ্ধ হয়নি, আন্দালুস এত ধনশালী হয়নি এবং রাজ্যও এত বিস্তৃত হয়নি। তিনি ৭৩ বছর বয়সে ৯৬১ খ্রি. ইন্তেকাল করেন।

দ্বিতীয় আল-হাকাম (৯৬১-৯৭৬ খ্রি.)

দ্বিতীয় আল-হাকাম পিতা তৃতীয় আব্দুর রহমানের ইন্তেকালের পর সুলতান হিসেবে মনোনিত হন। ঐতিহাসিক মাসউদী তাকে সকল শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন শাসক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে অনেক অবদান রাখেন। রাজধানীতেই ২৭টি অবৈতনিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে আসে। তাঁর সময়ে মুসলিম স্পেনে খ্রিস্টানদের পুর্নদখলের প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর রাজত্বকাল ছিল মুসলিম স্পেনের স্বর্ণযুগ।

হাজীব আল-মানসুর (৯৭৬-১০০২ খ্রি.)

আল হাকামের ইন্তেকালের পর পুত্র ২য় হিশাম আল-মুয়াইয়াদ (৯৭৬-১০০৯ খ্রি.) পিতার উত্তরাধীকারী হন। সিংহাসনে আরোহণের সময় তার বয়স ছিল ১২ বছর। অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তার মা তার পক্ষে রাজকার্য পরিচালনা করেন। পরবর্তীতে হিশামের সভাসদ "মুহাম্মদ ইবনে আমির" প্রধান উপদেষ্টার পদমর্যাদায় হাজিব নামে অভিহিত হন। ২য় হিশাম ছিল নাম নাম মাত্র খলিফা। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব পেয়ে তিনি ক্রমে সবকিছু অধিকার করেন এবং স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তিনি ৯৮১ খ্রিস্টাব্দে আল মানসুর বিল্লাহ উপাধি গ্রহণ করেন। স্পেনের খ্রিস্টানরা তার মৃত্যুর দিনকে মুক্তির দিন হিসেবে পালন করে। ১০ আগস্ট ১০০২ খ্রি. ৬১ বছর বয়সে যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তেকালের সময় সমগ্র মুসলিম স্পেন অখণ্ড ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। তিনি যে পথে ক্ষমতায় আসেন তা যদিও সমর্থনযোগ্য ছিল না, কিন্তু সততা, আন্তরিকতা

ও বিশ্বস্ততার সাথে তিনি কাজ করেন।

উমাইয়া খলিফাদের পতন

১০০২ সালের পর মুসলিম স্পেনে উমাইয়া খেলাফতের প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে থাকে। হাজিব আল মনসুরের মৃত্যুর পর খলিফা দ্বিতীয় হিশাম, মনসুরের পুত্র আব্দুল মালিককে রাজপ্রাসাদের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অর্পণ করেন। ১০০৮ খ্রি. তার ভাই আব্দুর রহমান তাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে তার স্থলাভিষিক্ত হন। তখন থেকে স্পেনে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়।। আরবগণ হয়ে পড়ে নিঃস্ব। বার্বার স্লাভগণ সামরিক ক্ষমতা লাভ করে, তারা খলিফার দেহরক্ষি হয়ে ইচ্ছামত খলিফা নিয়োগ ও পদচ্যুত করত। এর ফলে খলিফার মর্যাদা হ্রাস পায়, কার্যত খিলাফতের পতন ঘটে।

স্পেনে প্রতিষ্ঠিত বিশাল উমাইয়া সাম্রাজ্য একাদশ শতাব্দিতে এসে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে। প্রায় প্রতিটি প্রদেশই স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধেই ২০টি রাজ্য গড়ে ওঠে। আরবগণ এ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যকে "মুলুক আল তাওয়াইফ" (ক্ষুদ্ররাজ্য) বলে অভিহিত করত। রাজ্য শাসকগণ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে মেতে ওঠে। এক পর্যায়ে তারা এতই দুর্বল হয়ে পড়ে যে, মুসলিম প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টানদের সামরিক সাহায্য কামনা করত। এ দিকে মুসলমানদের দুর্বলতার সুযোগে পার্শ্ববর্তী খ্রিস্টান রাজাগণ বিভিন্ন মুসলিম রাজ্যের ওপর আক্রমণ করে। এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলো দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে। এক পর্যায়ে খ্রিস্টান রাজা ৬ষ্ঠ Alfonso পুরো স্পেন দখলের মানষে মুযারাবদের সাহায্যে ৪,০০০ সৈন্য নিয়ে সেভিলের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে। অনেক শহর লুণ্ঠন এবং ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী সমস্ত এলাকা দখল করলে মুসলমানদের হুশ ফিরে আসে। এরপর মুসলমানগণ সম্মিলিতভাবে খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করেন এবং আফ্রিকার মুরাবিত শাসক ইউসুফ বিন তাশফিনকে Alfonso এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে স্পেনে আমন্ত্রণ জানান।

মুরাবিত শাসন (১০৯০-১১৪৯ খ্রি.)

আমন্ত্রণ পেয়ে আমির ইউসুফ ১০৮৫ খ্রি. বিশাল বাহিনী নিয়ে স্পেনে আগমন করেন এবং খ্রিস্টানদেরকে পরাজিত করেন। এরপর আমির ইউসুফ ৩০০০ সৈন্য রেখে স্পেন ত্যাগ করেন। পুনরায় খ্রিস্টানরা আক্রমণ করলে ১০৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্পেনে আগমন করেন।

ইউসুফ বিন তাসফিন মুসলিম রাজাদের পারস্পরিক অনৈক্য এবং খ্রিস্টান নৃপতিদের সাথে সুসম্পর্ক দেখে খুবই ক্ষুব্ধ হন। তিনি তাদেরকে একেরপর এক ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং স্পেনের একটি বড় অংশ নিজ রাজ্যের অন্তভূর্ক্ত করেন। এভাবে টলেডো ও সারগোসা ছাড়া সমগ্র স্পেন মরক্কোর সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। আমির ইউসুফের মৃত্যুর পর তার পুত্র আলী ইবনে ইউসুফ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মরক্কোতে মুওয়াহহিদুনদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের কারণে আলির পতন ঘটে এবং মুওয়াহহিদদের আগমন ঘটে।

মুওয়াহহিদ শাসন (১১৪৬-১২৪৯ খ্রি.)

জনৈক বার্বার সর্দার মুহাম্মদ ইবনে তুমআত (১০৭৮-১১৩০খ্রি.) এই আন্দোলন

শুরু করেন। ১১৩০ খ্রিস্টাব্দে তার বন্ধু জেনারেল আব্দুল মুমিন ইবনে আলির হাতে মরক্কোর মুওয়াহহিদ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১১৪৬ খ্রিস্টাব্দে আব্দুল মুমিন স্পেনের মুসলিম অংশের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। নানা বিপদাপদ সত্ত্বেও প্রায় একশত বছর এটি তাদের অধীনে থাকে। শেষের দিকে খ্রিস্টানদের আক্রমণে মুসলমানগণ কর্ডোভা, সেভিলসহ বিভিন্ন রাজ্য হারায়। মুওয়াহহিদদের পতনের পর খ্রিস্টানরা একের পর এক মুসলিম জনপদগুলো দখল করে এবং মুসলমানরা দেশ ত্যাগ করতে শুরু করে।

নাসরি রাজবংশ (১২৩২-১৪৯২ খৃ.)

একের পর এক অঞ্চল হস্তচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও গ্রানাডার নাসরি রাজবংশ আইবেরিয় উপদ্বীপটিতে একমাত্র মুসলিম রাজ্য হিসেবে প্রায় আড়াইশত বছর টিকে থাকে। এটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে নাসর। ১২৩৭/৩৮ খ্রি. গ্রানাডা অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি আল হামরা দূর্গকে শাহী মহলে রূপান্তরিত করেন। আরগনের ফার্ডিন্যান্ড এবং ক্যাস্টাইলের ইসাবেলা দুজন মুসলিমবিদ্বেষী পরস্পর মৈত্রী ও বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে স্পেনে মুসলমানদের শেষ চিহ্ন মুছে ফেলতে একতাবদ্ধ হয়। অবশেষে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারী খ্রিস্টান শাসকদের কাছে গ্রানাডার শেষ সুলতান আব্দুল্লাহ "ট্রিটি অব গ্রানাডা" চুক্তির মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করেন। সমাপ্তি ঘটে স্পেনে মুসলমানদের আটশত বছরের সোনালী অধ্যায়।

৭৮০ বছরের পর্যায়সমূহ

১ম পর্যায় ঃ ৭১১-৭৫৬ খ্রি. আমির হিসেবে পরিচিত গভর্নরদের শাসন।
২য় পর্যায় ঃ ৭৫৬-৯২৯ খ্রি. স্বাধীন উমাইয়া আমিরদের শাসন।
৩য় পর্যায় ঃ ৯২৯-১০৩১ খ্রি.. উমাইয়া খিলাফতের যুগ।
৪র্থ পর্যায় ঃ ১০৩১-১২৩১ খ্রি. ক্ষুদ্র রাজাদের যুগ।
৫ম পর্যায় ঃ ১২৩২-১৪৩২ খ্রি. গ্রানাডার বনু নাসর বংশের শাসকদের শাসনামল।

স্পেনে মুসলমানদের পতনের কারণ

খ্রিস্টানদের উগ্র স্বভাব :

খ্রিস্টানরা কখনও মুসলমানদেরকে স্পেনের শাসক হিসেবে মেনে নিতে পারেনি। শাসকগণ তাদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দিলেও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে থাকে। তাদের উগ্র স্বভাব ও চক্রান্তমূলক কর্মকাণ্ড মুসলমানদের পতনের পথকে সুগম করে। ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে রিয়ো সালাদো নদীর মোহনার যুদ্ধে মুসলমানগণ পরাজিত হলে খ্রিস্টানরা নারী-শিশু নির্বিশেষে মুসলমানদের হত্যা করে। এভাবে বিভিন্ন সময়ে হত্যার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। এমনকি গ্রানাডার পতনের পর মুসলিম নিধন ও দেশ ত্যাগে মুসলমানদের বাধ্য করে। ১৫৬২ খ্রি. ৫ লক্ষ মুসলমানকে বলপূর্বক নির্বাসিত করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দির প্রথম দশকে প্রায় ৩০ লক্ষ মুসলমানকে নির্বাসিত বা হত্যা করা হয়।

শাসকদের অনৈক্য

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসকগণ বিভিন্ন সময়ে নিজেদের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়। এই সুযোগে খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে। এভাবেই মুসলিম স্পেন

ক্রমেই ক্ষুদ্র হতে থাকে।

অভ্যন্তরীণ সংঘাত

ক্ষমতা দখলের জন্য পিতা-পুত্র, ভাই-ভাই সংঘাত পরিলক্ষিত হয়। সর্বশেষ গ্রানাডার সুলতান আবু আব্দুল্লাহ পিতা আবুল হাসানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে আল-হামরা দখল করে।

ভোগ-বিলাস ও অনাচার

শেষদিকের কিছু শাসক ভোগ-বিলাস, আমোদ-প্রমোদ, বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ ও অনাচার-পাপাচারে লিপ্ত হয়। এই সুযোগ খ্রিস্টানরা মুসলমানদের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে এবং মুসলমানদের পতন ঘটায়।

তথ্যসূত্র:

ক্স স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস ও অবদান- কাজী মোহাম্মাদ হানিফ
ক্স স্পেনের কান্না- তাকী উসমানী
ক্স উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের মুসলমানদের ইতিহাস- ড. এম. আব্দুর কাদের, ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান
ক্স স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস- এ. এইচ. এম শামসুর রহমান।
ক্স স্পেনে মুসলমানদের ইতিহাস এবং সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও মিশরে মুসলিম শাসন- মাহবুবুর রহমান।

.....

লেখক পরিচিতি
বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন

মাদ্‌রাসা আল্ মা'হাদুল ইসলামী-ঢাকা

[ইসলামিক ইনস্টিটিউট]
[একটি উচ্চতর দ্বীনি, দাওয়াত ও গবেষণামূলক আদর্শ শিক্ষ প্রতিষ্ঠান]

স্থান: উত্তর রায়েরবাগ [রশিদবাগ], যাত্রবাড়ী, ঢাকা।

মাদরাসার বর্তমান বিভাগসমূহ

ইফ্‌তা ও অর্থনীতি বিভাগ [মেয়াদ-এক বছর]
হিফ্‌জুল কুরআন ও নুরানী মক্তব বিভাগ
তাখাস্‌সুস ফিল আদাবিল আরাবী
কিতাব বিভাগ
প্রথম জামাত থেকে নাহ বেমীর জামাত পর্যন্ত পাঠদান

পরিচালনায়
মুফতী শেখ মুহাম্মদ বাহ্‌রুল্লাহ নদভী

যোগাযোগ
আল্ মা'হাদুল ইসলামী-ঢাকা
উত্তর রায়েরবাগ [রশিদবাগ], যাত্রবাড়ী, ঢাকা।
মোবাইলঃ ০১৭১৫ ৭৮৫৮৮২, ০১৯২৩ ৪৫০০৮০

যাতায়াতঃ যাত্রবাড়ী/ চিটাগাং রোড় থেকে রায়েরবাগ বাসস্ট্যান্ড নেমে প্রায় একশ গজ উত্তর দিকে রাস্তার পাশে।

আব্বাসিয়া খিলাফত

ইসলামী ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

মুফতী ওয়ালীয়ুর রহমান খান

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ সাফফাহ উমাইয়া শাসনের পর ১৩২ হিজরী সালে আব্বাসিয়া খিলাফতের সূচনা করেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত অবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব-এর প্রপৌত্র আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ নামানুসারেই মুসলিম শাসনামলের ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অধ্যায়কে আব্বাসিয় খিলাফত বলে অভিহিত করা হয়। আল্লামা ইবনে জরীরি তাবারী রহ. বলেন, যেদিন রাসূলুল্লাহ সা. তাঁর চাচা আব্বাস রা.কে বলেছিলেন, তোমার বংশধরেরা একদিন খিলাফতের অধিকারী হবে, সে দিন থেকেই হযরত আব্বাস রা.-এর বংশধররা খিলাফত লাভের আশা পোষণ করে আসছিলেন। তবে খিলাফত অর্জন ও পরিচালনায় আব্বাসী খলীফাদের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড কুরআন-সুন্নাহ তথা খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় ইসলামের ইতিহাসে একে প্রকৃত খিলাফতের মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

বলা বাহুল্য যে, উমাইয়া শাসনামলের হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ র.-এর অধ্যায় বাদে বাকি সময়কাল বা কর্মকাণ্ডকেও মুসলিম মনীষীগণ প্রথম স্তরের খিলাফত আখ্যা দিতে রাজি হননি। কারণ, সেখানেও ইসলাম পরিপন্থী কাজ ও অন্যায়-অবিচারের সীমা-পরিসীমা ছিল না। হত্যা, সাহাবায়ে কেরামের প্রতি নিপীড়ন, স্বজনপ্রীতি ও জোর জুলুম করে সমর্থন আদায় ইত্যাদি ছিল উমাইয়া শাসকদের অধিকাংশের আচরণ।

আব্বাসীয়রাও ভাল-মন্দ মিলিয়ে মুসলিম জাহান

শাসন করেছে। সবার শাসন এক রকম ছিলনা। ব্যক্তিগত দীনদারি, জ্ঞান, সততা ও প্রজ্ঞার কারণে অনেক খলিফা কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ইসলামের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিস্তারে অনেকের ভূমিকা গৌরবজনক। ইজতিহাদি ভুলের কারণে অনেক উলামা ও ইমামগণ যেমন পুরোপুরি সঠিক সিদ্ধান্ত শাসকদের সামনে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন, শাসকরাও বহু বিতর্কিত কাজ করে ইতিহাসে মন্দ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। প্রবৃত্তির তাড়না স্বভাবগত আচরণ বা প্রতিশোধ পরায়ণতার কারণে অনেক শাসক নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কখনও বা ভয়ঙ্কর কাজ করে বসেছেন।

আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ একাধারে মানুষ হত্যা, নির্যাতন, উপস্থিত বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় ছিলেন অনন্য। তিনি ১০৪ হিজরি সনে বালকা এলাকার হামীমাহ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১ হিজরিতে খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হন। চার বছর আট মাস শাসন পরিচালনা করে ১৩৬ হিজরির ১৩ যিলহজ মৃত্যু বরণ করেন।

আবু জাফর মানসুর

আবুল আব্বাসের মৃত্যুর পর তার বড় ভাই আবু জাফর মানসুর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব খলিফা পদে অভিষিক্ত হন। আবু জাফর মানসুর ৯৫ হিজরিতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বীরত্ব, ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ছিরেন। আরবী সাহিত্য ও ফিকাহর ওপর তার দখল ছিল। প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তিনি অপমান বোদ করেন এবং ইমাম আযম আবু হানিফা রা.কে বন্দি করার হুকুম দেন। এতে জনগণ বিদ্রোহ করতে চাইলে ইমাম আযম ঐ বিদ্রোহকে সঠিক বলে ফতওয়া দেন। এতে খলিফা মানসুর ক্ষুব্ধ হয়ে গোয়েন্দা দ্বারা বিষাক্ত খাবার সরবরাহ করে জেলখানাতেই ইমামকে শহীদ করেন। আবুল আব্বাস সাফফাহ রাজধানী কুফা থেকে আনবারে স্থানান্তর করেছিলেন। কিছুদিন পর আনবার সংলগ্ন একটি জায়গায় নিজের প্রাসাদ এবং রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বাসস্থানও নির্মাণ করেন।

ফলে সেখানে একটি ক্ষুদ্র বসতি গড়ে ওঠে এবং তার নাম রাখা হয় হাশিমিয়া।

১৪০ কিংবা ১৪১ হিজরিতে মানসুর নিজের একটি পৃথক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে চান এবং এ উদ্দেশ্যে বাগদাদ শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। বাগদাদ নগরী নির্মাণ শেষ হওয়ার পর ১৪৯ হিজরিতে বনু আব্বাসের রাজধানী বাগদাদে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় উলামায়ে ইসলাম দীনি জ্ঞান চর্চা, তা প্রণয়ন ও সংকলনের কাজ শুরু করেন। হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, সীরাত ইত্যাদি চর্চা ব্যাপক হতে থাকে।

মক্কা শরীফে ইমাম ইবনে জুরায়জ, মদীনা শরীফে ইমাম মালিক, সিরিয়ার ইমাম আওযায়ী, বসরার হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইয়ামানে সুফিয়ান সাওরী হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। ইবনে ইসহাক মাগাযী,(যুদ্ধ সংক্রান্ত ইতিহাস) ও ইমাম আবু হানিফা ফিকহর ওপর গ্রন্থাদি রচনা করেন। বাগদাদ ও রাজ দরবার ইলমী কিতাব রচনাকে পৃষ্ঠপোষকতা ও উৎসাহ দান করে।

আব্বাসীয় খিলাফতের বিস্তৃতি

পশ্চিমে মিসর-আলজেরিয়া, পূর্বে সিন্ধু পর্যন্ত বিশাল এলাকাই প্রথমে আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহের কারণে আফ্রিকা ও খুরাসান,

তুর্কিস্তানের কোন কোন দেশ পৃথক হয়ে যায়। মোটামুটি মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য এশিয়া, ইরান, তুর্কি, কাবুল, সিন্ধু ও আফ্রিকার কিছু অঞ্চল খিলাফতের আওতায় ছিল।

খিলাফতে আব্বাসিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য

তৎকালীন বিশ্বে আরবদেরকে বিজয়ী জাতি এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে বিজীত বলে মনে করা হত। আরবদের মাঝে ধর্মীয় প্রেরণা বিদ্যমান ছিল। কুরআনুল কারীম ও সুন্নাতে রাসূল সা. ছাড়া অন্য কোন আইন তাদের জন্য অবশ্য পালনীয় ও রাষ্ট্রীয় ফরমানের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো না। মুসলমানদের মাঝে আত্মকলহ ছিল, কিন্তু এ আত্মকলহ থাকা সত্ত্বেও আরব, সিরিয়া, মিসর, ইরাক প্রভৃতি মুসলিম রাজ্যসমূহের গণজীবন এবং তাদের মধ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য কোন জটিল রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজন ছিল না। খলীফা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে পরামর্শ গ্রহণ করতেন, কিন্তু সে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে তার জন্য কোন বাধ্যবাধকতাও ছিল না। আবার বিনা তলবেও লোকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতো। অনেক সময় তিনি সেসব পরামর্শ গ্রহণ করতেন। খলীফা অধীনস্থ প্রদেশ ও রাজ্যসমূহে নিজ নামে নায়েব মনোনিত করতেন। খলীফা যেমন গোটা মুসলিম জাহানের শাসক ছিলেন, তেমনি তিনি প্রধান সিপাহসালার বলেও গণ্য হতেন। প্রদেশ ও রাজ্যসমূহের আমিলগণ তাদের সংশ্লিষ্ট এলাকার বাদশাহ ও সিপাহসালার হতেন। একাধারে তারাই হতেন ধর্মীয় নেতা, নামাযের ইমাম ও প্রধান বিচারপতি। খলীফারও যখন কোন ধর্মীয় বিষয় জানা প্রয়োজন হতো, তখন কোন ফকিহ আলেম বা ধর্মীয় পণ্ডিতের কাছে জেনে নিতে একটুও সংকোচ করতেন না। এক একটি প্রদেশে একজন আমিলের পাশাপাশি একজন করে কাজী বা প্রধান বিচারপতি পাঠানো হতো। আমিলের কাজ হতো প্রশাসন পরিচালনা করা, সৈন্যবাহিনী চালনা, প্রজাদের দেখাশোনা করা, রাজস্ব আদায় করা ও শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ-মাটিকে রক্ষার কৌশল নির্ধারণ করা ইত্যাদি। কাজীর দায়িত্ব ছিল শরীয়তের বিধানের ব্যাখ্যা দান, ফায়সালা প্রদান, বিচার মীমাংসা করা ও দণ্ডবিধি জারী করা ইত্যাদি।

খলীফাদের উল্লেখযোগ্য স্বভাব-চরিত্র

সাফফাহ রক্তপাত করতেন সহজেই। তার আমিলরাও পদে পদে তার অনুসরণ করতো। খলীফা মানসুর ছিলেন বীর পূরুষ, জ্ঞানী ও সঞ্চয়ী চরিত্রের লোক। খলীফা মাহদি অত্যান্ত দানশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ধর্মদ্রোহীদের তিনি হত্যা করেন। মসজিদুল হারাম, মদীনা শরীফ ও মসজিদুল আকসার তিনি পুনঃনির্মাণ করেন। খলীফা হাদী ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ও দাম্ভিক চরিত্রের অধিকারী। খলীফা হারুনুর রশীদ মদীনার পথে রাস্তাঘাট ও জলাধার নির্মাণ করেন। জনহিতকর কাজ দ্বারা তিনি প্রজাদেরকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেন। খলীফা আমীনও দানশীল ছিলেন, কিন্তু শেষ জীবনে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে পড়েন। খলীফা মামুন জ্ঞানী ছিলেন। এক সময় জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন। তবে সবাই কুরআন-হাদীস, ফিকহ ও জ্ঞানচর্চার ব্যাপারে বিস্তর অবদান রাখেন।

খিলাফতের অধীনে কয়েকটি দফতর

খলীফাগণ উন্নয়ন ও সুশাসনের জন্য যে কয়েকটি বিভাগ বা দফতর পরিচালনা করতেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরা হচ্ছে।

১. খলীফার সচিবালয়ের নাম ছিল দিওয়ানুল আযীয।
২. রাজস্ব দফতরের নাম দিওয়ানুল খারাজ।
৩. জিযিয়া দফতরের নাম দিওয়ানুল জিযিয়া বা জিমান।
৪. ফৌজি দফতরকে বলা হতো দিওয়ানুল আসকার।
৫. পুলিশ দফতরকে দিওয়ানুশ শুরতা।
৬. ডাক বিভাগের নাম ছিল দিওয়ানুল বারীদ।
৭. বিচার বিভাগের নাম ছিল দিওয়ানুল ক্বাদা।
৮. আপিল বিভাগের নাম ছিল দিওয়ানুল আদল।
৯. অর্থ ও পরিকল্পনা বিভাগের নাম ছিল দিওয়ানুন নাফক্বাহ।
১০. পত্র, সন্ধি ও দলীল সংক্রান্ত দফতরের নাম ছিল দিওয়ানুর রাসাইল।
১১. নদী, খাল সংরক্ষণ বিভাগের নাম ছিল দিওয়ানুল আনহার।

খিলাফতের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ ও পদবী

উযীরে আযম: প্রথম প্রথম খলীফার একজন মাত্র উযীর থাকতেন। আর তিনি হতেন সব ব্যাপারে খলীফার নায়েব বা প্রতিনিধি স্বরূপ।

আমীরুল উমারা: এ পদটি আব্বাসী খলীফাদের পতনের যুগে সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রের পদস্থ কর্মকর্তাগণ তাদেরই অধীনে কাজ করতেন।

সুলতান: দায়লামীরা যেমন নিজেদের জন্য আমীরুল উমারা খেতাব বেছে নেয়, তেমনই সালজুকীরা নিজেদের জন্য সুলতান খেতাবটি বেছে নেয়।

আব্বাসীয় শাসিত এলাকাসমূহ

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিম্নোক্ত প্রদেশ, এলাকা বা শহরগুলি আব্বাসীয় খলিফাদের অধীনে ছিল।

আলজেরিয়া, মরোক্ক, মিসর, লিবিয়া, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, ইয়ামাসা, বাহরাইন, ওমান, সিরিয়া, দামেস্ক, মাদায়েন, আহওয়ায, হুলতয়ান, জাযিরা, কানসারা, রিক্কা, তুরস্ক, বাজেন্টাইন, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, তাবারিস্তান, জুরজান, খুরাসান, তূস, রায়, ইরান, হামদান, বলখ, মার্ভ, রায়, ইসফাহান, হালওয়ান, বোখারা, সমরকন্দ, মা-অরাউন নাহার (চীন সীমান্ত এলাকা) কাবুল, আফগানিস্তান, মুলতান, পাঞ্জাব, সিন্ধু, বসরা, কূফা, কোস, নাহাওয়ান্দ, কাজবীন, জুরজান, নীশাপুর ইত্যাদি।

শাসন, কর ধার্য্যকরণ, বিদ্রোহ দমনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় এ সময়ের মধ্যে কম বেশি খিলাফতের আধিপত্য ছিল।

আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকাল

১। আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ আস্ সাফফাহ (৭৪৯-৭৫৪খ্রি.)
২। আবূ জাফর আল মানসূর (৭৫৪-৭৭৫ খ্রি.)
৩। মাহদী (৭৭৫-৭৮৫ খ্রি.)
৪। আল হাদী (৭৮৫-৭৮৬ খ্রি.)
৫। হারুনুর রশিদ (৭৮৬-৮০৯ খ্রি)
৬। আল আমীন (৮০৯-৮১৩ খ্রি.)
৭। আল মামুন (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.)
৮। আল মু'তাসিম (৮৩৩-৮৪২ খ্রি.)

৯।	আল ওয়াসিক	(৮৪২-৮৪৭ খ্রি.)
১০।	আল মুতাওয়াক্কিল	(৮৪৭-৮৬১ খ্রি.)
১১।	আল মুনতাসির	(৭৬১-৮৬২ খ্রি.)
১২।	আল মুতাসিন	(৮৬২-৮৬৬ খ্রি.)
১৩।	আল মু'তাজ	(৮৬৬-৮৬৯ খ্রি.)
১৪।	আল মুহতাদী	(৮৬৯-৮৭০ খ্রি.)
১৫।	আল মুতাসিদ	(৮৭০-৮৯২ খ্রি.)
১৬।	আল মুতাদিদ	(৮৯২-৯০২ খ্রি.)
১৭।	আল মুকতাফি	(৯০২-৯০৮ খ্রি.)
১৮।	আল মুকতাদির	(৯০৮-৯৩২ খ্রি.)
১৯।	আল-কাহির	(৯৩২-৯৩৪ খ্রি.)
২০।	আর রাদী	(৯৩৪-৯৪০ খ্রি.)
২১।	আল মুত্তাকি	(৯৪০-৯৪৪ খ্রি.)
২২।	আল মুসতাক্‌ফি	(৯৪৪-৯৪৬ খ্রি.)
২৩।	আল মুতীহ	(৯৪৬-৯৭৪ খ্রি.)
২৪।	আল তাঈ	(৯৭৪-৯৯১ খ্রি.)
২৫।	আল কাদির	(৯৯১-১০৩১ খ্রি.)
২৬।	আল কাইয়িম	(১০৩১-১০৭৫ খ্রি.)
২৭।	আল মুকতাদি	(১০৭৭-১০৯৪ খ্রি.)
২৮।	আল মুস্তাহজির	(১০৯৪-১১১৮ খ্রি.)
২৯।	আল মুস্তারশিদ	(১১১৮-১১৩৪ খ্রি.)
৩০।	আর রাশিদ	(১১৩৪-১১৩৫ খ্রি.)
৩১।	আল মুকতাফি	(১১৩৫-১১৬০ খ্রি.)
৩২।	আল মুস্তানজিদ	(১১৬০-১১৭০ খ্রি.)
৩৩।	আল মুস্তাজি	(১১৭০-১১৭৯ খ্রি.)
৩৪।	আল নাসির	(১১৮০-১২২৫ খ্রি.)
৩৫।	আল মুস্তানসির	(১২২৬-১২৪২ খ্রি.)
৩৬।	আল মুস্তাসিম	(১২৪২-১২৫৮ খ্রি.)

আব্বাসীয়দের উল্লেখযোগ্য কীর্তি

৭৫৪ খ্রি. আল মানসূর কর্তৃক মক্কায় হারাম শরীফ সম্প্রসারণ হয়।

৭৬৩ খ্রি. বাগদাদ শহরের গোড়াপত্তন হয়।

৭৬৮ খ্রি. কাশ্মিরের সীমান্ত পর্যন্ত আব্বাসীয় সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। ইন্দাজভ্যালীর গভর্নর হন দ্বিতীয় মুহাম্মদ বিন খ্যাত হিশাম বিন আমর আল তাগলীবি।

খলীফা আল মাহদী (৭৭৫-৭৮৫) ফিকাহ শাস্ত্রের উন্নয়নে ইমামগণকে সহায়তা দান করেন।

ইন্ডিয়ার উপকূলীয় শহর 'বারিদ' খিলাফতের নৌবাহিনী দখল করে। (৭৭৭-৭৭৮)

৭৭৯ বায়জেন্টাইন আক্রমণ।

বাগদাদ থেকে মক্কা শরীফ পর্যন্ত পানি, আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপত্তাসহ রোড স্থাপিত

হয়। (৭৭৭-৭৮১)
হারুনুর রশিদ কূফা থেকে মক্কা শরীফে রাস্তা নির্মাণ ও সংস্কার করেন।
রাজা নিকফুরকে পরাজিত করে বায়জেন্টাইন থেকে (৮০২-৮০৬) জিযিয়া আদায়।
মামুনুর রশিদ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রসারে অবদান রাখেন। আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলসমূহে (৮১৩) প্রশাসক নিয়োগ করেন।
আফগানি এক রাজা (৮১৩) মামুনের শাসনামলে ইসলাম গ্রহণ করেন (৮১৪)।
মুসলিমরা ব্যালেরিক আইসল্যান্ড দখল করে তাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। (৮১৪)
৮৩০ খ্রি. বাগদাদে বাইতুল হিকমা (জ্ঞান-বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র) প্রতিষ্ঠা করে মামুন।
আল মু'তাসিম (৮৩৬ খ্রি.) কায়রাওয়ানে সর্ববৃহৎ মসজিদ স্থাপন করেন।
মুসলিমরা দক্ষিণ ইটালী দখল করে। (৮৪৭-৮৭১ খ্রি. 'বারি' পর্যন্ত এবং ৮৫০-৮৮০ খ্রি. টারান্টো পর্যন্ত। ইতিমধ্যে সিসিলি, তথা পালেরমো, মেসিনা, ক্যাট্রগোভিনী ইত্যাদি শহর আফ্রিকার তিউনিসীয় মুসলিম গভর্নরের হাতে আসে। (৮৫৭)
খলীফা ওয়াসিক বিল্লাহ দুর্নীতির দায়ে উর্ধ্বতন বহু কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেন এবং তাদের অর্থ সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দানের নির্দেশ দেন। (৮৪৪)
হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত আয়েশা রা. ও হযরত হাফসা রা. কে নিন্দা করার অপরাধে মুতাওয়াক্কিল, শিয়া নেতা ঈসা বিন জাফরকে মৃত্যুদণ্ড দেন। (৮৫৬)
বিজ্ঞানে মুসলিমদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে। (৮৫৯)
বাগদাদে ক্যারোসিন বাতি ব্যবহার শুরু হয়। (৮৭০)
আফগানিস্তান ও দায়লাসের মানুষ ব্যাপকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে।
বিজ্ঞানী আব্বাস ইবনে ফাইমাস ও আবূ হাতিম আর রাজী মৃত্যুবরণ করেন। ৮৯০
মুসলিমরা নর্থওয়েস্ট ইটালীর লাইগুরিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
ইবনে ফযলকে রাশিয়ায় দূত নিয়োগ করা হয়। (৯২১)
আল নাসির (১১৮০-১২২৫) ইসলামী ফতওয়াকে তার শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ বিধি বিধানের ভিত্তি সাব্যস্ত করেন। সুলতান ইলতুতমিশ খলিফা মুস্তানসিরের পক্ষ থেকে সুলতান-ই-আযম উপাধী গ্রহণ করেন। (১২২৬-১২৪২) দিল্লীর সুলতানদের অনেকেই আব্বাসীয় খিলাফতকে মেনে চলতেন। ১২৯৬ খ্রি. পর্যন্ত দিল্লী সালতানাতের মুদ্রায় খলীফা মুস্তাসিম-এর নাম অংকিত ছিল।

খিলাফতের পতন

মঙ্গলীদের আক্রমণে খলীফা মুস্তাসিম নিহত হন। বাগদাদে অবর্ণনীয় ধ্বংসলীলা ও গণহত্যা চলতে থাকে। বিখ্যাত গবেষণাগার ও বিশাল লাইব্রেরী তছনছ করে বই-কিতাব সব নদীদে নিক্ষেপ করা হয়। কয়েক বছর পর্যন্ত টাইগ্রিস নদীর পানি জ্ঞানের কালিতে রঙিন হয়ে থাকে। মিসরের পর বাগদাদ কেন্দ্রিক ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এই মূর্খ, বর্বর, জালেমদের হাতে ধ্বংস হয়ে যায়। মুসলিম বিশ্ব এক বিশাল ও অপূরণীয় ক্ষতির সাগরে নিপতিত হয়।

আব্বাসীয় খিলাফতের পরিসমাপ্তির কারণ

সর্বশেষ আব্বাসীয় খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহর মধ্যে সাহস ও দূরদর্শিতার অভাব ছিল। তবে তাঁর মধ্যে আলেমদের সাহচর্যের বদৌলতে দীনদারি ও সুন্নতের পাবন্দি ছিল। বিচক্ষণতার অভাবে জ্ঞানী আলেমদের সাথে পরামর্শ না করে মুস্তাসিম মুআইয়াদ উদ্দিন আলকামী নামক এমন এক ব্যক্তিকে তাঁর উজির নিয়োগ করেন, যে ছিল একজন কট্টরপন্থী শিয়া। আলকামী মন্ত্রিত্ব লাভ করেই সকল ক্ষমতা নিজ হাতে তুলে নেয়। নানা কৌশলে সে শিয়া-সুন্নী বিরোধকে পুনঃজীবিত করে এবং সকল কাজে ক্রমান্বয়ে আব্বাসীয়দের নাম নিশানা মুছে দিয়ে আলাভীদেরকে বাগদাদের খলিফার আসনে বসানোর পাঁয়তারা করতে থাকে। এ ভয়ঙ্কর দূরভিসন্ধির সম্পর্ক শুভাকাংখীরা সতর্ক করার পরও মুস্তাসিম সতর্ক না হয়ে আলকামীকে জানিয়ে দেন। এতে সে ভালো লোকদের ওপর নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। এক পর্যায়ে শিয়াদের আস্ফালন বৃদ্ধি পাওয়ায় খলিফার পুত্র আবু বকর শিয়াদের মহল্লায় হামলা করেন। আলকামী পিতার কাছে পুত্রের বিরুদ্ধে নালিশ করে, কিন্তু পিতা, পুত্র আবু বকরকে কোন শাস্তি না দেওয়ায় আলকামী অত্যন্ত মনঃক্ষুন্ন হয়। তার অন্তর্জালা মিটানোর জন্য সে গোপনে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু খানের সাথে যোগসাজস করে বাগদাদে আক্রমণের আহ্বান জানায়।

অন্যদিকে খলিফার সৈন্য সংখ্যার প্রাচুর্য, আরব শৌর্যবীর্য, বাগদাদবাসীদের দূরন্ত সাহসকে মোগলরা খুব ভয় করতো। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে আলকামী খলিফার নিকট রাজস্ব আয়ের স্বল্পতা এবং সামরিক বাহিনীর বেতন ভাতা বৃদ্ধির কারণ দেখিয়ে সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাস করা এবং অন্যান্য অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে। খলিফা নির্বুদ্ধিতার জন্য তা মেনে নেন। আলকামী সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে ফেলে এবং অনেক সৈন্যকে সীমান্ত এলাকায় পাঠিয়ে দেয়। খলিফাকে বলা হয়, তাতারিদের প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা হয়েছে।

হালাকু খানের দরবারে মন্ত্রীরূপে দায়িত্ব পালন করতো কট্টর শিয়া নেতা নাসিরুদ্দীন তূসী। সেও আব্বাসী খিলাফতের ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে শিয়া রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতো। আলকামী তার নিকট পত্র লিখে হালাকু খানকে বাগদাদ আক্রমণে প্ররোচিত করার জন্য।

হালাকু খান তাতারীদের বিরাট বাহিনী নিয়ে বাগদাদ আক্রমণ করে। প্রতিরোধ যুদ্ধে বাগদাদের সেনাপতি ফাতহুদ্দীন প্রথমে বীর বিক্রমে জয়লাভ করেন। কিন্তু সৈন্যদের অনভিজ্ঞতার দরুণ মোগলদের পিছনে বেশি দূর ধাওয়া করতে ব্যর্থ হয়। ফাতহুদ্দীন কিছু সংখ্যক সৈন্য নিয়ে মোগলদের পশ্চাদবরণ করেন। কিন্তু ছড়িয়ে থাকা মোগল সৈন্যরা পিছন দিক থেকে ঘেরাও করে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। এতে ফাতহুদ্দীন নিহত হন। বাকি সৈন্যরা পালিয়ে বাগদাদে চলে আসে।-এরপর হালাকু বাহিনী বাগদাদ ঘেরাও করে রাখে। প্রায় ৫০ দিন সৈন্যরা বাগদাদ রক্ষা করে। কিন্তু ভিতরে থাকা শিয়াদের সহযোগিতা এবং আলকামীর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে এক সময় হালাকু খান বাগদাদ শহরে প্রবেশ করে জ্ঞানী-গুণী, আমাত্যবর্গকে তাতারী বাহিনীর সামনে উপস্থিত হতে বলে। এর পূর্বে খলিফা তার পুত্রসহ হালাকুর সৈন্যদের নিকট উপস্থিত হন। আলকামী তাকে মিথ্যা অভয় দান করে বলেছিল,

হালাকু খান আমাকে কথা দিয়েছে যে, সে আপনাকে বাগদাদের নেতৃত্বে বহাল রাখবে যেমন তাতারীরা ইতিপূর্বে গিয়াস উদ্দিন কায়খাসরুকে তার রাজ্যের শাসনকার্যে বহাল রেখেছিল। ধোকায় পড়ে খলিফা, হালাকু খানের হাতে আটক হয়ে গেলে হালাকু শহরের সকল মানুষকে বেরিয়ে আসতে বলে এবং পূর্বের আক্রমণ, ফাতহুদ্দীনের পশ্চাদ্ধাবন এবং ৫০ দিন প্রতিরোধের ক্ষোভ মিটানো এবং স্বভাবসুলব দুর্ধষ্যতার গণহত্যা শুরু করে। খলিফাকে হালাকু নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন শহরবাসীকে নিরস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে আসতে বলে। খলিফা নিরুপায় হয়ে সে পয়গাম দান করেন। লাখ লাখ লোক দিশেহারা হয়ে বের হয়ে আসে আর তাতারীদের কচুকাটার শিকার হয়। শিশু ও নারীরা কুরআন শরীফ মাথায় নিয়ে পালাতে চাইলে তারাও রেহায় পায়নি বর্বর তাতারী হায়েনাদের আক্রমণ থেকে। রক্তের বন্যায় দজলা নদীর পানি লাল হয়ে যায়। কূপ, গর্ত ও শহরের নালা নর্দমার ভিতরে আত্মগোপন করে থাকা কিছু লোক ছাড়া প্রায় সকল নাগরিক বেঘোরে মারা যায়। বাগদাদ ও তার উপকণ্ঠে এক কোটি ছয় লাখ মুসলমান নিহত হন এই ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞে। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে খলীফা আরও হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন। বন্দিত্ব, পরাজয় ও নির্মম এই পরিণতিতে শারীরিক ও মানসিকভাবে চরম বিপর্যস্ত খলিফা তখন হালাকু খানের করুণার পাত্র। হালাকুর নির্দেশে খলিফা তার রাজত্বে সকল রত্ন ভাণ্ডারের সন্ধান দিয়ে দেন। অজ্ঞাত স্থানে রক্ষিত মনিমানিক্যের কথাও বলে দেন। সব কিছু হস্তগত করার পর হালাকু খলিফার সাথে এক নির্মম রসিকতা করলো। ক্ষুধার জ্বালায় খলিফা খাদ্য চাইলে সে তার সামনে এক তশতরি মনিমুক্তা দিতে বলল এবং তাকে তা খেতে নির্দেশ দিল। তখন খলিফা বললেন, এগুলো কি খাওয়া যায়? আমি খেতে পারবো না। হালাকু তখন একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা বললো, সে বললো, যে বস্তু তুমি নিজে খেতে পারনা, তা লোকদের মধ্যে বণ্টন করে সৈন্যবাহিনী তৈরি করে লাখ লাখ মুসলমানের প্রাণ এবং নিজের রাজ্য কেন আমাদের হাত থেকে বাঁচালে না। এরপর হালাকু খলিফাকে হত্যার ব্যাপারে আমাত্যবর্গের পরামর্শ চাইলে সকলেই তাকে হত্যা করার পরামর্শ দিল।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে আলকামীকে খলিফা মন্ত্রী নিযুক্ত করে অন্যান্য অনেকের চেয়ে বেশি বিশ্বাস করেছিলেন, সে এবং শিয়া পণ্ডিত নাসিরুদ্দীন তূসী হালাকু খানকে বললো, মুসতাসিম মুসলমানদের খলীফা, তাকে তরবারি দিয়ে রক্তাক্ত না করে আরও লাঞ্ছনাকর শাস্তি দিয়ে হত্যা করতে হবে। সে অনুযায়ী আলকামীর ওপর দায়িত্ব পড়লো, সে পশমী কম্বলে আব্বাসীয় শেষ খলিফা দূর্ভাগা মুসতাসিমকে জড়িয়ে একটি পিলারের সাথে বেধে উপর্যুপরি লাথি মারতে লাগলো। মানুষের পায়ের আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মুসতাসিমের প্রাণ বায়ু বেরিয়ে গেল। আলকামীর নির্দেশে খলিফার মৃতদেহকে সৈন্যরা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্য, হিকমত বুঝা বড়ই কঠিন। খলিফার কাফন দাফন বলে কিছুই হল না। আব্বাসীয় বংশের যাকেই সামনে পেল হালাকু বাহিনী তাকেই হত্যা করল। তারপর হালাকু শাহী গ্রন্থাগার, প্রাসাদগুলো লুণ্ঠন করলো, কিতাবাদি দজলা নদীতে নিক্ষেপ করলো। এক কথায় বাগদাদে যে রক্তপাত, ধ্বংসযজ্ঞ ও লুণ্ঠন চালানো হল, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজির নেই। খলীফা

মুসতাসিম বিল্লাহর পর সাড়ে তিন বছর মুসলিম বিশ্বে খলীফা বলে কেউ ছিলেন না। ৬৫৯ হিজরিতে মুসতাসিমের চাচা আবুল কাসিম আহমাদের হাতে খিলাফতের বায়আত করা হয়।

জ্ঞান বিজ্ঞানে আব্বাসীয়দের অবদান

বাগদাদে হারুনুর রশিদের আমল থেকেই বায়তুল হিকমাহ বা বিজ্ঞান ভবন চালু ছিল। মামুনের আমলে গ্রীক, সুবিয়ানী, হিব্রু, সংস্কৃত, ফার্সি, প্রভৃতি ভাষায় কিতাবাদি অনুবাদের একটা বিভাগ চালু হয়। জ্ঞানী-গুণী, আলেম, ফকীহ ও ইমামগণ খলিফার দরবারে আগমন করতেন। তাদের নিকট খলিফাগণ একাডেমিক জ্ঞান হাসিল করতেন।

আব্বাসীয় খিলাফত আমলে আরবী ব্যাকরণ নাহু, সরফ আবিস্কৃত হয়। হাদীস, উসূলে হাদীস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহর সংকলন হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি রচিত হয়ে সারা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পৃথিবীর ব্যাস (২৪ হাজার মাইল) দূরবীক্ষণ, ঘড়ি ইত্যাদি আবিস্কৃত হয়। স্থাপত্যবিজ্ঞান বিষয়ক বইপুস্তক রচিত হয় আব্বাসীয় আমলেই। অংকশাস্ত্র, ভূ-তত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, যুক্তিবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রের আবিস্কার মুসলমানগণের হাতে হয়।

.....

লেখক পরিচিতি

প্রধান মুহাদ্দিস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

উসতাযুত তাফসীর, জামিয়া রাহমানিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা।



ইতিহাসের আলোকে
ফাতিমী খিলাফত

শেখ ফজলুল করীম মারুফ

রাসূল সা. আরব জাতিকে অভাবিত, অকল্পিত কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত একটি জীবন উপহার দিয়েছিলেন। সমাজ জীবনে সংঘাত, নারীর অবমাননা, ব্যভিচার, যৌন অপরাধ, মদ, জুয়াসহ বেদনাক্লিষ্ট দীর্ঘ আরবজীবন ইসলামের ছায়াতলে এসে আমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। পরিশীলিত ও শুদ্ধ জীবনে ফিরে আসে স্বস্তি, নিরাপত্তা ও শান্তি।

রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গিত মুজাহিদরা তাঁর প্রতিষ্ঠিত দীনের সমাজ দর্শন, অর্থনৈতিক মুক্তির পয়গাম, সংস্কৃতি-সভ্যতার বাণী এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরবরা সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে দিয়েছিল মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও পারস্যের ভূমিতে। রোম-পারস্যের শক্তিশালী সাম্রাজ্যও পরাজয় স্বীকার করলো। ইসলামের পতাকা এশিয়া পার হয়ে আফ্রিকা, ইউরোপেও পৌঁছে গেল। হিজরী ১ম শতকের মধ্যেই তিন মহাদেশব্যাপী ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। এই সময়ে গ্রীক, হেলেনিক ও পারসিক সভ্যতার বহু মানুষ ইসলাম গ্রহণ করায় আরবরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যায়। অনারবদের ভাব, ভাষা, দর্শন ইসলামের সাথে মিশ্রিত হতে থাকে নির্বিচারে। ফলে চিন্তার ক্ষেত্রে নিখুঁত আরব দর্শনই যেন থমকে দাঁড়ায়।

চিন্তার স্বাধীনতার লাগামহীন অপব্যবহারের ফলে কুরআন হাদিসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বেপরোয়া প্রবাহ নব্য অনারব মুসলিমদের উৎসাহিত করলো ভাববাদ, যুক্তিবাদ, উগ্রবাদ, মরমীবাদ, সূক্ষ্মতত্ত্ববাদ ইত্যাদি দর্শনের চর্চায় মেতে ওঠার জন্য। এক ও অবিভাজ্য ইসলামের মাঝে তৈরি হলো নানা ধরনের দর্শন।

ইসলামে মানুষের মর্যাদা নির্ণিত হয়

তাকওয়া-খোদাভীতির ভিত্তিতে। বংশ পরম্পরা ইসলামে কোন বৈশিষ্ট্য বহন করে না। অথচ এই বংশকে কেন্দ্র করে ইসলামে আবির্ভাব ঘটে বিভিন্ন দলের।

পারসিয়ানরা রাজতন্ত্রের বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বিশ্বাস করতো। তারা মনে করতো, একজন রাজার অন্তর্ধান হলে তিনি পরবর্তী রাজার মধ্য দিয়ে আবারও আগমন করেন এবং এর পিছনে ঐশ্বরিক সমর্থন থাকে।

তৃতীয় ইয়াজদিগার্দ ৩১ হিজরীতে মারা গেলে পারসিকদের পুরুষ শাসনের অবসান ঘটে। সাধারন্যে বিশ্বাস করা হয় যে, তার কন্যা শাহার বানুর সাথে হযরত হোসাইন রা.-এর বিবাহ হয়েছে। এই বিবাহের ফলে পারসিক ভাবধারার বংশীয় কৌলিন্যের এক নবতর ধারা সূচিত হয়।

হযরত আলী রা. স্বাভাবিক ভাবেই নবমুসলিম পারসিকদের ইসলামী ভ্রাতৃত্বে সমমৈত্রির স্থান করে দেয়ার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। হযরত মুয়াবিয়া রা. ও হযরত আলী রা.-এর মাঝে যখন দ্বন্দ্ব শুরু হয় তখন আত্মীয়তা ও সদ্ব্যবহারের কারণে পারসিকরা হযরত আলী রা.-এর পক্ষাবলম্বন করে। যার ফলে উমাইয়া শাসনামলে তারা নির্যাতন, নিপীড়নের শিকার হন।

বৈষম্যের শিকার হয়ে তারা যখন অধিকার বঞ্চিত শ্রেণিতে পরিণত হলো, তখন হযরত হাসান ও হোসাইন রা.-এর বংশধররা তাদের অধিকার রক্ষায় সোচ্চার হলে হযরত আলী রা. বংশের অন্যদের সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এরই সীমালংঘিত পর্যায়ে পারসিক পুরাতন ধর্মবিশ্বাস "আত্মার দেহান্তর পরবর্তী পুরুষে" হযরত আলী রা. বংশে আরোপিত হলো।

অতি ইন্দ্রিয়বাদ, ভক্তিবাদ, অলৌকিকত্ববাদ সবই পারসিক ধর্মবিশ্বাস হলেও কালক্রমে ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করে সবগুলোকে ইসলামী রূপ দেয়া হল। হযরত উসমান রা.-এর খিলাফতকালে ৩২ হিজরীতে ইয়ামানের আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ইয়াহুদী ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তার পুরাতন বিশ্বাসে সে অটল ছিলো। সে প্রচার করতে থাকে 'আল্লাহ প্রদত্ত নেতৃত্ব ব্যতিত জনতার মুক্তি আসতে পারে না'।

তার সাথে জোটবদ্ধ হয় পারসিক বিশ্বাস, যে খোদায়ী নেতৃত্ব কেবল বংশানুক্রমেই দেহ থেকে দেহে স্থানান্তরিত হয়। এর সামগ্রিক ফল দাড়ায় যে, হযরত আলী রা. রাসুল সা.-এর একমাত্র বংশধর, তাই তিনি ও তাঁর বংশধরগণই একমাত্র খিলাফতের ন্যায্য অধিকারী। তারা ছাড়া বাকি সব খলিফাগণ দখলদার, অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা ও পারসিক নবমুসলিমদের সম্মিলিত এই আকিদা ও বিশ্বাসের নামই শিয়া মতবাদ। এই মতবাদে বিশ্বাসীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত খিলাফতই হলো ফাতিমী খিলাফত।

ফাতিমী বংশধর

ফাতিমী নাম কিভাবে এসেছে সে সম্পর্কে তিনটি মতামত পাওয়া যায়-

১. হযরত ফাতিমা রা. থেকে

২. হযরত ফাতিমা রা.-এর সন্তান হযরত হোসাইন রা.-এর কন্যা অপর এক ফাতিমা থেকে যিনি হযরত ফাতেমা রা.-থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

৩. হযরত আলী রা.-এর মাতা ফাতিমা বিনতে আসওয়াদ থেকে।

ফাতিমী নামধারণ যে উৎস থেকেই হোক, হযরত হোসাইন রা.-এর মৃত্যুর পর

তিনটি ধারা হযরত আলী রা.-এর বংশে লক্ষ্য করা যায়-

১. যারা হযরত হাসান রা. থেকে
২. যারা হযরত হোসাইন রা. থেকে
৩. যারা হযরত মুহাম্মাদ আল হানাফিয়া থেকে

তিনি হযরত আলীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত ছিলেন।

প্রথমত হযরত হাসানের বংশধরেরা হিযরত করে মরক্কো চলে যান এবং সেখানে তারা ইদ্রিসিয়া বংশের সূচনা করেন। তারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রথম যে দলটি হযরত আলী রা.-বংশের পতাকা নিয়ে প্রকাশিত হয় তারা মুহাম্মাদ আল হানাফিয়ার বংশধর।

হযরত হাসান, হযরত হোসাইন রা.-এর শাহাদাতের পর হযরত আলীর মুক্তদাস কাইসান জনগণকে সংগঠিত করতে থাকেন এবং চারজন ইমামকে স্বীকৃতি দেন। তারা হলেন, হযরত আলী, হযরত হাসান, হযরত হোসাইন ও হযরত মুহাম্মাদ আল হানাফিয়া।

তাঁদের শাহাদাতের পর মুহাম্মাদ আল হানাফিয়াই একমাত্র বৈধ খলিফা। অবশ্য তিনি তাতে সমর্থন দেননি। ৮১ হি. তে তাঁর মৃত্যুর পর কাইসানের পুত্র আবু হাশিমকে ইমাম বলে ঘোষণা দেয়া হয়। ৯৮ হি. তিনি পুত্রহীন মারা গেলে মু. বিন আলী বিন আব্দুল্লাহকে (মৃত্যু ১২৬) ইমাম ঘোষণা করা হয়। অবশ্য তিনি আলী বংশীয় না।

এই বংশই পরবর্তীতে আব্বাসী বংশ হিসেবে ১৩২ হিজরীতে বাগদাদে আব্বাসী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। শিয়াদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দল হলো যারা হযরত হোসাইন রা.কে তৃতীয় ইমাম হিসেবে স্বীকার করে এবং তাঁর পরে ইমাম জয়নুল আবেদীনকে (মৃত্যু-৯৪) ইমাম হিসেবে স্বীকার করে। তিনি পারস্যের রাজকীয় পরিবারের কন্যা শাহেরা বানুর গর্ভজাত সন্তান।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের পরে শিয়ারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল তার সন্তান জায়েদ (মৃত্যু ১১২ হি.) কে, অন্যদল তার অন্য পুত্র মু. আল বাকের (মৃত্যু ১১৩হি.) কে ইমাম মানেন।

শিয়াদের অধিকাংশই মু. আল বাকেরকে চতুর্থ ইমাম মানেন। তারপরে জাফর আস সাদেক (মৃত্যু ১৪৮হি.) কে ইমাম মানেন। তখনও বিতর্ক দেখা দেয়। ইমাম বাকেরের অপর পুত্র আবু মনসুরকে একদল ষষ্ঠ ইমাম ঘোষণা করেন। এই আবু মনসুরই আলী বংশের সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে দাবী করে 'ইমাম স্বর্গীয় অধিকার ভোগকারী'। ইমাম আসমান থেকে দুনিয়া আলোকিত করেন। হযরত আলী রা.-এর আত্মা তাদের ইমামের মাঝে প্রবেশ করেছে এবং হযরত আলী প্রকৃত নবী। অবশ্য এরা ছোট দল।

অধিকাংশ শিয়ারা জাফর সাদেককে ৬ষ্ঠ ইমাম বলে মানেন। জাফর সাদেকের পরে আবারও বিভেদ দেখা দেয়। একদল তার পুত্র ইসমাঈলকে ইমাম মানেন। তাকে মাদকাসক্ত হতে দেখে অন্যদল মুসা কাজিমকে ইমাম মানেন। অধিকাংশই মুসা কাজিমকে সপ্তম ইমাম মানেন। তিনি ১৮৩ হিজরীতে মৃত্যু বরণ করেন। এর পরের ইমামদের ধারাবহিকতা এরকম-

আলী রিজা (মৃত্যু- ২০২) ৮ম
মু. আল জাওয়াদ (মৃত্যু ২২০) ৯ম
আলী আল হাদি (মৃত্যু- ২৫৪) ১০ম
ইমাম আল হাসান- ১১তম
মু. আল মুনজাজির- ১২তম
তিনি ২৬০ হিজরীতে সামারার মসজিদ থেকে অদৃশ্য হয়ে যান।
মনে করা হয় যে, তিনি জীবিত, আবারও আসবেন। এটাই দ্বাদশ ইমামিয়াদের ধর্মীয় বিশ্বাস। যারা মুসা কাজিমকে ইমাম হিসেবে স্বীকৃতি দেন না তারা ইমাম ইসমাঈলকে ৭ম ইমামরূপে বরণ করেন। ইমাম ইসমাঈল পিতার জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ নামক এক পুত্র রেখে ১৪৫ হিজরীতে মারা যান।
আল বাকীতে সবার সামনে তাকে দাফন করা হলেও অতিভক্তের দল বিশ্বাস করে যে তিনি জীবিত অবস্থায় বসরাতে আছেন। আর যারা তার মৃত্যুকে স্বীকার করে তারা মনে করে যে, তার পুত্র মুহাম্মাদের ওপর ইমামত বর্তিয়েছে। পরবর্তীকালে এদের উত্তরসূরিরাই ইসমাঈলিয়া বা সাবাঈ বলে পরিচিতি পায়।

ফাতিমী রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা

উবায়দুল্লাহ সাঈদ রাজবংশটির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সিরিয়া ইসমাঈলিয়াদের কেন্দ্র সালাবিয়াতে অবস্থান করতেন। আব্বাসীদের অনুসন্ধান ও কারামাতিয়াদের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে তার স্থান বদলের প্রয়োজন দেখা দিলে যাতে তিনি নিরাপদে থাকতে পারেন সেজন্য ইয়ামান ও উত্তর আফ্রিকাতে অবস্থান সৃষ্টি করা হয়। আবু আবদুল্লাহ ও ইসমাঈলী প্রচারকগণ তার পথ প্রস্তুত করেন।
মরোক্কো, আলজিরিয়া, মৌরতানিয়ায়, আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের পাড়ে গহিন বনানীর পার্বত্য এলাকাগুলো সর্বদা দুর্ভেদ্য ও জনবিরল। এখানে বারবার গোত্রভুক্ত জনগোষ্ঠী বসবাস করতো এবং এরা সবসময়ই শহরবিমুখ জীবন যাপন করতো। দুর্গম এলাকা হওয়াতে এখানে বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আনাগোনা ছিলো। এই সময় আল মাগরিবের আগলাবীয় শাসনের রাজধানী ছিলো কায়রোয়ানে।
আবু আবদুল্লাহ যোগ্য সংগঠক, প্রচারক ও সেনানায়ক ছিলেন। তিনি দুই লাখ সৈন্য সংগ্রহ করে আগলাবীয় শেষ সুলতান জিয়াদাতুল্লাহ (৯০৩-৯০৯ হি.) কে রাকাদায়ে পরাজিত করেন। আল মাহদি সবকিছু অবগত ছিলেন। মাহদি মিসর থেকে ত্রিপোলি সেখান থেকে মাগরিবের পথে সিজিল মাসাহাতে এলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আবু আবদুল্লাহ এ ঘটনা জানতে পেরে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে সিজিল মাসাহাতে আক্রমণ করে মাহদিকে উদ্ধার করে ২৯৭ হি. মুতাবেক ৯০৯ সালে তাকে ফাতিমীয় খলিফারূপে ঘোষণা করেন। ৯১০ সালে কায়রোয়ান জামে মসজিদে আমিরুল মুমিনীন হিসেবে তার নামে খুতবা পঠিত হয়।
উবায়দুল্লাহ কায়রোয়ান থেকে রাজধানী রাকাদায় স্থানান্তরিত করেন এবং মাত্র দুই বছরের মাঝেই সমগ্র আফ্রিকায় ফাতিমী প্রভাব বিস্তার করেন। মরোক্কোর ইদ্রিসিয় শাসন অঞ্চল থেকে সুদূর ইয়ামান পর্যন্ত তার শাসন পরিব্যাপ্ত ছিলো। ৯১৫ সালে তিনি আলেকজান্দ্রিয়া দখল করেন। মিসরে দুই দুই বার আক্রমণ করেও তিনি সফলকাম হতে পারেননি। বারবার জাতিগোষ্ঠীর বারংবার বিদ্রোহ, ৯২৮ ও ৯২৯ সালে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং প্লেগের কারণে তিনি ব্যর্থ হন। তার সেনাবাহিনী নিষ্ঠুরতা

ও বর্বরতার জন্য বিখ্যাত ছিলো।

ফাতিমী খলিফাদের তালিকা

১. উবায়দুল্লাহ আল মাহদী ২৯৭-৩২২হি.
২. আবুল কাসিম মু. নিযার আল কাইয়িম বি আমরিল্লাহ ৩৩২-৩৩৪ হি.
৩. আবু তাহির ইসমাঈল আল মানসুর বি আমরিল্লাহ ৩৩৫-৩৪২ হি.
৪. আবু তামিম মাআদ আল মুইজ লি-দীনিল্লাহ ৩৪২-৩৬৫ হি.
৫. আল ইমাম নিজার আবু মানসুর আল আজিজ বিল্লাহ ৩৬৫-৩৮৬ হি.
৬. আল মনসুর আবু আলী হাকিম বি আমরিল্লাহ ৩৮৬-৪১১ হি.
৭. আবুল হাসান আলী আজ জাহির লী-ইজাজী দিনিল্লাহ ৪৪১-৪২৭ হি.
৮. আবু তানিম আল মুসতানসির বিল্লাহ ৪২৭-৪৮৭ হি.
৯. আবুল কাসিম আহমদ আল মুসতালি ৪৮৭-৪৯৫ হি.
১০. আবু আলী আল মনসুর আল আমির বি আহকামিল্লাহ ৪৯৫-৫২৪ হি.
১১. আবুল মায়মুন আব্দুল হামিদ আল হাফিজ লী দীনিল্লাহ ৫২৪-৫৪৪ হি.
১২. আবু মনসুর ইসমাঈল আল জাক্কির লি আদাই দীনিল্লাহ ৫৪৪-৫৪৯ হি.
১৩. আবুল কাসিম ঈসা আল ফাইজ বি নাসরিল্লাহ ৫৪৯-৫৫৫ হি.
১৪. আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল আদীদ ৫৫৫-৫৬৭ হি.

এরা কি আসলেই ফাতিমী?

এখানে যে ১৪ জন খলিফার নাম উল্লেখ করা হলো তারা ১ম খলিফা উবাইদুল্লাহ আল মাহদির বংশধর। প্রশ্ন হলো, উবাইদুল্লাহ আল মাহদি আসলেই কি হযরত আলী রা.-এর বংশধর?

আবুল হাসান মু. মাসাভী (৩৫৯-৪০৬ হি.) যিনি নিঃসন্দেহে হযরত আলী রা. এর বংশধর এবং তাকেই সরকারিভাবে হযরত আলী রা. এক বংশ তালিকা সংরক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ফাতিমীদের হযরত আলী রা.-এর বংশীয় বলে দেখাতে অস্বীকার করেন। মিশরিয় ইতিহাসের প্রবক্তা মাকরিজি, যিনি ফাতিমীপন্থি বলে খ্যাত, তিনিও ফাতিমীদেরকে আলী বংশীয় দেখাতে রাজি হননি। এক্ষেত্রে নয়টি ভিন্ন ভিন্ন বংশ তালিকা পাওয়া যায়। তবে প্রত্যেকটাতেই কোন না কোন খুঁত আছে এবং সত্য হলো, কথিত ফাতিমীরা আসলে হযরত আলী রা.-এর বংশ থেকে আসেনি।

ফাতিমী খিলাফতের অধিনে আফ্রিকা

প্রথম চারজন খলিফা উত্তর আফ্রিকায় বসবাস করেন। ৩৬২ হি./৯৭৩ খ্রি. সালে আল মুইজ মিশরের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং তার সেনাপতি জাওহার মিসর জয় করেন। উত্তর আফ্রিকায় ফাতিমীরা নানা সমস্যার শিকার হয়। মালিকি ও খারেজি বারবারদের দু'টি গোত্র পশ্চিমে যেনাতা এবং পূর্বে সানহাজা বারংবার বিদ্রোহ করেতে থাকে। পূর্বাঞ্চলের অন্য দুটি রাজবংশ-তাহারাতের খারেজি রুস্তমি ও ফেজের ইদ্রিসিগণও নব্য প্রতিষ্ঠিত ফাতিমীদেরকে স্বাধীন ভাবে থাকতে দেয়নি। ইবারি উপদ্বীপের সন্নিকটে অবস্থিত মাগবেরি রাজ্যের একটি অংশ স্পেনের উমাইয়াগণ দখল করে রাখেন। প্রথম খলিফা উবাইদুল্লাহ তার প্রধান সহায়তাকারী আবু আব্দুল্লাহ ও তার ভাইকে হত্যা করলে কুতামারা বিদ্রোহ করে। আল মনসুর ও আল মুইজের আমলে ফাতিমীদের অভ্যন্তরেও নানা বিরোধ দেখা দেয়। শিয়াদের

মধ্যকার বিভিন্ন উগ্রপন্থীদের সৃষ্ট নানাবিধ ঝামেলা ও মোকাবিলা করতে হয়। সর্ববিধ সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ফাতিমীরা সর্বদাই অবাধ্য কুতামাদেরকে বাদ দিয়ে কেবল একটি সীমাবদ্ধ সমর্থকগোষ্ঠী ও তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক দক্ষতা ও তাদের উদ্যমের ওপর আস্থা সহকারে নির্ভর করতেন।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ধর্মীয় ক্ষেত্রে ফাতিমীদেরকে সুন্নী ও খারেজীদের মোকাবেলা করতে হতো। এই বিরোধ কখনও শক্তি প্রয়োগ করে, কখনও বা ঘুষ প্রদান করে দমন করা হতো। দমন করা হলেও এই বিরোধ কারওয়ানের ক্ষমতাশীলদের সাংঘাতিক বিড়ম্বনায় ফেলে। খারেজি নেতা আবু ইয়াজিদের সাথে বিরোধের বিষয়টি বিপদজনক রূপ ধারণ করে। তিনি কতিপয় শহর দখল করে নেন ও এক বছর কাল মাহদিয়া অবরোধ করে রাখেন। ৩৩২/৯৪৩-৪ সালে যে বিদ্রোহ শুরু হয় তা আল কাইয়ুমকে পরিশ্রান্ত করে তোলে। আবু ইয়াজিদ স্পেনের উমাইয়া শাসকের সহায়তায় ফাতিমী রাজ বংশকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিলেন। আল মনসুরের শাসনামল পর্যন্ত এর অবসান হয়নি। প্রতিবন্ধকতার আরেকটি উৎস ছিলো পশ্চিমাঞ্চলের যিনাতারা। আবু আবদুল্লাহ কর্তৃক তাহারাতের খারেজী রুস্তমিরা ২৯৬/৯০৭ সালে বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু তখন একটি বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং ২৯৯/৯১১ সালে মাসালা ইবনে হাবুস কর্তৃক স্থানটি পুনঃঅধিকৃত হয়। পরবর্তীকালে তিনি ইদরিসিদেরকে শাসনাধিকার প্রদান করেন। ৩০৮/৯২০ সালে ফেজ, ৩০৯/৯২১ সালে তিনি সিজিলমাসা জয় করেন। মাসালার মৃত্যুর পর তার প্রতিনিধি মুসাব ইবনুল আবিল আফ্রিকায় সাফল্যের সাথে মাগবিকে পরাভূত করে ইদরিসিদের কাছ থেকে ফেজ অধিকার করেন। স্পেনের উমাইয়া শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মাধ্যমে এর অবসান হয়। আল কাউয়ুম সিংহাসনে আরোহণের পর মাগবিরে সফল অভিযান পরিচালনা করে ফেজ উদ্ধার করে ইদরিসিদেরকে ফাতিমীদের অধিনে তাদের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। আল মুইজ তার বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে ও তার সেনাপতি জাওহারের সাময়িক দক্ষতায় সমগ্র পশ্চিমাঞ্চল পরাভূত করে শান্তি স্থাপন করেন এবং এই সময় রাজ্যসীমা আটলান্টিক পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পূর্ব দিকে অবাধ গমনাগমনের জন্য উবায়দুল্লাহ আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে আল মাহদিয়া শহরটি স্থাপন করেন এবং ৩০৮/৯২০-এ শহরটি রাজধানীতে পরিণত হয়। তার ক্ষমতায় আরোহণের পরে তিনি মিসর দখল করার চেষ্টা করেন। ৩০১-২/৯১৩ ও ৩০৭-৯/৯১৯-২১ সালে তার ছেলে কাউয়ুম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত দু'টি অভিযানই ব্যর্থ হয়। ২য় অভিযানে ফাতিমীদের নৌবাহিনী বিধ্বস্ত হয়। সিংহাসনে আরোহণের পর কাউয়ুম ৩২৩/৯২৫ এ তৃতীয় বারের মতো মিসর অধিকারের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন।

আগলাবীদের উত্তরাধিকারী ফাতিমীরাও সিসিলির ব্যাপারে উদাসীন থাকতে পারে নাই। সিলিলিতে পরপর দুইজন গভর্নরকে প্রত্যাহার করতে হয়। নির্বাচিত এক গভর্নর নিজেকে আগলাবী বলে ঘোষণা করে এবং ফাতিমীদের বিরুদ্ধে ২ বার নৌবাহিনী প্রেরণ করে। কিন্তু ২য় বার নৌবহরটি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপরেও বারবার সিসিলিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। ৩৩৬/৯৪৮ সালে আল মনসুর হাসান ইবনে আলী ইবনুল কালবীকে সেখানে গভর্নর করে প্রেরণ করেন।

পরবর্তীতে এই বংশই সেখানকার শাসক বংশ হয়ে যায়।
ফাতিমী খলিফাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই বায়জান্টানিয়ানদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করতে হয়। কয়েকবার ইটালি ও সিসিলির বায়জান্টানিয়ানদের বিরুদ্ধে সেনা ও নৌবাহিনী প্রেরণ করতে হয়।
উবায়দুল্লাহর রাজত্বকালে বায়জান্টানিয়ান সম্রাট বশ্যতার নিদর্শনস্বরূপ বার্ষিক ২২০০০ স্বর্ণ মুদ্রা কর প্রদান করে। বুলগারদের বিরুদ্ধেও সজাগ অবস্থান বজায় রাখতে হয়েছে ফাতিমীদেরকে। জেনোয়া, কাসিকা ও সাত্তিনিয়ার বিরুদ্ধে বারবার অভিযান পরিচালনা করতে হয়। কাউয়ুমের শাসনামলে জিরজেন্তীর বিদ্রোহ কালে সম্রাট বিদ্রোহীদের সমর্থন করার প্রচেষ্টা চালান। মনসুরের শাসনামলে আবু ইয়াজিদের সাথে সংঘর্ষের চূড়ান্ত মুহূর্তেও বায়জান্টানিয়ানদের সম্রাট ফাতিমীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।
আল মুইজ ৩৪৫/৯৫৬-৭ সালে কালবী পরিবার ও জাওহারের নেতৃত্বে ইতালিতে অভিযান পরিচালনা করেন এবং ৩৪৬/৯৫৭-৮ সালে পাঁচ বছরের জন্য বশ্যতামূলক চুক্তিতে বায়জান্টানিয়ানদের বাধ্য করেন। এরপরেও বিশ্বাস ভংগ ও পুনরায় চুক্তির ধারা অব্যাহত ছিল।

মিসর বিজয়

উত্তর আফ্রিকায় আল মুইজের সফলতাকে একটি পুর্বাঞ্চলীয় নীতি অনুসরণ ও মিসর বিজয়ের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। মিসরের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্থনীতি আর সেনাপতি জাওহারের সতর্ক পরিকল্পিত এবং দক্ষতার সাথে মনস্তাত্ত্বিক রাজনৈতিক প্রচারণার ফলে উল্লেখযোগ্য তেমন বাধা ছাড়াই মিসর বিজিত হয়। যদিও উবায়দুল্লাহ ও কাউয়ুম বারকয়েক ব্যর্থ হয়েছিলেন।
জাওহার ১২ শাবান ৩৫৮/১ জুলাই ৯৬৯ সালে ফুসতাতে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে পরবর্তী দুইশ বছর মিসর কিছুটা হলেও শিয়াদেশে পরিণত হয়। জাওহার আব্বাসী খলিফার নামে খুতবা পাঠ বন্ধ করে দেন ও ধীরে ধীরে শিয়া মতবাদ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালান। দুর্ভিক্ষ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট দক্ষতার সাথে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করেন। সেনাবাহিনীর জন্য আলাদা করে কায়রো শহর নির্মাণ করেন এবং জামে আজহারের ভিত্তি স্থাপন করেন।

মিসরে ফাতিমীরা

রাজ্য বিস্তার

জাওহার মিসর সীমান্ত অতিক্রম করে ইয়াশীদি আমিরাতের অধিনস্থ দেশগুলোর ওপর ফাতিমী কর্তৃত্ব বিস্তারের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালান। মক্কা-মদিনা পর্যন্ত দখল করে নেন। ৩৫৯/৯৭০ পর্যন্ত তা দখলেই ছিলো। সিরিয়া অধিকার করার পর দামেস্ক অবরোধ করেন। কিন্তু বাগদাদের খলিফার সাহায্যে ইখশীদি শাসক আল আ'সামের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পিছু হটে যান, তা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ দখল করতে সক্ষম হন।
৩৬৩/৯৭৪ সালে আল হাসান আল আ'সাম কায়রো আক্রমণ করতে এগিয়ে আসেন। এদিকে আল মুইজ ৭ রমজান ৩৬২/১১ জুন ৯৭৩ সালে মাগরিবের শাসনভার সাহহাজী বারবার প্রধান বুলুককীনকে অর্পণ করে কায়রো আগমন

করেন।
কিন্তু আল আ'সামের বেতনভুক্ত বেদুইনরা স্বর্ণের লোভে দল ত্যাগ করলে ফাতিমী সেনাবাহিনী দামেস্ক জয় করে নেয়। তবে এর পরপরই তুর্কি সেনাপতি আলপতেগীন দামেস্ক আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। নতুন খলিফা আল আজিজ ৩৬৮/৯৭৮ সালে দামেস্ক পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। ফিলিস্তিন ও সিরিয়া দখল করা অতীব প্রয়োজনীয় হলেও আল আজিজের চরম লক্ষ্য ছিলো আলেপ্পো দখল করা। কিন্তু এই সেখানে ক্ষমতাসীন তায়্যি পরিবার, জাররাহীগণ, ভিন্নমতাবলম্বী গভর্নর বা সেনাপতিদের পাশাপাশি বিদ্রোহিদের দ্বারা প্ররোচিত বিশৃংঙ্খলাও বিদ্যমান ছিল। ৩৭৩/৯৮৩, ৩৮২/৯৯২-৩ ও ৩৮৪/৯৯৪-৫ সালে আল আজিজের উদ্যোগ ব্যর্থতার পর্যবসিত হয়। এতদসত্ত্বেও এই সময়ে ফাতিমী সার্বভৌমত্ব আটলান্টিক থেকে লোহিত সাগর, ইয়ামান, হিজাজ, সিরিয়া, এমন কি সাময়িকভাবে মাওসিল পর্যন্ত স্বীকৃতি লাভ করে।
সিরিয়ার বিশৃংঙ্খলা অব্যাহত থাকে। সত্য হল দেশটির কখনোই দৃঢ়ভাবে ফাতিমীদের অধিকারভুক্ত ছিলোনা। আল হাকিমের সময় ৪০৬/১০১৫ সালে আলেপ্পো ফাতিমীদের কব্জায় আসে। ৪০৮/১০১৭ সালে একজন ফাতিমী গভর্নর নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনিও সময়ে সময়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে থাকেন ।
ফিলিস্তিনে মুফাররাজ ইবনে দাগফাল মক্কার শরিফদের সহায়তায় বারবার বিদ্রোহ করেন। জাহিরের রাজত্বকালে সিরিয়ার ফাতিমী কর্তৃত্ব মধ্য সিরিয়ার জাররাহী ও কালবী এবং উত্তর সিরিয়ার কিলাবিদের দ্বারা বিপন্ন হয়।
৫ম হি./একাদশ শতাব্দিতে দীর্ঘ কাল সিরিয়া ও ফিলিস্তিন ফাতিমীদের হাতে ছিলোনা। আরমেনিয়ান সেনাপতি বাদরুল জামালী ৪৫৫/১০৬৩-৪৫৬/১০৬৪ পুনরায় ৪৫৬/১০৬৬, ৪৬০/১০৬৮ সালে সিরিয়ার ফাতিমী কর্তৃত্ব বজায় রাখায় চেষ্টা করেন।

বায়জান্টানিয়ান সাম্রাজ্যের সাথে সম্পর্ক

ফাতিমীরা বিশ্বাস করতো যে, তারাই একমাত্র স্বর্গীয় আশির্বাদপ্রাপ্ত শাসক, তাই আব্বাসী, উমাইয়া ও বায়জান্টানিয়ান সাম্রাজ্য দখল করা তাদের কর্তব্যের মাঝে পড়ে।
বায়জান্টানিয়ানদের সাথে শত্রুতা লেগেই ছিলো। আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ, চুক্তি, বায়জান্টানিয়ানদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গ এসব অব্যাহত ছিলো। ফাতিমীরা কনস্টান্টিনোপোলের মসজিদে তাদের নামে খুতবা দিতে বাধ্য করে এবং শক্তিশালী হিসেবে সর্বদা চাপে রাখতে সক্ষম হয়।

আব্বাসীয়দের সাথে সম্পর্ক

আল মুইজ বাগদাদ দখলের স্বপ্ন দেখতেন। আল আজিজ এই লক্ষ্যপূরণে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তিনি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করেন। ৩৬১/৯৭৯-৮০ সালে দূত বিনিময় হয়। কিন্তু কোন ফলাফল পাওয়া যায়নি। আব্বাসীয়রা ফাতিমীদের হযরত আলী রা. বংশের বলে স্বীকার করত না।
আল হাকিম ৪০৩/১০১২-১৩ সালে এবং ৪১৫/১০২৪ সালে আজ জাহিরও গজনবী শাসকদের সাথে শক্তি পরীক্ষায় ব্যর্থ হন। বাগদাদে রাজ উপঢৌকন পাঠানো হলে তা পুড়িয়ে ফেলা হয়। তবে আল জাহির হাল ছেড়ে দেননি। বুওয়ায়হী জালালুদ

দাওলার শাসনামলে তুর্কি সৈন্যদের অসন্তোষের সুযোগ নিতে তিনি ৪২৫হি./১০৩৪খ্রি. সালে প্রচারক প্রেরণ করেন।
আল মুস্তানসির আব্বাসীয় অনেক অঙ্গরাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। তুর্কী আমির আল বাসসী ৪৪৮হি./১০৫৭খ্রি. সালে মাওসিলে, ৪৫১হি./১০৫৯খি. সালে এক বছরের জন্য বাগদাদে ফাতিমী সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সম্মত হন।
সালজুকিরাও স্বাভাবিকভাবে ফাতিমীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ৮৮৭হি./১০০৫খ্রি. সালে তুগরিল বেগ সিরিয়া ও মিসরের দিকে অভিযান প্রেরণ করেন এবং মুস্তানসিরের সাম্রাজ্য বিলুপ্ত করার ঘোষণা দেন। সালজুকিরা তা করতে সক্ষম না হলেও ফাতিমীদের সীমানা সংকুচিত করে দেয়। মক্কায় খুতবায় ফাতিমীদের নাম ৪৬২হি./১০৬৯-৭০খ্রি. সালে সাময়িকভাবে এবং ৪৭৩হি./১০৮৮খ্রি. সালে চূড়ান্তভাবে বাদ দেয়া হয়।

ফাতিমী ও ক্রুসেডসমূহ

উত্তর সিরিয়ায় ক্রুসেডারদের আগমনের সময় আসকালান ও উপকূলীয় কিছু শহর ছাড়া আর কিছুই ফাতিমীদের হাতে ছিল না। তবে একথা সত্য যে, ফাতিমীরা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তেমন আগ্রহী ছিল না। ফাতিমীরা ক্রুসেডারদের থেকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে বেশী শত্রু ভাবাপন্ন ছিলো। তা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্রুসেডাররা সিরিয়া আর ফাতিমীরা ফিলিস্তিন ভাগাভাগি করে নেবে এমন চুক্তি স্বাক্ষর করা যায়নি যদিও দূত আদান প্রদান হয়েছে প্রচুর। এমন সময় ফাতিমী উজির আল আফজাল ৪০ দিনের অবরোধ শেষে সুকমাসের কাছ থেকে ফিলিস্তিন দখল করে নেন এবং ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই প্রায় বিনা বাধায় ক্রুসেডদের কাছে পরাজয় বরণ করে ফিলিস্তিন ক্রুসেডারদের হাতে তুলে দেন।
পরবর্তীতে ক্রুসেডাররা ৪৯৪ হি./১১৫০-১ খ্রি. সালে হায়ফা, আরসুক, কায়সারিয়া দখল করে নেয়। অবশ্য তখন মিসরীয়রা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তবে ৫০৩ হি./১১০৯ খ্রি. সালে ত্রিপোলি ৫০৪হি./১১১০ খ্রি. সালে বৈরুত, সিডনি রক্ষা করা যায় নাই। পরে মিসরের উজীর ইবনে সাল্লার ৫৪৫হি./১১৫০ খ্রি. সালে নুরুদ্দিনের সাথে চুক্তি করে মিসরীয় নৌবহর নিয়ে ক্রুসেডারদের ওপর আক্রমণ চালান। এরও পরে তালাই ইবনে রুজ্জিক আরও কিছু অভিযান পরিচালনা করেন। ৫৫৩ হি./১১৫৮ খ্রি. সালে হিবরনে ও গাজার নিকটে জয়লাভ করেন। তবে এর ফলাফল দিলো সামান্য। ৫৫৬ হি./১১৬১ খ্রি. সালে খলিফা আল আদিদ এর প্ররোচনায় তালাইকে হত্যা করা হয়। তার ছেলে তার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হলে তিনিও ৫৫৮ হি./১১৬৩ খ্রি. সালে অনুরূপ দুর্ভোগের শিকার হন। উচ্চ মিসরের গভর্নর শাওয়ার উজির পদটি দখল করেন। তবে রুজ্জিকের বিশস্ত সেনাপতি দিরঘাম দরবার ও সেনাবাহিনীকে শাওয়ারের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে তাকে মিসর ছাড়া করেন।
শাওয়ার সিরিয়ার নুরুদ্দিন জঙ্গিকে মিসর আক্রমণে প্ররোচিত করলে তিনি সেনাপতি শিরকুহ ও সালাউদ্দিন আউয়ুবির নেতৃত্বে এবং শাওয়ারের পথ নির্দেশনায় এক বাহিনী প্রেরণ করেন। মিসরের উজির দিরঘাম ভালোভাবেই শাসন চালাচ্ছিলেন। তিনি ক্রুসেডারদেরকে কর দিতেন। হঠাৎ করে তিনি কর দেয়া বন্ধ করে দিয়ে ক্রুসেডারদের আক্রমণ প্রাকৃতিক সহযোগিতায় ঠেকিয়ে দিলেও তুর্কি বাহিনীর সাথে

হেরে যান।
শাওয়ার উজিরের পদ দখল করে নেন এবং তুর্কিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে ক্রুসেডারদেরকে মিসর দখলের সুযোগ করে দেন। ক্ষুব্ধ নুরুদ্দিন ফের শিরকুহ ও সালাউদ্দিনের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ করেন।
শাওয়ার ও ফাতিমীরা ক্রুসেডারদের সাথে চুক্তি করেও তুর্কিদেরকে পরাস্ত করতে পারেনি। শিরকুহ শাওয়ারকে হত্যা করে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা নিয়ে নেয়। খলিফাকে নাম মাত্র খলিফা করে রাখেন।
শিরকুহ মাত্র ২ মাস পরে ইন্তেকাল করলে সালাউদ্দিন উজিরের পদে আসীন হন। সালাউদ্দিন ৫৬৭ হিজরীতে জুময়ার খুতবায় আব্বাসী খলিফার নামে খুতবা পাঠ করে। এরই মধ্যে দিয়ে ফাতিমী খিলাফতের অবসান ঘটে। যদিও শেষ খলিফা আল আদিদ আরও কিছুদিন বেঁচে ছিলেন। তিনি মারা গেলে ফাতিমী খিলাফতের সমাপ্তি ঘটে যায়।

ফাতিমীদের অভ্যন্তরীণ নীতি

খলিফা ও উজির

আব্বাসী, উমাইয়াসহ অন্য সুন্নী খলিফাদের মনোনয়ন সাধারণত বংশানুক্রমে পূর্ববর্তী খলিফা কর্তৃক হতো। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ছদ্ম নির্বাচনের মাধ্যমে তা অনুমোদন করিয়ে নেয়া হতো।
ফাতিমী খলিফা নির্বাচন পদ্ধতিও প্রায় অনুরূপ ছিলো। কিন্তু এখানে বিশ্বাস করা হতো যে, খিলাফত একটি স্বর্গীয় বিধান এবং এর উত্তরাধিকার স্বর্গীয় বিধান কর্তৃক পিতা থেকে পুত্রের প্রতি স্থানান্তরিত হয়।
খলিফা নির্বাচিত হওয়ার জন্য অবশ্যই তাকে হযরত আলী রা.-এর বংশের হতে হতো। সুন্নী মতের মতো খলিফা হওয়ার জন্য কোন শর্তেরও দরকার নাই। পরবর্তী খলিফা মনোনয়নের বিষয়টাও গোপন রাখা হতো এবং প্রথম সন্তানকে বাদ দিয়ে ছোট ছেলেকেও মনোনয়ন দেয়া যেত। মোটকথা, ফাতিমীদের খলিফা মনোনয়নের ক্ষেত্রে কোন নিয়ম নীতি ছিলো না; বরং খলিফার খেয়াল-খুশি মতো মনোনয়ন হতো।
খলিফা মনোনীত হওয়ার জন্য বয়স কোন শর্ত ছিলো না। আজ জাহির ১৬ বছর বয়সে, আল হাকিম ১১, আল মুস্তানসির ৭ বছর, আল মুস্তালি ৮ বছর, আল আমির ৫ বছর, আজজাফির ১৭ বছর, আল ফাইজ ৫ বছর আল আদিদ ৯ বছর বয়সে খলিফা মনোনীত হন। এর ফলে প্রকৃত ক্ষমতা থাকতো উজির, রাজমাতা, সেনাপতিদের হাতে। খলিফারা অনেক সময়ই নামমাত্র থাকতেন। খলিফা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে ব্যাপক রক্তপাত হতো। আল মুস্তালী পর্যন্ত তেমন কোন প্রবল আপত্তি ছাড়াই উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয়ে আসছিলো। আল মুস্তালী ১ম খলিফা যিনি প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েন। মুস্তালির পিতা মুস্তানসিরের বড় ছেলে আল নিযারই ছিলেন প্রকৃত খলিফা। উজির আফজাল নিযারের ছোট ভাই আল মুস্তালীর পক্ষে ক্ষমতা দখল করে নেন। নিযার বিদ্রোহ করে যা তার মৃত্যু পর্যন্ত বহাল ছিলো। তবে এই ঘটনা একটি দীর্ঘ মেয়াদী বিভেদ সৃষ্টি করে যা এখনও ঈসমাঈলিদের মাঝে বিদ্যমান।

৫২৪ হি./১১৩০ খ্রি. সালে নিযারীদের চক্রান্তে আল আমিরের মৃত্যু হলে তার চাচাতো ভাই আল হাকিম ক্ষমতায় আরোহণ করে। এখানে ব্যাপকভাবে অনিয়ম হয়, কারণ তার কোন মনোনয়নই হয়নি। তার শাসনামল ছিলো বিশ্বাসঘাতকতা, বিদ্রোহ আর রক্তপাতের যুগ। আল মুস্তানসিরের রাজত্বকালে খিলাফতের দুর্বলতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তাকে নিদারুণ অর্থ সংকটে পড়তে হয় এবং দেহরক্ষিদের দাবী মেটাতে গিয়ে ঘরের ধন-সম্পদ পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়। আল মুস্তালীর সময় থেকে উজিররা সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। একটি নির্দিষ্ট যুগ পরে ফাতিমীদের বৈধতার ধারণাও সাধারণভাবে অপেক্ষাকৃত কম স্বীকৃত হয়েছে। আল মুসতানসিরের রাজত্বকালে আব্বাসী সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। ৪৬২হি./১০৭০খ্রি. সালে নাসিরুদ্দীন আলেকজান্দ্রিয়ায় আব্বাসী খলিফার নামে খুতবা পাঠের ব্যবস্থা করেন। ৪৬৪হি./১০৭২খ্রি. সালে তিনি কায়রোর সামরিক প্রধান থাকার সময়ে আব্বাসীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। যেসব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ফাতিমী খিলাফত সময় অতিক্রম করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। বিশৃংখলা বিজড়িত ফাতিমী খিলাফত শুধু অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দ্বারাই নয়; বরং ক্রুসেডারদের হামলা প্রতিরোধে ব্যর্থতাও এর পতনকে ত্বরান্বিত করে।

উজির ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ

ফাতিমী শাসকদের ইতিহাসে উজিররা একটি ক্রমবর্ধমান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। উত্তর আফ্রিকার কোন মন্ত্রীই উজির উপাধি লাভ করেনি। মিশরের ১ম দুই খলিফার প্রশাসন ও অর্থ বিভাগের প্রধান সংগঠক ইয়াকুব ইবনে কিলকিস সর্ব প্রথম আল আজিজের নিকট হতে এই উপাধি লাভ করেন। কখনও খলিফারা উজির ছাড়াই দেশ চালাতেন, কখনও বা মন্ত্রী থাকতেন, তবে তাকে কোন উপাধি দেয়া হতো না। তারা সরকার ও জনতার মাঝে সাময়িকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। খলিফাদের ওপর তাই উজিরদের ক্ষমতা ও প্রভাব যাই হোক না কেন, তারা খলিফার অনুমোদিত ব্যক্তি হিসেবে শাসকদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতেন। আল মুস্তানসিরের শাসনামলে আইন শৃংখলা পুনরুদ্ধার ও আকস্মিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য বদরুল জামালির নিকট আবেদন করলে তিনি পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হন, তিনি সামরিক মর্যাদার অধিকারী হওয়ায় তাকে অসি ও মসির অধিকারী উজির বলা হতো। তাই উজিররা খলিফা মনোনীত বা জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী হিসেবে পূর্ণ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। প্রধান সেনাপতি, বিচারপতিসহ সকল সরকারী কার্যক্রমের প্রধান ছিলেন তারা।

৫৩১হি./১১০১খ্রি. সালে আল হাফিজের উজির রিজওয়ানের সময় হতে উজিররা খলিফাদের হাতে তেমন কোন ক্ষমতাই রাখতেন না। এমন কি উজিররা আল মালিক উপাধি ধারণ করে সর্বময় ক্ষমতার মালিক হয়ে ওঠেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৫৬৪হি. সালে উজির শেরকুহের মাধ্যমে উপাধিটি তার ভাতিজা সালাহউদ্দিনের কাছে চলে যায় এবং ফাতিমীদের পতন ঘটে।

বিশৃঙ্খলা, বিপ্লব-বিদ্রোহ

ক্ষমতা থেকে খলিফাদের ক্রমাগত পতন, উজিরদের নিরাপত্তাহীনতা, চরম নৈরাজ্য ইত্যাদি দেখে মনে হয় ফাতিমী খিলাফতকে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়,

অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ যুগ অতিক্রম করতে হয়েছে। আল হাকিমের অধীনে আবু বাকওয়া বিদ্রোহ করেন। তিনি স্পেনের উমাইয়াদের সাথে সম্পর্কিত বলে দাবি করেন এবং উমাইয়া বংশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। আল আফজালের চক্রান্তে উচ্ছেদ হওয়া আল নিযার এর বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। হাসান ইবনে সাবাহ তার সাথে যোগ দিয়ে একটি গুপ্তঘাতক দল তৈরি করে এবং ৫২৪হি./১১৩০খ্রি. সালে খলিফা আল আমির নিযারের এক সমর্থকের হাতে নিহত হন।

আল আমিরের কোন সন্তান ছিলোনা। কিন্তু একটি দল আত তায়্যিব নামক তার কল্পিত সন্তানকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করে। ৫৪৩হি./১১৪৮খ্রি. সালে অপর এক ব্যক্তি নিজেকে নিযারের পুত্র দাবী করলে আরেকটি দলের সুচনা হয়। ফাতিমীদের শাসনামলে সাময়িক বিশৃঙ্খলা ছিলো সর্বগ্রাসী। সেনাবাহিনী মন্ত্রীবর্গের নিয়োগ, পদচ্যুতি নিয়ে নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। আবার সেনাবাহিনীর গঠন প্রণালীও এমন ছিলো যে, তাতে জাতিগত বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আল মুস্তানসিরের মা যিনি একজন ক্রীতদাসী ছিলেন তিনি সেনাবাহিনীতে বারবার, তুর্কী, দায়লামী ও কৃষ্ণকায় সুদানীদের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই সৈন্যদল সাধারণত উচ্ছৃঙ্খল ছিলো। তারা বা তাদের নেতৃবৃন্দ নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করতো অথবা পুর্ব সৃষ্ট বিরোধকে বছর বছর জিইয়ে রাখতো। আল মুস্তানসিরের মা কর্তৃক সৃষ্ট ঘটনায় ৪৫৪ হি./১০৬২ খ্রি. ও ৪৫৯ হি./১০৬৭ খ্রি. সালে তুর্কি ও সুদানীদের সাথে রক্তক্ষয়ী এক দাঙ্গার সুত্রপাত হয়। বারবাররা তুর্কিদের সাথে যোগ দেয়। তুর্কি অধিনায়ক ও বিজয়ী নেতা নাসিরুদ দাওলা মুস্তানসিরের কাছ থেকে সকল ক্ষমতা নিয়ে নেন এবং খলিফা তুর্কিদের ক্রমবর্ধমান দাবী মেটাতে গিয়ে নিজের ঘরের সম্পদ পর্যন্ত বিক্রি করতে বাধ্য হন। নাসিরুদদাওলার প্ররোচিত ও দুর্ভিক্ষের দরুন সৃষ্ট গোলযোগ বদরুল জামালীর একনায়কতন্ত্রের অবসান হওয়া পর্যন্ত বিদ্যমান ছিলো। আল হাকিমের রাজত্বকাল থেকে সেনাবাহিনীর বিভিন্ন উপদল উজির পদের জন্য বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করতে থাকে। তাদের কেউ কেউ নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিশেষ সেনাদলও গঠন করে। যেমন তালাই ইবনে রুজ্জিকের বারকিয়্যা বাহিনী জোর করে আল হাকিমের আধ্যাত্মিক ক্ষমতার স্বীকৃতি আদায় করতে চাইলে ৪১১ হি./১০২০ খ্রি. সালে দাঙ্গার সৃষ্টি হয় এবং জনতা প্রচারকদেরকে নির্মমভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলে। ৫৩১ হি./১১৩৭ খ্রি. সালে খ্রিস্টান উজির বাহরামের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করা রিদওয়ানের জন্য সহজ ছিলো। নীল নদের প্রবাহ অপ্রতুলতার কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ ফাতিমী যুগে অধিকাংশ বিশৃঙ্খলার কারণ ছিলো। আজ জাহিরের রাজত্বকালের [৪১৪/১০২৪-৪১৫ হি./১০২৫ খ্রি.] দুর্ভিক্ষ জনসাধারণকে গৃহপালিত সকল পশু খেয়ে ফেলতে বাধ্য করে। খলিফাকে আইন করে হালচাষে ব্যবহৃত পশু খেতে নিষিদ্ধ করতে হয়। সুদানী সৈনিকদের লুণ্ঠন এই দুর্ভিক্ষের একটা কারণ ছিলো। তারা ৪১৫ হি. সালে ব্যাপক খাদ্য লুটতরাজ করে। তবে মুস্তানসিরের সময়কালের দুর্ভিক্ষ ছিলো সবচেয়ে ভয়াবহ। ৪৪৬ হি.সালে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাটকে খাদ্য সরবরাহ করার অনুরোধ করতে বাধ্য হন। দুর্ভিক্ষ পরবর্তী ব্যাধিজড়িত বছরগুলো আরও ভয়াবহ ছিলো। ৪৫৭ হি./৯৬৫ খ্রি.-৪৬৪ হি./১০৭২ খ্রি. সাল পর্যন্ত সাত

বছর এমন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ চলেছে যে- মানুষ, কুকুর, বিড়াল এমনকি মানুষের মাংস পর্যন্ত ভক্ষণ করতে বাধ্য হয়। লুটতরাজ, হত্যা ও খাদ্যের জন্য নারী-পুরুষের অপহরণ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সেনাবাহিনীর তুর্কি ও সুদানীদের মাঝে অবিরত সংঘর্ষ এই অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। বদরুল জামালী ও তার ছেলে আল আফজালের সময়ে অবস্থার উন্নতি হয়।

রাষ্ট্র সংগঠন

উত্তর আফ্রিকার ফাতিমী রাজ্য কতগুলো আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হলেও জটিল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি। কিন্তু মিশরীয় পর্বে আল মুইজ ও আল আজিজ রাজবংশটিকে ক্ষমতার সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। তাবা ইবনে কিলকিস ও উসুলজের সহযোগিতায় জাওহারের দ্বারা কঠিন নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে অর্থ প্রশাসন ও জনপ্রশাসনকে সময়োপযোগি করে তোলেন। প্রতিষ্ঠানটি ক্রমাগত বিকশিত, পরিবর্তিত ও রুপান্তরিত হতে থাকে। ফাতিমী খিলাফত ছিলো একটি কেন্দ্রীভূত প্রশাসন যার শীর্ষে খলিফা কার্যনির্বাহী অথবা প্রতিনিধি হিসেবে প্রাপ্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। উজির সমস্ত কিছুই কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। সরকারের প্রদেশিক বিভাগগুলোর বাস্তব কোন স্বায়ত্তশাসন ছিলো না। যদিও কতিপয় গভর্নর, যেমন কুস এর গভর্নর কখনও কখনও ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন। বিভিন্ন দেওয়ান বা মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হতো। সচিবালয় কখনও উজিরের প্রাসাদে যেমন কিলকিস ও আফজালের সময়ে, আবার কখনও খলিফার প্রাসাদে থাকতো। খলিফার ব্যক্তিগত চাকুরে (খাওয়াস আল খলিফা) ও সরকারী চাকুরে সামরিক প্রশাসনিক, আর্থিক, বিচার বিষয়ক, ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে নিয়োজিত বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাগণই কঠোরভাবে গঠিত একটি ক্রমোচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তাদের বেতন কাঠামোসহ সকল পর্যায়ে ক্রমোচ্চ স্তর বিন্যাস ছিলো। কতিপয় সামরিক কর্মকর্তা অসির অধিকারী উজির, রাজপ্রাসাদের অধিনায়ক, উপ সিপাহসালার, ছত্র বাহক, তরবারি বাহক, সহিস ইত্যাদি বেসরকারি সেবায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের পর্যায়ভুক্ত হতেন। অন্যরা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হতেন। মসির অধিকারী উজির, মন্ত্রী, দফতর প্রধান, দিওয়ানগণ, কোষাগারের প্রশাসক, প্রধান কাজী, ধর্মীয় কর্মকর্তা, প্রধান প্রচারক, মুহাসিব, কুরআন পাঠকগণ, রাজপ্রাসাদের চিকিৎসক ও ফকিহরা অসির অধিকারী কর্মকর্তাদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

ফাতিমী যুগে অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতা

উবায়দুল্লাহ আর মাহদী নগর কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটালে উত্তর আফ্রিকা অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। সম্পদের কৌশলী বন্দোবস্ত তাকে একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী ও নৌবহর গড়ে তুলতে সহায়তা করে। বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ ও অরাজকতা সত্ত্বেও ফাতিমী মিসর একটানা সমৃদ্ধি ভোগ করে। প্রশাসনিক ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার ও যুগোপযোগি কৌশল অবলম্বন, কর ও বিভিন্ন প্রকৃতির আয় হতে উদৃত, সমৃদ্ধ রাজস্বনীতি, রাষ্ট্র মালিকানাধীন শিল্প থেকে প্রাপ্ত আয়, বাণিজ্য ও শুল্ক কর, বাণিজ্য সম্পদ থেকে প্রাপ্ত আয় এবং নীল নদের উপচে পড়া বার্ষিক বন্যাও মিসরের মাটিকে উর্বর করতো। যার ফলে মিসর সমৃদ্ধি অর্জন করে। গম, বার্লি, বিভিন্ন ধরণের শাক-সবজি, ইক্ষু, ও পশুর খাদ্য

উৎপাদন হতো। শিল্প পণ্যের কাঁচামাল হিসেবে উৎপন্ন হতো শন, ইক্ষু, সুতা। কাঠের উৎপাদনের মধ্যে ছিলো নরম কাঠ, ডেমুর গাছ বিশেষ ও বাবলা। শিল্প ক্ষেত্রেও উন্নতি লাভ করে। বয়ন শিল্প ১ম স্থান দখল করে। তিপিস, দানিয়েত্তা, দাযীক অঞ্চলে শন চাষের মাধ্যমে এই শিল্পকে উৎসাহিত করা হয়। এছাড়া কায়রোতে বিভিন্ন নামের কাপড় উৎপন্ন হতো। নীল রংয়ের কুরকুরি, তুসতারি, রেশমি কাপড়ে আল মুইজ মানচিত্র আঁকিয়ে নিয়েছিলেন। অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ছিলো কাঠ শিল্প। ফুসতাত ও আলেকজান্দ্রিয়ার কাচ ও স্ফটিক, মৃৎশিল্প, চীনা মাটির বাসন কোসন, রঙ্গিন মর্মর পাথর ইত্যাদির শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিলো।

ধাতুর কাজ, লৌহ ও তাম্র-তিনতিসের ছুরি ও কাঁচি তৈরীর জন্য- গজদন্ত ও চামড়ার কাজ, কাগজ প্রস্তুত করণ, চিনি ও তেল উৎপাদনে খ্যাতি অর্জন করেছিলো ফাতিমী মিসর। সাধারণত রাজদরবারের বিলাসিতা ও জাঁকজমক, খলিফা কর্তৃক উদার হস্তে উপহার ও পোষাকাদি বিতরণ এবং আল আইয়ুবি ও আল আফজালের মতো উজিরদের দ্বারা শিল্পখাত উপকৃত হয়। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় বাণিজ্যই সমৃদ্ধি লাভ হয়। মিসর অনেক দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ইহুদিরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ফাতিমী আমলে অমুসলিমরাও মুসলিমদের মতো সমান বাণিজ্যিক সুবিধা ভোগ করে। লোহিত সাগরের কুস ও আয়য়াব হয়ে ভারতের সাথে বাণিজ্য চালু ছিলো। ঐসব বন্দর থেকে বাণিজ্য জাহাজে মালামাল বোঝাই করা হত। কায়রোর সাথে আবিসিনিয়া, লুচিয়া, কনস্টান্টিনোপল, ইতালির আমালকির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। ব্যবসা-বাণিজ্য পিসা, জেনোয়া, জেনিস, সিসিলি, উত্তর আফ্রিকা, স্পেন হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। এই সব দেশ মসলা, বস্ত্রাদি ক্রয় করতো। আর মিসরে যেসব জিনিস উৎপন্ন হতো না বা পরিমাণে কম হতো, যেমন গম, লৌহ, কাঠ, রেশম, পশম, নীল ইত্যাদি মিসরে আমদানি করা হতো।

ফাতিমী যুগের সাংস্কৃতিক অবস্থান

ফাতিমী যুগে একটি নিবিড় বুদ্ধিবৃত্তিক, সাহিত্যিক ও শৈল্পিক কর্মধারার অগ্রগতি হয়। উত্তর আফ্রিকার সভাকবিগণ খ্যাতি অর্জন করেন। স্বয়ং খলিফাগণও কবিতা আবৃত্তি করতেন। আল মুইজের পুত্র তাযিমের দিওয়ান প্রকাশিত হয়। তার ও বিভিন্ন ফাতিমী খলিফাদের কবিতার চরণ মুহাম্মাদ হাসান আজমি কর্তৃক আবকারিয়াত আল ফাতিমীইয়্যিন কায়রো ১৯৬০ সালে পাওয়া যায়। জাফর ইবনে মানসুর ইয়ামানী, কাজি আবু হানিফা ও আন নোমান বিচার সংক্রান্ত গূঢ় তত্ত্বমূলক গ্রন্থাবলি রচনা করেন। উবায়দুল্লাহ মসজিদ, প্রাসাদ ও বিভিন্ন প্রকার সরকারি ইমারত নির্মাণসহ আল মাহয়া নির্মাণ করেন। আল মনসুর বিলাস বহুল আল মানসুরিয়া নির্মাণ করেন। মিসরের সংস্কৃতিক কর্মধারা ছিলো বেশ প্রাণবন্ত। খলিফাদের দরবারে ঈসমাইলী নন এমন কবিদেরকেও সাদরে গ্রহণ করা হতো। ধর্ম, ইসমাঈলি মতবাদসমূহের ব্যাখ্যা, কুরআনের রূপক তাফসির, দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য গ্রন্থাদি রচনায় উৎসাহ দেয়া হতো। ফাতিমী যুগে অষ্টোদশ শতাব্দির ইউরোপের মতো বুদ্ধিদৃপ্ত কৌতূহলের উন্মেষ লক্ষ করা যায়। এছাড়াও ফাতিমী যুগ পণ্ডিতদের দ্বারা খ্যাতি লাভ করেছে।

ফাতিমী যুগ বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থকারগণ দ্বারাও সমৃদ্ধ ছিলো। ঐতিহাসিক ইবনে

বুলাক, আল মুসাব্বিহি যিনি কিতাবুদ দিয়ারাতের প্রণেতা। কুসাই আল আজিজের গ্রন্থাকার, আশাশাবুস্তি, আজিজের জন্য একটি ভৌগলিক গ্রন্থের লেখক, মুহান্নাবী, আল মাকবিজি ইবনে আল মামুন আল বাতাইহি; কিতাবুজ জাখাইর আল তুহাফ-এর লেখক, কাজী আলী রশিদ ইবনে আল যুবায়ের ইবনে সায়রাফি আল কুরতি- যিনি সর্বশেষ ফাতিমী খলিফার রাজত্ব কালে তার ইতিহাস রচনা করেন- প্রমুখ বিখ্যাত ছিলেন।

শিয়া মতের মধ্যে একটি মৌলিক আদর্শ সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলে উদ্ভূত শাসক বংশটি অজ্ঞাত পরিমাণ উন্নতি সাধন করে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অসাধারণ ভক্তির জোয়ার তুলে বাহুবলে উত্তর আফ্রিকায় একে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। ফাতিমী শাসক বংশ ছিলো তার প্রশাসনিক রাজত্ব সংক্রান্ত সংগঠন, অর্থনৈতিক অবগতি, আধ্যাত্মিক ও শিল্প-সাহিত্যিক কর্মধারা রাজদরবার ও রাজ প্রাসাদের জাঁকজমক কনস্টান্টিনোপলের সাথে তুলনীয়।

কিন্তু যুগব্যাপী দুর্ভিক্ষ, দুর্দশা সামরিক দলগুলোর মাঝে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বী উজিরগণ কর্তৃক বিদেশি হস্তক্ষেপ ডেকে আনা এই সাম্রাজ্যের জন্য সর্বনাশ বয়ে আনে।

এর ইতিহাস তুলনামূলক বিচারে বৈসাদৃশ্য পূর্ণ। এর মহানুভবতা ও তার পতন উভয়ই ঐতিহাসিকদের জন্য চিত্তাকর্ষক উপাদান সরবরাহ করে এবং ইতিহাসে বংশটির জন্য নিজস্ব স্থান নির্দেশ করে।

ফাতিমীদের পতনের যুগ

সমগ্র এশিয়া মাইনর তুর্কিদের দখলে। বাইজান্টানিয় প্রভুত্ব এশিয়া মাইনরে কার্যত শেষ। তুর্কিদের নজর সে সময় পড়ে মিসরের ওপরে। ঠিক এই মুহূর্তে ইউরোপে ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে রণদামামা বেজে ওঠে। ক্রুসেডের পতাকা তুলে হাজার হাজার খ্রিস্টান যোদ্ধা জেরুজালেম উদ্ধারের জন্য সমেবেত হয়। ১০৯৭ সালে তারা এশিয়াতে প্রবেশ করে। বাইজান্টানিয়রা স্বভাবতই তাদের স্বাগত জানায়। আর ফাতিমীরা স্বাগত জানায় স্বজাতীর সর্বনাশ করে নিজেদের রাজত্ব রক্ষার মানসে। তাদের এই সর্বনাশা কর্মধারায় ক্রুসেডাররা সহজেই জেরুজালেম, এডেসা, এন্টিয়ক, ও সিরিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল নিজেদের দখলে নিয়ে নেয়। তথাপিও ফাতিমীদের হুঁশ হয়নি। কায়রোতে উজিরদের হত্যাযজ্ঞ আর খলিফাদের সিংহাসন রক্ষায় মুসলমানদের শত্রু ক্রুসেডারদের সহায়তা চাইলো। এমনকি যখন তুর্কিরা মিসরের উপকণ্ঠে উপস্থিত, যখন তাদের শক্তি, ক্ষমতা, সেনা, সম্পদ বলতে তেমন কিছুই অবশিষ্ট নাই তখনও তারা বিপুল ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখিয়ে ক্রুসেডারদের সহয়তা চেয়েছিলো। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। মিসরে তুর্কিরা বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে আব্বাসী পতাকা উড্ডীন করে। ২৬২ বছরের ফাতিমী শাসনের অবসান ঘটায়।

ফাতিমীদের পতনের কারণ।

১. আব্দুল্লাহ বিন মায়মুন আর উবায়দুল্লাহ আল মাহদী যে উৎসাহ উদ্দিপনা আর অনুপ্রেরণা নিয়ে ফাতিমী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত অব্যহত থাকেনি।

২. চারদিকে ছিলো সুন্নি খিলাফত। এশিয়া, আফ্রিকা, জুড়ে আব্বাসী খিলাফত।

ইউরোপে আব্বাসী খিলাফত না থাকলেও স্পেনে ছিলো উমাইয়া খিলাফত। তারাও সুন্নি। এমন বিরূপ পার্শ্বশক্তির সাথে মুকাবেলা করে ফাতিমীদের পক্ষে টিকে থাকাই ছিলো মুখ্য বিষয়।

৩. প্রথম দিকের খলিফাগণ রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি প্রচার কাজেও মনোনিবেশ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সে ধারা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে শিয়া মতবাদ জনসাধারণের কাছেও পরিত্যাজ্য হতে থাকে।

৪. উপরন্তু শিয়া মতবাদের বহুধা বিভক্তিও খিলাফতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ৪৮৭হি. মুসতানসিরের মৃত্যুর পর ফাতিমীদের একটি উপদল নিযারিয় নামে আত্মপ্রকাশ করে। হাসান ইবনে সাবাহ নিযারী মতবাদের সমর্থক হয়ে এই মতবাদকে শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত করে এবং নিযারীয়রা ফাতিমীদের বিরোধী হয়ে যায়। ১০ম খলিফা আমিরের মৃত্যুর পরে ৫২৪ সালে তাইয়েবি নামে আরও একটি উপদলের জন্ম হয়। ফাতিমী রাজ্যে ইসমাঈলী, নিযারী, তাইয়েবি, দারাজি, কারামাতিয়া প্রভৃতি দলগুলো মিসর, আফ্রিকা, সিরিয়া, ইয়ামান অঞ্চলে স্বতন্ত্র পরিচয়ে ও পতাকা নিয়ে প্রচার কার্য পরিচালনা করে যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে খিলাফতের ওপরে।

৫. কারামাতিয়া সম্প্রদায়-যারা ইতিপুর্বে কাবা শরিফ আক্রমণ করে হাজরে আসওয়াদ লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়েছিলো- এদের প্রতি মুসলিম বিশ্বের ক্ষোভ ছিলো। পরোক্ষভাবে তা ফাতিমী খিলাফতকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

৬. নীল নদের সুপ্রবাহের ওপর মিসরের অর্থনীতি নির্ভর করে। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে ফাতিমীরা নীল নদের সুফল পায়নি। খরা ও দুর্ভিক্ষ অক্টোপাশের ন্যায় তাদের আটকে রেখে ছিলো। ফলে তারা শত্রুদেশ থেকে সাহায্য নিতে বাধ্য হতো যা তাদের সম্রাজ্যের জন্য হুমকি ছিলো।

৭. সেনাবাহিনীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী সংঘর্ষও ফাতিমীদের পতনের কারণ ছিলো। সুদানী, বারবার, তুর্কি, আরমেনীয় প্রভৃতি জাতীগোষ্ঠীর সৈন্যদের মাঝে সংঘর্ষ লেগেই থাকতো।

৮. সেনাবাহিনী, দেহরক্ষীবাহিনী ও প্রাসাদবাহিনী উজির পদ দখলের মহড়ায় মেতে ওঠায় তাদের সামরিক শক্তিতে ভাটা পড়ে।

৯. খলিফা, আমীর, উজির, সেনাপতিসহ উচ্চ পদস্ত কর্মকর্তারা ভোগ-বিলাস ও জনগণের কল্যাণের পরিবর্তে নিজস্ব আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দেয়াও পতনের আরেকটি কারণ ছিলো।

১০. বংশানুক্রমিক খলিফা মনোনয়ন পদ্ধতির কারণে অনেক সময়ই শিশুরা খলিফার পদে সমাসীন হয়ে যান। ফলে সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতা চলে যায় স্বার্থান্বেষী মহলের হাতে।

১১. ভূমধ্যসাগর আর লোহিত সাগর হাতছাড়া হওয়ার ফলে ফাতিমীদের বহির্বাণিজ্য সংকুচিত হয়ে পড়ে। উত্তর আফ্রিকা হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া এবং জেরুজালেমে ক্রুসেডারদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে ফাতিমী বাণিজ্য ত্রিমুখি সমস্যায় পড়ে।

এসব নানাবিধ কারণ ফাতিমী খিলাফত ধ্বংসের পিছনে সক্রিয় ছিলো।

Z_¨mÎ:
O'Leary, De-Lacy,*A short history of fatimied hedafate*. London-1923.
উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতিমীদের ইতিহাস- এ এইচ এম শামসুর রহমান
L.Massignon, fatima lint at hasain at l'originge dunom dynastique" Fatimites মিউলিখ ১৯৫৭।
হজরত আসকালানী ইবনে হাজার, ইসারা, কায়রো ১৩২৮ হি.
(উত্তর আফ্রিকা ও মিসরে ফাতিমাদের ইতিহাস)- এ এইচ এম শামসুর রহমান
ইসলামী বিশ্বকোষ
ইবনে আল জওঝি,আল মুনতাজ,৭ম
আল মাকরিজি, ইততিআজ, কায়রো
সীরাত আল উসতাজ জাওহার,
Barbaria musulmane et L`orient au Moyen age
W.Madelungs,Fatimiden and Bahrain-qarmatenin islam
আল মাকরিজি,ইততিআজ,কায়রো
M Canard,Une lettre du caliphe Fatimite al Hafiz.a roger.in atti del convegno lnter.di studi ruggeriani,palermo1955La
B.Lewis,The Fatimids and the rout to india,in rev,de la fac,des sc.econom
আস সিজিল্লাত আল মুসতানসারিয়া
আন নুমান ,দাআইমুল ইসলাম
তাজুল আকাইদ
আব্দুল লতিফ আল ইফাদা ওয়াল ইতিবার বি মাফি মিসর মিনাল আছার
হালত মিসর আল ইকতেসাদিয়া
মুহাম্মাদ হাসান আল আজমি,আবকারিয়্যাত আল ফাতিমীয়্যিইন।
বিশেষ কৃতজ্ঞতা স্বীকার: ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা।

.....

লেখক পরিচিতি
কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন



খিলাফতে উসমানিয়া

ইতিকথার কয়েকটি ছেঁড়া পাতা

আবুল আয়িয মুজাহিদ সগির আহমদ চৌধুরী

খিলাফতে উসমানিয়া নবুওয়াতের ধারাবাহিকতা পরিসমাপ্তির পর খিলাফতে রাশিদার সূত্রধরে চলে আসা খিলাফতের উত্তরসূরি এক গৌরবোজ্জ্বল ইসলামি সালতানাতের নাম। ধারাবাহিকতাসূত্রে এটি খিলাফত, কিন্তু আদর্শিক বা চারিত্রিকভাবে এটি একটি সালতানাত। এর প্রতিষ্ঠাতা গাযী উসমান ইবনে আরতুগরুল বেগের নামানুসারে এটি সালতানাতে উসমানিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আধুনিক ইতিহাসে এটি অটোমান সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত।

মহানবী সা.-এর ওফাতের পর নবুওয়াতের ধারাবাহিকতায় খিলাফতে রাশিদা, খিলাফতে উমাইয়া, খিলাফতে আব্বাসিয়ার পর চতুর্থ খিলাফত হচ্ছে খিলাফতে উসমানিয়া। এটি ধর্মীয়-সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্বদানকারী সর্বশেষ প্রতিষ্ঠান, এর সময়কাল ছিল সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৬ শত ২৫ বছর এ-খিলাফত স্থায়ী ছিল। পক্ষান্তরে খিলাফতে রাশিদা (৬৩২–৬৬১ খ্রি.) ৩০ বছর, খিলাফতে উমাইয়া (৬৬১–৭৫০ খ্রি.) ৮৯ বছর ও খিলাফতে আব্বাসিয়া (৭৫০–১২৫৮ খ্রি.) ৫ শত ৮ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা তিনটি মহাদেশের সুবিশাল অঞ্চলজুড়ে খিলাফতে উসমানিয়ার সীমানা সুবিস্তৃত ছিল। পূর্ব ইউরোপের ড্যানিউব নদী থেকে শুরু করে ঈজিয়ান সাগর পর্যন্ত গ্রিক, সার্ব, বুলগার, আলবেনিয়ার প্রভৃতি

জাতির বসতিস্থল বলকান অঞ্চলও খিলাফতে উসমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুরো মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার বেশির ভাগ অংশও এর আওতাভুক্ত ছিল। এ খিলাফতের সুবিশাল সীমানায় পশ্চিমে জিব্রাল্টার প্রণালী, পূর্বে কেস্পিয়ান হ্রদ ও পারস্য উপসাগর, দক্ষিণে অস্ট্রিয়ার সীমান্ত, স্লোভাকিয়া, ক্রাইমিয়া (বর্তমানে ইউক্রেন) এবং উত্তরে সুদান, সোমালিয়া, ইয়েমেন পর্যন্ত সীমান্ত বিস্তৃত ছিল। খিলাফতে উসমানিয়ার আয়তন ছিল ৫ কোটি ২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার (২ কোটি ৭ হাজার ৭ শত ৩১ বর্গমাইল)।

বাংলাদেশের মুসলমান এমনকি ইসলামপ্রতিষ্ঠায় আন্দোলনরত বিভিন্ন সংগঠনের একনিষ্ঠ নেতা-কর্মীরা খিলাফতে রাশিদা, খিলাফতে উমাইয়া ও খিলাফতে আব্বাসিয়া সম্পর্কে যতটুকু অবহিত, খিলাফতে উসমানিয়া সম্পর্কে ততটুকু অবহিত নন। অথচ মুসলিম উম্মাহর গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের বিরাট অংশজুড়ে রয়েছে খিলাফতে উসমানিয়া। পুরোপুরি না হলেও প্রথম ভাগের উসমানী খলীফাগণ কুরআন-সুন্নাহর বহুবিধ বিধি-বিধান তাঁদের ব্যাক্তিগত ও সামাজিক জীবনে বাস্তবায়ন এবং ইসলামি নীতি-আদর্শের আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনার চেষ্টা করেছেন। বক্ষমান নিবন্ধে খিলাফতে উসমানিয়ার উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হলো, যাতে অল্পসময়ে একটি দীর্ঘ ইতিহাসের সার-সংক্ষেপের সাথে ইসলামি আন্দোলনের কর্মীগণ পরিচিত হতে পারেন।

খিলাফতে উসমানিয়া মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ১২৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাতার সমরনায়ক হালাকু খান ইবনে তোলি খান ইবনে চেঙ্গিস খান (১২১৭–১২৬৫ খ্রি.) কর্তৃক খিলাফতে আব্বাসিয়ার রাজধানী বাগদাদনগরী ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফতে আব্বাসিয়ার পতন ঘটে। খিলাফতে আব্বাসিয়ার বিলুপ্তির পর মুসলিমবিশ্বে কেন্দ্রীয় শাসন বলতে আর থাকেনি। খিলাফতের বিশাল অঞ্চল বিভিন্ন স্বাধীন সালতানাতে বিচ্ছিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, যা ইতঃপূর্বে খিলাফতের অধীনে স্থানীয়ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতো। এর মধ্যে সালতানাতে সেলজুকিয়া (১০৩৭–১১৯৪ খ্রি.) অন্যতম। সালতানাতে সেলজুকিয়া পূর্ব্বোলতানাতে গযনবিয়া (৯৬৩–১১৮৭ খ্রি.)-এর অংশ ছিল। তুগরল বেগ ইবনে মীকায়িল ইবনে সালজূক (৯৫৫–১০৬৩ খ্রি.)-এর নেতৃত্বে সেলজুকিরা প্রথম প্রথমসালতানাতে গজনবিয়ার থেকে স্বাধীনতার চেষ্টা করে, পরে ১০৩৭ খ্রিস্টাব্দে গজনবী দখলের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন সালতানাতে সেলজুকিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

১১৯২ খ্রিস্টাব্দে সালতানাতে সেলজুকিয়ার তৃতীয় গদিনশীন প্রথম মালিক শাহ ইবনে আল্প আরসালান মুহাম্মদ ইবনে চাগরাই বেগ দাউদ ইবনে মীকায়িল ইবনে সালজূক (১০১৯–১০৭১ খ্রি.)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর ভাই ও ৪ শাহযাদাদের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সৃষ্টি হয় এবং সালতানাতে সেলজুকিয়া ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্রসালতানাতের মতো এশিয়া মাইনর খ্যাত আনাতোলিয়ায় প্রথম কিলজু আরসলান ইবনে সুলায়মান ইবনেকুতুলমিশ ইবনে ইসরায়িল ইবনে সালজুকের নেতৃত্বে রোমানসালতানাতে সেলজুকিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এ-রোমান সালতানাতে সেলজুকিয়া ধীরে

ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে। সালতানাতজুড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন জায়গীরের অধিপতিরা নিজেদেরকে স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করে বসে।

পশ্চিম আনাতোলিয়ায় ছোট্ট একটি জায়গীর ছিলো সাগুত। এর অধিপতি ছিলেন গাযী আরতুগরুল ইবনে সুলায়মান শাহ বেগ। তাঁর ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন খিলাফতে উসমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা গাযী উসমান ইবনে আরতুগরুল বেগ। ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে গাযী আরতুগরুল বেগের ইন্তিকাল হলে জায়গীরের অধিপতি হিসেবে গাযী উসমান ইবনে আরতুগরিল বেগ তাঁর পিতার মসনদে বসেন। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে রোমান সালতানাতে সেলজুকিয়া থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে তিনিসালতানাতে উসমানিয়ার গোড়াপত্তন করেন। তখন থেকে শুরু করে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ৩৭জন খলীফা ৬ শত ২৫ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। উসমানী খলীফাগণ হচ্ছেন:

১. আমীর প্রথম উসমান

(সময়কাল: ৬৯৯–৭২৬ হি. / ১২৯৯–১৩২৬ খ্রি.)

আমীর, গাযী উসমান খান ইবনে গাযী আরতুগরুল বেগ ইবনে সুলায়মান শাহ বেগ (৬৫৬–৭২৬ হি. = ১২৫৮–১৩২৬ খ্রি.) খিলাফতে উসমানিয়ার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর পিতা গাযী আরতুগরুল বেগ পশ্চিম আনাতোলিয়ায় ছোট্ট একটি জায়গীর সাগুতের অধিপতি ছিলেন। ১২৮১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ইন্তিকাল হলে জায়গীরের অধিপতি হন গাযী উসমান ইবনে আরতুগরিল বেগ। ১২৯৯ খ্রিস্টাব্দে গাযী উসমান ইয়েনি দখল করে রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তিনি ইয়েনি শহরে তাঁর রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। উসমান আমীর উপাধি গ্রহণ করেন।

আমীর উসমান ছিলেন নৈতিকতার বিমূর্ত রূপ। জীবন ছিল অনাড়ম্বর। তিনি রাজ্যময় মসজিদ নির্মাণ করে সালাত কায়েম এবং ইসলামি জ্ঞানচর্চার সুব্যবস্থা করেন। তিনি একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর জীবনে বিলাসিতা ছিল না। তিনি তাঁর উত্তরাধিকারীর জন্যও কোনো ধন-রত্ন জমা করে যাননি। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি তাঁর পুত্র ঊরখানকে সম্বোধন করে বলেন, 'তোমার প্রতি আমার নির্দেশ হচ্ছে, কখনও যুলুম ও নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করবে না। বিজিত অঞ্চলে ইসলামপ্রচারের উদ্যোগ নেবে। জ্ঞানী ব্যক্তিদের সম্মান করবে। শারীয়ার বিধি-বিধান মেনে চলবে। ঐশী আইনই আমাদের বড় শক্তি। পরম করুণাময়ের পথেই আমাদের সমৃদ্ধি। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণ তোমার বড় কর্তব্য। এ-কর্তব্য পালন করতে পারলে তুমি পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ ও আশ্রয় লাভ করতে পারবে।'

১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে আমীর গাযী উসমান ইন্তিকাল করেন। গাযী উসমানের ইন্তিকালের সময় তাঁর রাজ্যসীমা ছিল ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার।

২. সুলতান প্রথম ঊরখান

(সময়কাল: ৭২৬–৭৬১ হি. / ১৩২৭–১৩৬০ খ্রি.)

সুলতান, আমীর, গাযী ঊরখান ইবনে উসমান খান (৬৮০–৭৬১ হি. /১২৮১–১৩৬০ খ্রি.) ছিলেন আমীর উসমানের সুযোগ্য পুত্র। তিনি শাসক হিসেবে 'সুলতান' উপাধি ধারণ করেন।

আমীর উসমানের মতোই সুলতান ঊরখান সাদাসিধে জীবন-যাপন করতেন। তিনি

ছিলেন ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী; রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে বহু মসজিদ-মাদরাসা ও হাসপাতাল স্থাপন করেন। রাজধানী ব্রুসাকে তিনি একটি আদর্শ মুসলিম শহরে প রিণত করেন এবং এতে তিনি একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করেন।

১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান উরখান ইন্তিকাল করেন। সুলতান উরখানের ইন্তিকালের সময় তাঁর রাজ্যসীমা ছিল ৯৫ হাজার বর্গ কিলোমিটার।

৩. সুলতান প্রথম মুরাদ

(সময়কাল: ৭৬১–৭৯১ হি. / ১৩৬০–১৩৮৯ খ্রি.)

সুলতান, আমীর, শহীদ মুরাদ ইবনে উরখান (৭২৬–৭৯১ হি. = ১৩২৬–৭৯১ খ্রি.) ছিলেন সুলতান উরখানের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি একজন নিরক্ষর ব্যক্তি, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ। তিনিও ছিলেন ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান অনুসারী। ইসলামি চিন্তা-চেতনার প্রসারের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। তিনি একজন যোগ্য সংগঠক ছিলেন। তাঁর আমলে উসমানী সেনাবাহিনী বেশ শক্তিশালী হয়।

১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুরাদ শাহাদাতবরণ করেন। শহীদ সুলতান মুরাদের শাহাদাতের সময় তাঁর সালতানাতের সীমা ছিল ৫ লাখ বর্গ কিলোমিটার।

৪. সুলতান প্রথম বায়েযীদ

(সময়কাল: ৭৯১–৮০৫ হি. / ১৩৮৯–১৪০২ খ্রি.)

সুলতান, আমীর, গাযী ইলদ্রিম বায়েযীদ ইবনে মুরাদ (৭৬১–৮০৪ হি. = ১৩৪৫–১৪০৩ খ্রি.) ছিলেন সুলতান প্রথম মুরাদের দ্বিতীয় সন্তান। সুলতান বায়েযীদ একজন দৃঢ় ব্যক্তি ছিলেন। রণক্ষেত্রে তিনি অসাধারণ ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করতেন। এজন্য তাঁকে ইলদ্রিম বা বিদ্যুৎ বলা হতো।

১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে আকশীরে তিনি বন্দী অবস্থায় ইন্তিকাল করেন।

৫. সুলতান প্রথম মুহাম্মদ

(সময়কাল: ৮১৫–৮২৪ হি. / ১৪১৩–১৪২১ খ্রি.)

আঙ্কারার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আকশীরে বন্দী অবস্থায় সুলতান প্রথম বায়যীদের ইন্তিকালের পর খিলাফতে উসমানিয়ায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে শাহযাদাদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়, যা ১১ বছর (১৪০২–১৪১৩ খ্রি.) অব্যাহত থাকে। অবশেষে ১৪১৩ সালে সকল নৈরাজ্যের অবসান ঘটিয়ে সুলতান বায়েযীদের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান, আমীর, গাযী মুহাম্মদ চেলেবী ইবনে বায়েযীদ (৭৮১–৮২৪ হি. / ১৩৭৯–১৪২১ খ্রি.) খিলাফতে উসমানিয়ার নেতৃত্বে আসীন হন এবং সালতানাতে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি দীর্ঘ এগারো বছর যুদ্ধ করার পর সালতানাতকে একত্রিত করতে সক্ষম হন। এজন্য সুলতান মুহাম্মদ খিলাফতে উসমানিয়ার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত।

সুলতান মুহাম্মদ একজন জ্ঞানী, দক্ষ শাসক ও বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন মহানুভব ব্যক্তি, ন্যায়পরায়ণ শাসক, তিনি খুবই শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন। একবার সার্বিয়া, ওয়ালাচিয়া এবং আলবেনিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দকে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাদের নেতাদের বলতে ভুলো না যে, আমি সকলের জন্য শান্তি মঞ্জুর করেছি

এবং সকলের নিকট থেকে শান্তিই গ্রহণ করবো। আল্লাহ শান্তিভঙ্গকারীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।'
সুলতান মুহাম্মদ তাঁর খ্রিস্টান নাগরিকদের প্রতিও অত্যন্ত সদয় ছিলেন। তিনি সালতানাতের সীমানা বৃদ্ধি করার চেয়ে রাষ্ট্রের সংহতির বিষয়টিকে প্রাধান্য দিতেন। ১৪২১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেন।

৬. সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ

(সময়কাল: ৮২৪–৮৫৫ হি. / ১৪২১–১৪৫১ খ্রি.)
সুলতান, আমীর, গাযী, মুরাদ ইবনে মুহাম্মদ চেলেবী (৮০৬–৮৫৫ হি. /১৪০৪–১৪৫১ খ্রি.) ছিলেন সুলতান প্রথম মুহাম্মদ প্রথম সন্তান। তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে সালতানাতের উত্তরাধিকারী হন।
সুলতান দ্বিতীয় মুরাদ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, উদার, বিজ্ঞ ও পরমতসহিষ্ণু হিসেবে সর্বজনবিদিত ছিলেন। তিনি দরিদ্র-দুঃখী মানুষের বন্ধু এবং সুশাসক ছিলেন। ইসলামি মূল্যবোধের উজ্জীবন ও সংরক্ষণের দিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিলো। সালতানাতের সর্বত্র তিনি বহুসংখ্যক মসজিদ-মাদরাসা স্থাপন করেন। জনগণের সুচিকিৎসার জন্য তিনি বহু হাসপাতালও স্থাপন করেছিলেন।
১৪৫১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুরাদ ইন্তিকাল করেন।

৭. সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ

(সময়কাল: ৮৫৫–৮৮৬ হি. /১৪৫১–১৪৮১ খ্রি.)
সুলতান, আমীর, আবুল খায়রাত, আবুল ফুতুহ, গাযী, ফাতিহ মুহাম্মদ খান ইবনে মুরাদ (৮৩৩–৮৮৬ হি. / ১৪২৯–১৪৮১ খ্রি.) ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় মুরাদের জ্যেষ্ঠপুত্র। সালতানাতের মসনদে আসীন হওয়ার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২১ বছর।
সুলতান ফাতিহ মুহাম্মদ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। ইসলামি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। এজন্য তাঁকে 'নেক আমলের জনক' বলা হতো। সুলতান ফাতিহ মুহাম্মদ ছিলেন অসীম সাহসের অধিকারী। রণকৌশলে তাঁর পারদর্শিতা ছিলো অসাধারণ। তিনি একলক্ষ সদস্য বিশিষ্ট একটি সুদক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। খ্রিস্টবাদী ঐতিহাসিক বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল-বিজয়ের জন্য সুলতান মুহাম্মদ 'ফাতিহ মুহাম্মদ' বা বিজেতা মুহাম্মদ নামে ইসলামি ইতিহাসে বিখ্যাত ও অমর হয়ে আছেন।

১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ফাতিহ মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেন। তিনি দু'পর্যায়ে (১৪৪৪–১৪৪৬ খ্রি. ও ১৪৫১–১৪৮১ খ্রি.) খিলাফতে উসমানিয়া পরিচালনা করেন।

৮. সুলতান দ্বিতীয় বায়েযীদ

(সময়কাল: ৮৮৬–৯১৮ হি. / ১৪৮১–১৫১২ খ্রি.)
সুলতান, আমীর, গাযী, বায়েযীদ খান ইবনেফাতিহ মুহাম্মদ খান (৮৫১–৯১৮ হি. / ১৪৪৭–১৫১২ খ্রি.) ছিলেন সুলতান ফাতিহ মুহাম্মদ খানের জ্যেষ্ঠপুত্র। শাসক হিসেবে সুলতান বায়যীদ বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেননি। শাসনকালের

প্রথমভাগে তাঁকে ভাইদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়।
১৫১২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান বায়েযীদ জাননিসার ও অন্যান্য সৈন্যদের চাপের মুখে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র প্রথম সলিমের পক্ষে ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হন এবং সেই বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৯. খলীফা প্রথম সলীম

(সময়কাল: ৯১৮–৯২৬ হি. / ১৫১২–১৫২০ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, খাদিমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন, সুলতান, গাযী, ইয়াভুয সলীম খান ইবনে বায়েযীদ খান আল-কাতি' আশ-শুজা' আল-আব্বাস আর-রাহীব (৮৭৪–৯২৬ হি./১৪৭০–১৫২০ খ্রি.) ছিলেন সুলতান দ্বিতীয় বায়েযীদের কনিষ্ঠ পুত্র। তিনিই প্রথম উসমানী সুলতান, যিনি ইসলামের খলীফা উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ ছিলেন, দীনি আলোচনায় অংশ নিতে আনন্দ পেতেন তিনি। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিত্ব, গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে কাটাতেন। জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির ব্যাপারে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল। সেনাবাহিনীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকেও তাঁর নজর ছিল।
১৫২০ খ্রিস্টাব্দে খলীফা সলীম ইন্তিকাল করেন। তাঁর ৮ বছরের শাসনামলে খিলাফতে উসমানিয়ার আয়তন ২৫ লাখ বর্গকিলোমিটার থেকে বেড়ে ৬৫ লাখ বর্গকিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

১০. খলীফা প্রথম সুলায়মান

(সময়কাল: ৯২৬–৯৭৪ হি. /১৫২০–১৫৬৬ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, সুলায়মান খান ইবনে সলীম খান আল-কানুনী (৯০০–৯৭৪ হি. = ১৪৯৪–১৫৬৬ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম সলীমের একমাত্র পুত্র। খিলাফতে উসমানিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘকালব্যাপী (১৫২০–১৫৬৬ খ্রি.) শাসক ছিলেন তিনি। তিনি সুলায়মান আল-আ'যম (মহান সুলায়মান) হিসেবে পরিচিত। তিনি খিলাফতে উসমানিয়ার যাবতীয় প্রশাসনিক নীতিমালাগুলো তৈরি করেছিলেন বলে তাঁকে সুলায়মান আল-কানুনী (বিধানকর্তা সুলায়মান) বলা হয়। তিনি হাকিমে বায়তে উসমান (উসমানী বংশের শাসক), সুলতানুস সালাতীন (মহামান্য সম্রাট), খানে খানান, হামিউল মুদুনিল মুকাদ্দাসা (পবিত্র তিন শহর মক্কা-মদীন ও আল-কুদসের অভিভাবক) ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।
যুবরাজ থাকাকালেই খলীফা সুলায়মান অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তখন থেকেই তাঁর সততা ও যোগ্যতার কথা সর্বত্র আলোচিত হতো। তিনি খলীফা হওয়ার খবরে সারা খিলাফতজুড়ে আনন্দের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। প্রথম সুলায়মান ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। দৈনন্দিন জীবনে তিনি ইসলামের অনুশাসনগুলো নিষ্ঠার সাথে প্রতিপালন করতেন। সকল মুসলিম নাগরিক যাতে নিয়মিত সালাত আদায় ও সওম পালন করে সেই দিকে তাঁর কঠোর দৃষ্টি ছিল। সালাত ও সওম পালনে শৈথিল্যের জন্য শাস্তির ব্যবস্থাও করেছিলেন তিনি। খলীফা সুলায়মান কুরআনের আটটি খণ্ড নিজের হাতে কপি করে সুলায়মানিয়া মসজিদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তিনি পবিত্র কা'বা ও মসজিদে নববীর প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। সাহসিকতা,

মহানুভবতা, ন্যায়পরায়ণতা ও বদান্যতা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল।
১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে খলীফা সুলায়মান আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করেন।

১১. খলীফা দ্বিতীয় সলীম

(সময়কাল: ৯৭৪–৯৮২ হি. / ১৫৬৬–১৫৭৪ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, সলীম খান ইবনে সুলায়মান খান আল-কানুনী (৯৩০–৯৮২ হি. = ১৫২৪–১৫৭৪ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম সুলায়মানের একমাত্র পুত্র। তখন খিলাফতে উসমানিয়ার স্বর্ণযুগ চলছিল। কিন্তু এমন বিশাল গৌরবময় খিলাফতের শাসক হিসেবে খলীফা সলীম ছিলেন সম্পূর্ণ অযোগ্য। তিনি কবি-সাহিত্যিক এবং চাটুকারদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারীদের সাহচর্য লাভ এবং মদ্যপান তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি বিলাসিতায় মত্ত থাকতেন। শাসনকার্যের প্রতি তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন। খলীফা সলীম হলেন খিলাফতে উসমানিয়ার পতনযুগের প্রথম খলীফা।
১৫৭৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা সলীম ইন্তিকাল করেন।

১২. খলীফা তৃতীয় মুরাদ

(সময়কাল: ৯৮২–১০০৩ হি./ ১৫৭৪–১৫৯৫ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, মুরাদ খান ইবনে সলীম খান (৯৫৩–১০০৩ হি./ ১৫৪৪–১৫৯৫ খ্রি.) ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় সলীমের জ্যেষ্ঠপুত্র।
খলীফা মুরাদ একজন বিলাসী ব্যক্তি ছিলেন। রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো যোগ্যতাই তাঁর ছিল না। তিনি নারী ও মদ নিয়ে প্রাসাদের অভ্যন্তরে মত্ত থাকতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক। তাঁর সুযোগ্য উযীরদের ক্ষমতা হ্রাস করে খিলাফতের বিপুল ক্ষতি সাধন করেন। খলীফা মুরাদের শাসনকালে প্রশাসনে দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা জেঁকে বসেছিল। অনিয়ম সর্বত্র নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য খলীফা মুরাদ মহানবী (সা.)-এর মিম্বর শরীফকে মার্বেল পাথর দ্বারা বিস্ময়কর সাজে সজ্জিত করেছিলেন। যা মসজিদে নববীতে এখনও বিদ্যমান।
১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুরাদ ইন্তিকাল করেন।

১৩. খলীফা তৃতীয় মুহাম্মদ

(সময়কাল: ১০০৩–১০১২ হি./১৫৯৫–১৬০৩ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, মুহাম্মদ খান ইবনে মুরাদ খান আল-আদিল (৯৭৪–১০১২ হি./১৫৬৬–১৬০৩ খ্রি.) ছিলেন খলীফা তৃতীয় মুরাদের জ্যেষ্ঠপুত্র।
খলীফা মুহাম্মদ একজন অপদার্থ শাসক ছিলেন। ক্ষমতা নিষ্কণ্টক করতে তিনি তাঁর আপন ২৭ জন ভাই ও প্রায় ২০ জন বোনকে হত্যা করেছেন। খলীফা মুহাম্মদের মা রানি সুফিয়া তাঁর ওপর প্রভাবশালী ছিলেন এবং স্ত্রীও তাঁর ওপর প্রভাব খাটাতে থাকেন। ফলে শাসনকার্যে মহিলাদের নির্দেশনাই কার্যকর হতে থাকে। অপদার্থ সুলতান উযীরদের ওপর প্রশাসনের যাবতীয় কার্য ন্যস্ত করে নিজে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নারী ও মদ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

১৬০৩ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেন।

১৪. খলীফা প্রথম আহমদ

(সময়কাল: ১০১২–১০২৬ হি./১৬০৩–১৬১৭ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, আহমদ বখতী খান ইবনে মুহাম্মদ খান (৯৯৮–১০২৬ হি./১৫৯০–১৬১৭ খ্রি.) ছিলেন খলীফা তৃতীয় মুহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র। মসনদে সমাসীনের তাঁর বয়স মাত্র ১৪ বছর। খলীফা আহমদ তাঁর পূর্বসূরি দু'খলীফার মতো অযোগ্য ছিলেন না। বয়সে নবীন হলেও তিনি সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রশাসনের ওপর মহিলাদের প্রভাব খর্ব করার পদক্ষেপ নেন।

১৬১৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আহমদ ইন্তিকাল করেন। ইস্তাম্বুলে অবস্থিত ব্লু মসজিদ খ্যাত সুলতান আহমদ মসজিদ খলীফা আহমদের একটি অমর কৃতি।

১৫. খলীফা প্রথম মুস্তফা

(সময়কাল: ১০২৬–১০২৬ হি./১৬১৭–১৬১৭ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, দেলি মুস্তফা খান ইবনে মুহাম্মদ খান (১০০০–১০৪৮ হি./ ১৫৯১–১৬৩৯ খ্রি.) ছিলেন খলীফা তৃতীয় মুহাম্মদের তৃতীয় পুত্র এবং খলীফা প্রথম আহমদের ছোট ভাই। খিলাফতে উসমানিয়ার পূর্ববর্তী ১৪ প্রজন্মের ইতিহাসে সিংহাসনের উত্তরাধিকার পিতা থেকে পুত্রের হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে। প্রথমবারের খলীফা প্রথম আহমদ তাঁর নিজের পুত্রের পরিবর্তে ছোট ভাই মুস্তফাকে খলীফা পদে মনোনয়ন দিয়ে যান। খলীফা প্রথম আহমদের ইন্তিকালের সময় তাঁর ৭ সন্তান রেখে যান, তাঁরা তখনও একেবারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ায় তাঁদের কাউকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করা হয়নি।

খলীফা মুস্তফার জীবনের অধিকাংশ সময় প্রাসাদের অভ্যন্তরে কেটেছিল। ফলে তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ ছিলেন এবং রাজনৈতিক যোগ্যতা বলতে কিছুই ছিল না। তাঁর এ অযোগ্যতার কারণে মাত্র ৩ মাসের মধ্যেই তাঁকে খলীফার পদ থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়া হয়। ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুস্তফা ইন্তিকাল করেন।

১৬. খলীফা দ্বিতীয় উসমান

(সময়কাল: ১০২৬–১০৩১ হি./ ১৬১৭–১৬২২ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, শহীদ, গঞ্জ উসমান খান ইবনে আহমদ খান (১০১৩–১০৩১ হি./১৬০৪–১৬২২ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং খলীফা প্রথম মুস্তফার ভাতিজা। মসনদে সমাসীনের সময় তাঁর বয়স মাত্র ১৩ বছর। খলীফা উসমান শাসনকার্যে কিছুটা যোগ্যতার পরিচয় দেন।

খলীফা উসমান কিছুটা স্বার্থপর প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি সালতানাতের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খামখেয়ালি ছিলেন। তিনি জাননিসার বাহিনীর ক্ষমতা খর্ব করার উদ্যোগ নেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্যরা বিদ্রোহ করেন। এ-বিদ্রোহে খলীফা উসমান ক্ষমতাচ্যুত হন ও ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী সৈনিকদের হাতে নির্মমভাবে

শাহাদাতবরণ করেন।
বিদ্রোহীগণ আবার খলীফা প্রথম মুস্তফাকে ক্ষমতার মসনদে বসায়। তিনি এবারও শাসনকার্য চালাতে ব্যর্থ হন। ফলে কয়েক মাস পরে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হন।

১৭. খলীফা চতুর্থ মুরাদ

(সময়কাল: ১০৩২–১০৪৯ হি./১৬২২–১৬৩৯ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, সাহিবুল কুরআন, গাযী, মুরাদ খান ইবনে আহমদ খান (১০২০–১০৪৯ হি./১৬১২–১৬৪০ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আহমদের দ্বিতীয় পুত্র এবং খলীফা দ্বিতীয় উসমানের ছোট ভাই। মসনদে সমাসীনের সময় তাঁর বয়স মাত্র ১১ বছর।
পতনোন্মুখ খিলাফতে উসমানিয়ার ইতিহাসে খলীফা মুরাদ কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী আমেজ দিতে সক্ষম হন। বয়সে তরুণ হলেও সালতানাত পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃতে খিলাফতে উসমানিয়ার হারানো গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। খলীফা হয়ে তিনি দেখলেন যে, ঘুষ, দুর্নীতি, লুটতরাজ, রাহাজানি, বিভেদ বৈষম্য ও ক্ষমতার অপব্যাবহারে জনগণ অতিষ্ঠ, পূর্ববর্তী বিলাসী খলীফাদের অপব্যয়ের ফলে রাষ্ট্রীয় তহবিল শূন্য, জাননিসার সৈন্যদল অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল। খলীফা মুরাদ অতিগোপনে একটি নতুন সেনাদল গড়ে তোলেন। ছয় স্কোয়াড্রন অশ্বারোহী যোদ্ধা স্বেচ্ছায় এই বাহিনীতে যোগ দেয়। নতুন সৈন্যদের দ্বারা তিনি অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল সৈন্যদেরকে শায়েস্তা করেন। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুরাদ ইন্তিকাল করেন।

১৮. খলীফা প্রথম ইবরাহীম

(সময়কাল: ১০৪৯–১০৫৮ হি./১৬৩৯–১৬৪৮ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, শহীদ, ইবরাহীম খান আসাবী ইবনে আহমদ খান (১০২৪–১০৫৮ হি./১৬১৫–১৬৪৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আহমদের দ্বিতীয় পুত্র এবং খলীফা দ্বিতীয় উসমান ও চতুর্থ মুরাদের ছোট ভাই। খলীফা মুরাদের কোনো পুত্রসন্তান ছিল না বিধায় তাঁর ছোটভাই প্রথম ইবরাহীম খিলাফতের মসনদে বসেন। তখন তাঁর বয়স ২৫ বছর। খলীফা ইবরাহীম ১৬৪৮ খ্রিস্টাব্দে এক সেনাবিদ্রোহে শাহাদাতবরণ করেন।

১৯. খলীফা চতুর্থ মুহাম্মদ

(সময়কাল: ১০৫৮–১০৯৯ হি./১৬৪৮–১৬৮৭ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, মুহাম্মদ খান ইবনে ইবরাহীম খান আওজী (১০৫১–১১০৪ হি./১৬৪১–১৬৯৩ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম ইবরাহীমের দ্বিতীয় পুত্র। মসনদে সমাসীনের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৭ বছর। ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুহাম্মদ পদচ্যুত হন। ১৬৯৩ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুহাম্মদ ইন্তিকাল করেন।

২০. খলীফা দ্বিতীয় সুলায়মান

(সময়কাল: ১০৯৯–১১০২ হি./১৬৮৭–১৬৯১ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, সুলায়মান খান ইবনে

ইবরাহীম খান (১০৫২–১১০২ হি./১৬৪২–১৬৯১ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম ইবরাহীমের দ্বিতীয় পুত্র ও খলীফা চতুর্থ মুহাম্মদের ছোট ভাই।
খলীফা সুলায়মান এর আগে দীর্ঘদিন কারাগারে ছিলেন। ফলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক কিংবা সামরিক প্রশিক্ষণ লাভের কোনো সুযোগ তিনি পাননি। খিলাফতজুড়ে তখন অরাজকতা চলছিল। খলীফা সুলায়মান ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি মুকাবিলা করেন। ১৬৯১ খ্রিস্টাব্দে নিঃসন্তান খলীফা সুলায়মান ইন্তিকাল করেন।

২১. খলীফা দ্বিতীয় আহমদ

(সময়কাল: ১১০২–১১০৬ হি./১৬৯১–১৬৯৪ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, আহমদ খান ইবনে ইবরাহীম খান (১০৫২–১১০৬ হি./১৬৪৩–১৬৯৪ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম ইবরাহীমের তৃতীয় পুত্র এবং খলীফা চতুর্থ মুহাম্মদ ও দ্বিতীয় সুলায়মানের ছোট ভাই। খলীফা আহমদ একজন অযোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দুর্বলচেতা ও সন্দেহপ্রবণ। শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি দারুন ব্যর্থতার পরিচয় দেন। ১৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে নিঃসন্তান খলীফা আহমদ ভগ্নহৃদয়ে ইন্তিকাল করেন।

২২. খলীফা দ্বিতীয় মুস্তফা

(সময়কাল: ১১০৬–১১১৫ হি./১৬৯৪–১৭০৩ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, মুস্তফা খান ইবনে মুহাম্মদ খান (১০৭৪–১১১৫ হি./১৬৬৩–১৭০৩ খ্রি.) ছিলেন খলীফা চতুর্থ মুহাম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
খলীফা মুস্তফা তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাদের তুলনায় যোগ্য ও সাহসী ছিলেন। ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুস্তফা পদত্যাগ করেন এবং সেই বৎসরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

২৩. খলীফা তৃতীয় আহমদ

(সময়কাল: ১১১৫–১১৪৩ হি./১৭০৩–১৭৩০ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, বাদশাহ লালা দূরী আহমদ খান ইবনে মুহাম্মদ খান (১০৮৪–১১৪৮ হি. /১৬৭৩–১৭৩৬ খ্রি.) ছিলেন খলীফা চতুর্থ মুহাম্মদের দ্বিতীয় পুত্র এবং খলীফা প্রথম মুস্তফার ছোট ভাই।
খলীফা আহমদ একজন শান্তিকামী মানুষ ছিলেন। তবে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে তিনি কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।
১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আহমদ পদত্যাগ করেন এবং ১৭৩৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

২৪. খলীফা প্রথম মাহমুদ

(সময়কাল: ১১৪৩–১১৬৮ হি. /১৭৩০–১৭৫৮ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, গম্বুর মাহমুদ খান ইবনে মুস্তফা খান (১১০৮–১১৬৮ হি./১৬৯৬–১৭৫৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় মুস্তফার জ্যেষ্ঠ পুত্র।
১৭৫৮ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মাহমুদ ইন্তিকাল করেন।

২৫. খলীফা তৃতীয় উসমান

(সময়কাল: ১১৬৮–১১৭১ হি./১৭৫৮–১৭৬১ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, শাহ সুফি উসমান খান ইবনে মুস্তফা খান (১১০৮–১১৭০ হি. /১৬৯৬–১৭৬১ খ্রি.) ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় মুস্তফার দ্বিতীয় পুত্র এবং খলীফা প্রথম মাহমুদের ছোট ভাই।

খলীফা উসমান ধর্মপ্রাণ এবং সুফি-দরবেশ শ্রেণির ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি মাত্র ৩ বছর খলীফা ছিলেন। এসময়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি। তাঁর শাসনকালে সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল। ১৭৬১ খ্রিস্টাব্দে খলীফা উসমান ইন্তিকাল করেন।

২৬. খলীফা তৃতীয় মুস্তফা

(সময়কাল: ১১৭১–১১৮৭ হি. /১৭৬১–১৭৭৩ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, মুস্তফা স্বীবনে আহমদ খান (১১১৯–১১৮৬ হি./১৭১৭–১৭৭৩ খ্রি.) ছিলেন খলীফা তৃতীয় আহমদের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

খলীফা মুস্তফা তাঁর শাসনকালের প্রথম দিকে বেশ যোগ্যতার পরিচয় দেন। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুস্তফা ইন্তিকাল করেন।

২৭. খলীফা প্রথম আবদুল হামীদ

(সময়কাল: ১১৮৭–১২০৩ হি./১৭৭৩–১৭৮৯ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, ইসলাহজি আবদুল হামীদ খান ইবনে আহমদ খান (১১৩৮–১২০৩ হি./১৭২৫–১৭৮৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা তৃতীয় আহমদের দ্বিতীয় পুত্র ও খলীফা তৃতীয় মুস্তফার ছোট ভাই। খলীফা আবদুল হামীদ ছিলেন শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করতেন না। ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আবদুল হামীদ ইন্তিকাল করেন।

২৮. খলীফা তৃতীয় সলীম

(সময়কাল: ১২০৩–১২২২ হি./১৭৮৯–১৮০৭ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, শহীদ, বেসতকার সলীম খান ইবনে মুস্তফা খান নিযামী (১১৭৫–১২২৩ হি./১৭৬১–১৮০৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা তৃতীয় মুস্তফার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং খলীফা প্রথম আবদুল হামীদের ভাতিজা।

খলীফা সলীম ছিলেন একজন প্রতিভাবান ব্যক্তি। তবে তিনি ইউরোপীয় ভাবাদর্শে কিছুটা অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনি বিভিন্নমুখী সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। উযীরে আযমের ক্ষমতা হ্রাস করে উযীরপরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। খলীফা সলীম ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর অনুকরণে উসমানী সৈন্যদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ফ্রান্সের বহু সামরিক অফিসার সেনাবাহিনার সংস্কার কাজে নিয়োগ দেন। ফ্রান্স থেকে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং সৈন্যদের জন্য সামরিক পোষাক পরিধান ও নিয়মিত কুচকাওয়াজ বাধ্যতামূলক করেন। এ কাজে রাশিয়াতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত উমার পাশাকেও কাজে লাগান।

খলীফা সলীম সামন্তপ্রথার বিলোপ সাধন করেন। সেই সঙ্গে ইউরোপীয় অনুকরণে শিক্ষাব্যবস্থায় বিভিন্ন আধুনিক বিষয় পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। ইউরোপীয় রাজনীতি,

কুটনীতি ও সমরনীতি ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি বহু তরুণকে লন্ডন, প্যারিস, ভিয়েনা ও বার্লিন পাঠান। তবে ইউরোপীয় ধাঁচে সংস্কার সাধন করতে গিয়ে তিনি ইসলামি শক্তি থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।
খলীফা সলীমের শাসনকালে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি হয়। দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করে আত্মগোপন করেন। অতঃপর ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি আততায়ীর হাতে শাহাদাতবরণ করেন।

২৯. খলীফা চতুর্থ মুস্তফা

(সময়কাল: ১২২২–১২২৩ হি./ ১৮০৭–১৮০৮ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, মুস্তফা খান ইবনে আবদুল হামীদ খান (১১৯৩–১২২৩ হি. = ১৭৭৯–১৮০৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আবদুল হামীদের জ্যেষ্ঠপুত্র ও খলীফা তৃতীয় সলীমের চাচাতো ভাই।
খলীফা তৃতীয় সলীমের শাসনামলের শেষ দিকে সৃষ্টি হওয়া গোলযোগ তখনও অব্যাহত ছিল, ফলে মাত্র একবছরের পরেই খলীফা মুস্তাফাকে পদত্যাগ করতে হয়। আর ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩০. খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদ

(সময়কাল: ১২২৩–১২৫৫ হি./১৮০৮–১৮৩৯ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, ইনকিলাবজি মাহমুদ খান ইবনে আবদুল হামীদ খান আদলী (১১৯৯–১২২৫ হি./১৭৮৫–১৮৩৯ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আবদুল হামীদের দ্বিতীয় পুত্র ও খলীফা চতুর্থ মুস্তফার ছোট ভাই। খলীফা মাহমুদ প্রশাসনিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য প্রসিদ্ধ। এজন্য তাঁকে ইনকিলাবজি বলা হয়।
খলীফা মাহমুদ খলীফা তৃতীয় সলীমের সংস্কার-চিন্তধারায় প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর শাসনামলে মুস্তাফা সামী ও সাদিক রিফাত প্রমুখ ব্যক্তি তাদের লেখার মাধ্যমে ইউরোপীয় জীবন-দর্শনের বীজ ছড়িয়ে দিতে শুরু করেন। খলীফা মাহমুদ তাঁর ক্ষমতাকে শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে সীমাবদ্ধ করে দেন।
খলীফা মাহমুদ আইনের খসড়া তৈরির জন্য তিনি একটি পরিষদ গঠন করেন। পরবর্তীকালে এটি কিছুটা প্রতিনিধিত্বশীল রূপ নেয় এবং এর নাম হয় শূরায়ে দওলাত। খলীফা মাহমুদ পাগড়ির স্থলে ফেজটুপির প্রচলন করেন। সৈন্যদের জন্য তিনি পাজামার স্থলে পাতলুন এবং জবরজং জুতার পরিবর্তে বুট ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেন।
১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মাহমুদ ইন্তিকাল করেন।

৩১. খলীফা প্রথম আবদুল মজীদ

(সময়কাল: ১২৫৫–১২৭৭ হি./১৮৩৯–১৮৬১ খ্রি.)
খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, আবদুল মজীদ খান ইবনে মাহমদু খান (১২৩৭–১২৭৭ হি./১৮২৩–১৮৬১ খ্রি.) ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদের জ্যেষ্ঠপুত্র। মসনদে সমাসীনের তাঁর বয়স হয়েছিল ১৮ বছর।
খলীফা আবদুল মজীদ তাঁর পিতার মতো ইউরোপীয় চিন্তাধারায় উজ্জীবিত ছিলেন।

তিনি 'খাত্তি শরীফ' ও 'খাত্তি হুমায়ুন' নামে রাজকীয় ফরমান জারি করে তানযীমাত বা সংস্কার প্রয়াস চালান। তাঁর লক্ষ্য ছিলো খিলাফতে উসমানিয়াকে ইউরোপীয় কায়দায় গড়ে তোলা। তানযীমাতের কিছু দফা ছিলো প্রশংসনীয়। আবার কিছু কিছু দফা ছিল ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই এসব সংস্কার সাধারণ স্বীকৃতি লাভ করেনি। আলেমসমাজ এসবের চরম বিরোধিতা করে। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আবদুল মজীদ ইন্তিকাল করেন।

তানযীমাত (১৮৩৯–১৮৭৬ খ্রি.)

তানযীমাত হচ্ছে খিলাফতে উসমানিয়ায় প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কারমূলক একটি আন্দোলন। ১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদের সময় এ-আন্দোলনের উৎপত্তি হয়। খলীফা প্রথম আবদুল মজীদ, খলীফা আবদুল আযীয ও খলীফা পঞ্চম মুরাদের শেষ সময় ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এ-সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত থাকে। মুস্তফা রশীদ পাশা, আলী ফুয়াদ পাশা প্রমুখ ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত রাজনীতিক ও সরকারি কর্মকর্তা পশ্চিমা ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এ-আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

খিলাফতে উসমানিয়াকে আধুনিক করে তোলা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ঠেকানো এবং আগ্রাসী শক্তি থেকে সীমানা সুরক্ষার নামে এ-উচ্চবিলাসী পরিকল্পনার মূলে ছিল অমুসলিম ও তুর্কিভিন্ন জাতিসমূহের সমন্বয়ে একটি বহুজাতিক সাম্রাজ্য গঠন, ব্যক্তিশাসনের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্রের পথ প্রসারণ এবং ইসলামি মূল্যবোধ ও মুসলিম মিল্লাত প্রথা বাতিল করে সর্বজনীন নীতি-আদর্শ গ্রহণ করা। খিলাফতে উসমানিয়াসহ অন্যান্য খিলাফতে খলীফা মনোনীত হওয়ার নীতি ঠিক ইসলাম-অনুমোদিত ছিল না। সেটার সংস্কার প্রয়োজন ছিল। সেই সাথে একটি খিলাফত সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজনে মুসলিম উম্মাহকে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সামরিক শক্তিতে অংশীদার হওয়াও দরকার ছিল, কিন্তু কথিত তানযীমাত সংস্কার মুসলিমদেরকে সে-ধরনের উন্নয়নমূলক কোনো কর্মসূচির প্রতি অনুপ্রাণিত করেনি।

তানযীমাত সংস্কারের ফলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনের বিষবাষ্পই ছড়িয়েছে খিলাফতে উসমানিয়ায়। সার্বজনীন মানবাধিকারের স্বীকৃতির নামে সাম্রাজ্যের মূলনীতি থেকে ক্রমান্বয়ে ইসলামি আইনকে সরিয়ে ফেলা, অসম্প্রদায়িক সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের পথও প্রসারিত হয়েছিল এ-তানযীমাত সংস্কারের কারণেই। তানযীমাত সংস্কারের ফলে অমুসলিমদের জন্য জিজিয়া করের অবলুপ্তি ও কর সংগ্রহের একটি নিয়মিত পদ্ধতি এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিকত্ব বিষয়ক জাতীয়তা আইন প্রণীত হয়। ভূমি আইন ১৮৫৮ অনুযায়ী ভূমির মালিকানার কাঠামো পরিবর্তনের ফলে রাশিয়ান ইহুদিরা ফিলিস্তিনে জমি কেনার অনুমতি পায় যা প্রথম এলিয়ার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে তাদের পুনর্বাসনে সক্ষম করে তোলে এবং বর্তমান বর্ণবাদী ইহুদি রাষ্ট্রসৃষ্টির পথ সুগম করে। বস্তুত খিলাফতে উসমানিয়াকে ধ্বংসের পরবর্তী যাবতীয় অঘটন যেমন– ইংস তুর্ক আন্দোলন, কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস ও কামাল আতাতুর্কদের সৃষ্টি হওয়ার পেছনে অনুঘটক হিসেবে তানযীমাত সংস্কারই সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছে।

খিলাফতে উসমানিয়ার পূর্ববর্তী বুযুর্গ সুলতান ও আকাবির নেতৃত্ববর্গ পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামি নীতি-বিশ্বাসকে যাবতীয় শক্তির উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতেন। খিলাফতের সর্বত্র ইসলামের বিধি-বিধান কায়েমে সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলামি জ্ঞানে শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে তাঁরা ব্যাপকভাবে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতেন। কাযীগণ বিচার-ফায়সালা করতেন শারীয়া অনুযায়ী। রাষ্ট্রীয় নীতিতে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক কোনো আইন যাতে তৈরি না হয় সেটি দেখভালের জন্য শায়খুল ইসলামের ওপর দায়িত্ব অর্পিত হয়। যাকাত ও উশর আদায় করে দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হতো, মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল নাগরিকের জান-মাল ও ইযযতের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা করা হতো এবং বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা প্রতিরোধ করা হতো।

আল্লাহর পথে জিহাদকে তাঁরা অতিশয় গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা নিজেরাই ছিলেন মুজাহিদ। তাঁদের আচরণ এবং অনুসৃত সুনীতিতে মুগ্ধ হয়ে ইউরোপে হাজার হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং মজবুত ঈমানী বলে বলিয়ান হওয়ার বদৌলতে খিলাফতে উসমানিয়া ছিল ইউরোপী খ্রিস্টানশক্তির জন্য মূর্তিমান আতঙ্কের বিষয়। ইউরোপের খ্রিস্টানশক্তি খিলাফতের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে চেয়েও অপরাজেয় খিলাফতে উসমানিয়ার কাছে বরাবরই ধরাশায়ী হয়েছিল। সে-সময়ের ইউরোপীয় জনগণ সভ্যতা, নীতি-আদর্শ, মানবিকতা শিখেছিল মুসলমানদের কাছে। ইসলামি আদর্শের প্রতি তাঁদের মাঝে নমনীয়তা, শ্রদ্ধাবোধ এবং দুর্বলতা পরিলক্ষিত হতো। তাঁরা মুসলমানদের আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করতেন এবং খিলাফতে উসমানিয়াকে নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে বেছে নিতেন।

কিন্তু শেষদিকের কয়েকজন খলীফা ইসলামি জীবনদর্শন ও বিধানকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন। ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, প্রজাতন্ত্রী মূল্যবোধ ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। ইসলামের আলোকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রসার ঘটানো, কুরআন-সুন্নাহ থেকে যুগজিজ্ঞাসার জবাব অন্বেষণ এবং যুগোপযোগী সামরিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রতি উদাসীনতা শেষপর্যন্ত তাদেরকে ইউরোপীয় শক্তির বশংবদে পরিণত করে। তানযীমাত সংস্কার এসব খলীফাদের আদর্শিকভাবে দেউলিয়াত্বেরই একটি প্রমাণ। এর পরিণতিতে ইউরোপীয়দের চিন্তাধারা প্রবেশের জন্য খিলাফতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং ইউরোপের ভালো-মন্দ সবকিছুই বন্যার পানির মতো খিলাফতের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। ফলে মুসলিমদের ঘরেই ইসলাম ও মুসলিমদের দুশমন তৈরি হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এরাই খিলাফতে উসমানিয়ার বিলুপ্তি এবং ইসলামের উচ্ছেদ সাধন করে।

৩২. খলীফা আবদুল আযীয

(সময়কাল: ১২৭৭–১২৯৩ হি./১৮৬১–১৮৭৬ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, শহীদ, আবদুল আযীয খান ইবনে মাহমদ খান (১২৪৫–১২৯৩ হি. /১৮৩০–১৮৭৬ খ্রি.) ছিলেন খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদের দ্বিতীয় পুত্র ও খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের ছোট ভাই।

খলীফা আবদুল আযীয ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। শারীরিকভাবে সুঠামদেহী,

পহলোয়ান। তিনি কবিতা ও সঙ্গীতের প্রতিও আসক্ত ছিলেন। খলীফা আবদুল আযীয তাঁর পিতা খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদ ও ভাই খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের শাসনামলে সূচিত তানযীমাত সংস্কারের কর্মসূচি অব্যাহত রাখেন। তিনিই প্রথম কোনো উসমানী শাসক যিনি ইউরোপ সফর করেছিলেন। তিনি প্রশাসন, শিক্ষা, সামরিক ও রাজনীতিক ক্ষেত্রে সংস্কারে ইউরোপী অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। তবে ইউরোপ সফরে তিনি অনুভব করতে পারেন, পুরো ইউরোপী শক্তি খিলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে। শুধু ইসলামি রাষ্ট্র হওয়ার কারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো খিলাফতে উসমানিয়ার উৎখাতে ঐক্যবদ্ধ এবং প্রতিনিয়ত এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। খ্রিস্টবাদী ক্রুসেডে খিলাফতে উসমানিয়ার কাছে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর ভয়াবহ পরাজয়ের ইতিহাস তারা এখনও ভুলেনি এবং তাদের মন-মস্তিষ্কে এখনও মুসলিম বিরোধী জিঘাংসা বপিত রয়েছে।

অতঃপর তিনি খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদ ও ভাই খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত রাখলেও তাতে ইসলামি নীতি-আদর্শ সমুন্নত রাখার চেষ্টা করেন। সংস্কারের অংশ হিসেবে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে নতুন প্রদেশ আইন চালু করেন, একই সাথে দিওয়ানুল আহকাম আল-আদলিয়া (সুপ্রিম কোর্ট) প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের অনুকরণে জাতীয় সংসদ প্রবর্তন করেন, যার নাম দেওয়া হয় শূরায়ে দওলত। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে শিক্ষাক্ষেত্রে ইউরোপীয় ধাঁচে সেকেন্ডারি স্কুল স্থাপন করেন। এসব নতুন ধারার স্কুলে মুসলিম, ইহুদি-খ্রিস্টান শিক্ষার্থীরাও একই সঙ্গে লেখাপড়া করতো। তাঁর শাসনামলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ইউরোপীয় ধাঁচে ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক কারিকুলাম গ্রহণ করা হয়।

এসব সংস্কার সত্ত্বেও ইউরোপী শক্তি খিলাফতে উসমানিয়ার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারছিল না। কারণ তখনও খিলাফত ও ইউরোপী বিশ্বের মাঝে আদর্শিকভাবে পরিস্কার একটি পার্থক্য রয়ে গিয়েছিল। ইউরোপী নীতি-আদর্শ ছিল মানব-রচিত আর খিলাফতে উসমানিয়ার আইন-কানুন তখনও ইসলামি শরীয়ত থেকে উৎসারিত। খলীফা আবদুল আযীযের আমলে ফিকহে হানাফীর ভিত্তিতে বিচার-ব্যবস্থারও সংস্কার সাধিত হয়। তাঁর শাসনামলেই বিখ্যাত মুজাল্লাতুল আহকাম আল-আদলিয়া প্রকাশিত হয়। সামরিক ক্ষেত্রে বড় ধরনের সংস্কার সাধন করেন তিনি। পুরোনো ঢাল-তরবারির বদলে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা করেন তিনি, ইউরোপ থেকে নতুন যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহ করেন। সর্বস্তরের নাগরিকদের জন্য সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করেন।

তিনি উসমানী নৌবাহিনীতে ২১টি যুদ্ধজাহাজ যোগ করেন, ফলে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের পর সে-সময় উসমানী নৌবাহিনীই বৃহত্তম নৌবাহিনীতে পরণিত হয়। দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা ও আমলাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনিই প্রথম খিলাফতের বিভিন্ন শহর-বন্দরের সাথে রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করেন। ডাকঘর ও যাদুঘরও তিনিই প্রথম চালু করেন। উসমানী ব্যাংকও প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁর শাসনামলে। অল্পসময়ের মধ্যে এসব সংস্কারের ফলে খিলাফতে উসমানিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। এতে ইউরোপী শক্তি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। ইউরোপী শক্তিগুলো খিলাফতে উসমানিয়াকে ইউরোপের রুগ্ন শক্তি হিসেবে দেখতে আকাঙ্ক্ষী ছিল এবং ক্রমান্বয়ে এর সম্পূর্ণ বিনাস কামনা করতো।

অতএব, ইউরোপীয় শক্তিগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা এবং ইহুদি ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ইয়ং তুর্কস নামে তুর্কি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। খিলাফতে উসমানিয়ার মূল ভূ-খণ্ড তুরস্কে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ধাঁচের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছিল এর উদ্দেশ্য। খলীফা আবদুল আযীয এদের তৎপরতা মেনে নেননি। তিনি তাদের প্রতি দমননীতি অবলম্বন করেন। ফলে ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়ং তুর্কসের আহমদ শফীক মিদহাত পাশা (১৮২২–১৮৮৪ খ্রি.) ও তার অনুচরদের চাপের মুখে খলীফা আবদুল আযীয পদত্যাগে বাধ্য হন এবং গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে শাহাদাতবরণ করেন।

ইয়াং তুর্কস

ক্রমান্বয়ে ক্ষয়িষ্ণু খিলাফতে উসমানিয়ার সীমানা সুরক্ষা, সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বিরোধী আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থামানো, অগ্রসরমান বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে খিলাফতে উসমানিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য তানযীমাত সংস্কার নামে একটি উচ্চবিলাসী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল খলীফা দ্বিতীয় মাহমুদের আমলে। এর মূল লক্ষ্য প্রশাসনিক, সামরিক ও অর্থনীতিক সংস্কার। যদিও এসব সংস্কারের ক্ষেত্রে খলীফাবর্গ ইউরোপীয় মডেলের প্রতিই ঝুঁকে ছিলেন, কিন্তু সাংবিধানিক সংস্কার ও খিলাফতের মূলনীতি হিসেবে কুরআন-সুন্নাহের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণের আত্মঘাতিমূলক কোনো পরিকল্পনার সাথে খলীফাবর্গ সম্পৃক্ত ছিলেন না।

তবে যাদের উদ্যোগ-উৎসাহে খলীফাবর্গ তানযীমাত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, তারা সকলেই ছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত সরকারি কর্মকর্তা ও পশ্চিমা জীবনদর্শনে অনুপ্রাণিত রাজনীতিক। এরা মূলত খিলাফত সরকার ও প্রশাসনে খ্রিস্টীয় ক্রুসেডার শক্তি ও ইহুদি ফ্রি ম্যাশনের এজেন্ট হয়ে কাজ করছিলেন। প্রভাবশালী এসব কর্তা ও আমলাদের চাপের মুখে অনেকটা বাধ্য হয়েই খলীফাবর্গ তানযীমাত সংস্কার কর্মসূচি অনুমোদন করেছিলেন। তানযীমাত সংস্কার কর্মসূচির ফলে খিলাফতের অভ্যন্তরে ইউরোপীয় চিন্তা-দর্শনের যে-বন্যা বয়ে গিয়েছিল তার একটি অপপরিণতি হচ্ছে ইয়ং তুর্কস আন্দোলন। মুহাম্মদ বে ও নামিক কামালের নেতৃত্বে শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের দাবিতে এ-সংগঠন গড়ে ওঠে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং ইউরোপীয় চিন্তাধারায় উজ্জীবিত কিছু তরুণ খিলাফতে উসমানিয়াকে বিলুপ্ত করে এর মূল ভূ-খণ্ড তুর্কীতে ইউরোপীয় ধাঁচের একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী তুরস্ক প্রতিষ্ঠাই ছিল এদের লক্ষ্য।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আবদুল আযীয ইউরোপ সফরে গিয়ে বুঝতে পারেন যে, ইউরোপী খ্রিস্টান শক্তি কখনও মু সলমানদের বন্ধু হতে পারে না। সকল খ্রিস্টান শক্তি খিলাফতে উসমানিয়া ও ইসলামী শক্তির ধ্বংসসাধনে ঐক্যবদ্ধ। তিনি সংস্কার অব্যাহত রাখলেও সাংবিধানিক সংস্কারের দাবিতে ইয়াং তুর্কসের অপতৎপরতা মোটেও মেনে নিতে পারেননি। তিনি তাদের প্রতি দমননীতি অবলম্বন করেন। তার কঠোর নীতির ফলে ইয়াং তুর্কস বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তারা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে গিয়ে তাদের অনুকূলে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। এ-সময় ইয়াং তুর্কস মিদহাত পাশার নেতৃত্বে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মিদহাত পাশা একজন সংগঠক ছিলেন। তাকে ইয়াং তুর্কসের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়।

খলীফা আবদুল আযীযের হত্যাকাণ্ডে মিদহাত পাশা ও তার অনুচরদের হাত ছিল বলে অনেক শক্তিশালী প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩৩. খলীফা পঞ্চম মুরাদ

(সময়কাল: ১২৯৩–১২৯৩ হি./১৮৭৬–১৮৭৬ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, মুরাদ খান ইবনে আবদুল মজীদ খান (১২৫৬–১২৯৩ হি./১৮৪০–১৮৭৬ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি মাত্র ৯৩ দিনের মতো খলীফা ছিলেন। খলীফা মুরাদ মেধাবী মানুষ ছিলেন। তবে তিনি একজন গোড়া তুর্কি জাতীয়তাবাদী ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির সমর্থক ছিলেন। এমনকি তার সাথে ইহুদি ফ্রি ম্যাশন আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতারও ঘোরতর অভিযোগ রয়েছে। খলীফা মুরাদ ইয়ং তুর্কসের চিন্তা-চেতনায় প্রভাবান্বিত ছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইউরোপীয় দর্শনে তিনি প্রচণ্ড বিশ্বাসী ছিলেন। সবসময় নারী ও মদ নিয়ে পড়ে থাকতেন। মিদহাত পাশার নেতৃত্বে যখন সাংবিধানিক সংস্কারের দাবিতে দেশ-বিদেশে ইয়াং তুর্কস জনমত গঠন করছিল তখন খলীফা মুরাদ কিছুটা সুস্থ থাকলেও পরে একেবারে বদ্ধ পাগল হয়েগিয়েছিল। অতঃপর ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে শায়খুল ইসলাম হাসান খায়রুদ্দীন আফেন্দী এক ফতওয়ায় ঘোষণা করেন, যখন কোন মুসলমান বদ্ধ পাগল হয়ে যান তখন তার দ্বারা ইমামতের উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যায়। অতএব, খলীফা মুরাদ বহিস্কৃত হন এবং ওই বছরই তিনি ইন্তিকাল করেন।

৩৪. খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামীদ

(সময়কাল: ১২৯৩–১৩২৬ হি./১৮৭৬–১৯০৯ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, খাদিমুল হারামাইন আশ-শরীফাইন, গাযী, আবদুল হামীদ ইবনে আবদুল মজীদ খান (১২৫৮–১৩৩৬ হি./১৮৪২–১৯১৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের দ্বিতীয় পুত্র ও খলীফা পঞ্চম মুরাদের ছোট ভাই। তিনিআস-সুলতানুল মজলুম (মজলুম সুলতান), আস-সুলতানুল আহমর (রেড সুলতান), আল-হাকামুল কবীর ও খাদিমুল মুসলিমীন ইত্যাদি উপাধিতেও বেশ পরিচিত।

খলীফা আবদুল হামীদ একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম ছিলেন। তিনি সে-সময়ের বুযুর্গ শিক্ষকমণ্ডলীর কাছে ইলম ও আখলাকের জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। আরবি-ফারসি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল। ইতিহাস, সাহিত্য ও কবিতার আগ্রহী পাঠক ছিলেন। তিনি উসমানী তুর্কি ভাষায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন। তিনি আত্মশুদ্ধি ও চরিত্রগঠনে সুফি তরীকাও চর্চা করতেন। অস্ত্রের ব্যবহার, তরবারির খেলা ও তীর নিক্ষেপ এবং নিয়মিত শরীরচর্চা করতেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবরাখবরের প্রতি দৃষ্টি রাখতেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে।

১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে চাচা খলীফা আবদুল আযীযের সফরসঙ্গী হিসেবে ইউরোপ সফর করেছিলেন। ওই সফরে খলীফা আবদুল হামীদ ইউরোপীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, শিল্প-কারখানা, অর্থনীতিক-সামরিক উন্নতিতে অভিভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ইউরোপীয় সংস্কৃতি, রাজনীতিক আদর্শের প্রতি মোটেও আকর্ষিত হননি। বরং তিনি

ওই সফরে খিলাফতে উসমানিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপীয় ষড়যন্ত্র এবং খ্রিস্টবাদী ক্রুসেডীয় জিঘাংসার আলামত সুস্পষ্টভাবে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন। খলীফা আবদুল হামীদের শাসনকাল ছিল খিলাফতে উসমানিয়ার সবচেয়ে ঘটনাবহুল সময়।

সংবিধান ও সংসদ (১৮৭৬–১৮৭৭ খ্রি.)

মিদহাত পাশার নেতৃত্বে ইয়াং তুর্কস ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং দেশের ভেতরে সাংবিধানিক সংস্কারের দাবির অনুকূলে জনমত গঠনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। খলীফা আবদুল হামীদের শাসনামলের শুরুর দিকে তারা রাজধানীর উল্লেখযোগ্যসংখ্যক প্রভাবশালী ব্যক্তির সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে ইয়াং তুর্কসের অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে খলীফা আবদুলহামীদ অনেকটা বাধ্য হয়ে সংবিধান ঘোষণা করেন। এটি ছিল খিলাফতে উসমানিয়ার ইতিহাসে প্রথম কোনো সংবিধান। এ-সংবিধান অনুসারে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ যা উচ্চকক্ষ (সিনেট, মজলিসে আয়ান) ও নিম্নকক্ষে (চেম্বার অব ডেপুটি, মজলিসে নবাব) দু'ভাগে বিভক্ত ছিল। একই সাথে খলীফা আবদুল মজীদ উযীরে আযম হিসেবে মিদহাত পাশার নামও ঘোষণা করেন এবং সংবিধান অনুসারে সাধারণ নির্বাচনের নির্দেশ জারি করেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেল, ৭১ জন মুসলিম, ৪৪ জন খ্রিস্টান ও ৪ জন ইহুদি সংসদের নিম্ন কক্ষের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ২৬ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চকক্ষে ২১ মুসলিম, অন্যরা সকলে অমুসলিম।

এ-সাংবিধানিক সংস্কারের ফলে খিলাফতে উসমানিয়াকে ক্রমান্বয়ে একটি ইউরোপীয় ধাঁচের গণতান্ত্রিক, তুর্কি জাতী য়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করার ইয়াং তুর্কসের প্রচেষ্টা সফল হতে যাচ্ছিল। অন্যদিকে খলীফা আবদুলহামীদ এ-ধরনের খ্রিস্টীয় ও ইহুদি ফ্রি ম্যাশনের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ইউরোপ সফরের সময় থেকে সচেতন ছিলেন। তিনি পশ্চিমা গণতন্ত্র, ইউরোপীয় ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ও জাতীয়তাবাদেরও ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়। মিদহাত পাশার বিরুদ্ধে খলীফা আবদুল হামীদের চাচা খলীফা আবদুল আযীযের হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ ছিল। তিনি এ-অভিযোগ তদন্তে একটি কমিটি গঠন করে দেন। তদন্তে হত্যাকাণ্ডে তার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়, আদালতে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। তবে খলীফা আবদুল হামীদ তার সাজা কমিয়ে হিজাযে নির্বাসিত করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আবদুলহামীদ সংবিধান বাতিল ও সংসদ স্থগিত ঘোষণা করেন এবং ইয়াং তুর্কসপন্থিদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার করে দেশ থেকে বিতাড়িত করেন। অতঃপর পশ্চিমা দর্শন থেকে খিলাফতে উসমানিয়াকে নিরাপদ রাখতে ইসলামি শিক্ষার আলোকে সাম্রাজ্যে সংস্কার, ইসলামি নীতি-আদর্শ বাস্তবায়ন ও ইসলামি তাহযীব-তামাদ্দুনের প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি।

কমিটি অব ইউনিয়ন এন্ড প্রগ্রেস (১৮৮৯–১৯১৮ খ্রি.)

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সংবিধান বাতিল এবং সংসদ ভেঙে দিয়ে সাংবিধানিক সংস্কারপন্থিদের ব্যাপকভাবে গ্রেফতার ও নির্বাসিত করার পরিপ্রেক্ষিতে প্যানতুর্কিজম, খিলাফতের গণতন্ত্রকরণ এবং ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্ক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজধানী ইস্তাম্বুলে মেডিকেল ছাত্র ইবরাহীম টেমো, আবদুল্লাহ জেভদেত, ইশাক

সুকুটি ওআলী হুসাইনজাদে প্রমুখের উদ্যোগে একটি গোপন আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত হয়। এ-সময় এর নাম দেওয়া হয় কমিটি অব অটোমান ইউনিয়ন (জমিয়তে ইত্তিহাদে উসমানী)।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে বাহাউদ্দীন শাকির (১৮৭৪–১৯২২ খ্রি.) এটাকে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত করেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে এটা 'তিন পাশা'খ্যাত ইসমাইল আনোয়ার পাশা, মুহাম্মদ তালাত পাশা ও আহমদ জামাল পাশা এর নেতৃত্বে স্যালোনিকায় ইয়াং তুর্কসের সাথে জোটবদ্ধ হয়ে একটা রাজনীতিক দল হিসেবে আভির্ভূত হয়। এর নাম দেওয়া হয়, কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস (জমিয়তে ইত্তিহাদ ওয়া তুরকি)। খিলাফতে উসমানিয়ার ইতিহাসে এটাই প্রথম রাজনৈতিক দল। এ-রাজনৈতিক দলে খলীফা আবদুলহামীদের দরবার থেকে বিতাড়িত ইহুদি নেতা থওডোর হারজেল ইহুদি ফ্রি ম্যাশন আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কর্মসূচি ও ধ্যান-দর্শনে এদের সাথে ইহুদিবাদী ফ্রি ম্যাশনের অনেক জায়গায় হুবহু মিল রয়েছে।

১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের পক্ষে আনোয়ার পাশা মেসিডোনিয়ায় একটি শাসনতন্ত্র ঘোষণা করেন। মেসিডোনিয়ার থার্ড আর্মি আনোয়ার পাশার সমর্থনে আসে। খলীফা আবদুল হামীদ তাদেরকে দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। এদিকে তুর্কি জাতীয়তাবাদী, পাশ্চাত্যপন্থি ধর্মনিরপেক্ষ, আর্মেনীয় ও গ্রিকদের মতো সংখ্যালঘুদের উদ্যোগে শাসনতন্ত্রের পক্ষে বিপ্লব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ইতিহাসে এটি 'তরুণ তুরকি বিপ্লব' নামে পরিচিতি পায়। অতঃপর খলীফা আবদুল হামীদ কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের সাথে সমঝোতায় পৌঁছান। তিনি বাধ্য হয়ে শাসনতন্ত্র অনুমোদন করেন। তিনি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক প্রধান মনোনীত হন এবং কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস মনোনীত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে উযীর পরিষদ গঠিত হয়।

ইসলামি ব্যক্তিত্বগণ কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকারকে মেনে নিতে পারেননি। এ-সরকারের কার্যক্রমের মাঝে তাঁরা ইসলামের পতন দেখতে পান। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস ক্ষমতায় আসার পরও খিলাফতে উসমানিয়ার দূরবস্থা অব্যাহত থাকে। রণাঙ্গনে সৈন্যবাহিনী পরাজিত হতে থাকে। একের পর এক অঞ্চল খিলাফতের হাতছাড়া হয়। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের সমর্থিত পত্রিকাগুলো খলীফাকে আক্রমণ করে বিভিন্ন লেখা ছাপতে থাকে। খলীফার বিরুদ্ধে এ-ধরনের লেখালেখি বহু লোককে মানসিকভাবে আহত করে। খলীফার বিশ্বস্ত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি এ-সময় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান।

কমিটি সরকার প্রশাসনের পুরোনো অফিসারদেরকে চাকুরিচ্যত করে শূন্যপদে নিজেদের লোক বসাতে শুরু করে। একই নীতি অনুসরণ করা হয় সেনাবাহিনীতে। ব্যাপকহারে পদচ্যুত অফিসারগণ বিক্ষুব্ধ হয়। নবনিযুক্ত অফিসারদের অনেকেই ইসলাম সম্পর্কে বিদ্রুপাত্মক মন্তব্য করতে থাকে এবং সাধারণ সৈনিকদেরকে ধর্মীয় কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ইসলামি অনুশাসন মেনে চলার প্রতি উদাসীন ছিলেন। এতে সাধারণ লোকদের মনেও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়।

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে ইস্তাম্বুলের সৈন্যরা অফিসারদেরকে

তাদের কক্ষে তালাবদ্ধ করে ক্যান্টনমেন্টের নিয়ন্ত্রণ হাতে তুলে নেয়। তারা আয়া সোফিয়া মসজিদ ও পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণও নিয়ে নেয়। এরই মধ্যে তাদের সাথে যোগ দেয় অসংখ্য মানুষ। তারা শারীয়ার পক্ষে শ্লোগান দিতেথাকে। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সাধারণ সৈনিকদের হাতে তাদের অনেকে প্রাণ হারায়। কমিটির নেতৃবৃন্দ পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

এদিকে স্যালোনিকাতে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের মজবুত ঘাঁটি ছিল। সেনাবাহিনীও কমিটির অনুগত ছিল। কনস্টান্টিনোপলে কমিটি সরকারের পতনের খবর পেয়ে মাহমুদ শওকত পাশা এর নেতৃত্বে একদল সৈন্য রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হয়। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ২৪ এপ্রিল তারা কনস্টান্টিনোপল পৌঁছে তা দখল করে নেয়। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকার আবার ক্ষমতাসীন করে এবং মার্শাল ল জারি করে। কমিটি ছাড়া অন্য রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়। বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিকে সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন করে। এভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকার দেশে এক অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

খলীফার পক্ষে সংঘটিত সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থানের পাল্টা বিপ্লব ঘটিয়ে ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ এপ্রিল কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস খলীফা আবদুল হামীদকে পদচ্যুত করে। খলীফা আবদুল হামীদ ১৯১৮খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

৩৫. খলীফা পঞ্চম মুহাম্মদ

(সময়কাল: ১৩২৬–১৩৩৬ হি./১৯০৯–১৯১৮ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, মুহাম্মদ রাশাদ খান ইবনে আবদুল মজীদ খান (১২৫৯–১৩৩৬ হি./১৮৪৪–১৯১৮ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের তৃতীয় পুত্র এবং খলীফা পঞ্চম মুরাদ ও খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামীদের ছোট ভাই।

১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে তথাকথিত তরুণ তুরকি বিপ্লবের পর কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস ক্ষমতাগ্রহণ করে। এরপর এদের ইসলামি অনুশাসন বিরোধী মনোভাব জনগণের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়লে খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামীদের পক্ষে সেপাহী-জনতার অভ্যুত্থান ঘটে। অতঃপর এক পাল্টা অভ্যুত্থানে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস ক্ষমতাসীন হয়ে খলীফা আবদুল হামীদকে পদচ্যুত করে তাঁর ছোট ভাই খলীফা মুরাদকে ক্ষমতায় বসায়। বস্তুত এ-সময় থেকে খিলাফতে উসমানিয়া একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়, খলীফা পদবি হয়ে পড়ে একটি প্রতীকী পদে। প্রকৃতপক্ষে খলীফার কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না।

কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস নানা ধরনের ব্যক্তিদের সমন্বয় গঠিত ছিল। এর অধীকাংশ সদস্যই ছিল জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদে বিশ্বাসী। কিছুসংখ্যক নাস্তিকও এর সদস্য ছিল। এছাড়া উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য ছিলো ইহুদি-খ্রিস্টান। এ-কমিটি ক্ষমতা লাভ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠন করে। সুলতান ও খলীফা হন শাসনতান্ত্রিক প্রধান। সরকারি সকল ক্ষমতা ছিলো উযীর পরিষদের হাতে। দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠিত হয়। সকল পর্যায়ে তুর্কী ভাষায় প্রচলন বাধ্যতামূলক করা হয়। উচ্চশিক্ষার জন্য বহু তরুণকে পাঠানো হয় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। দেশে বহুসংখ্যক সেকুলার স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়। বিজ্ঞান,

সাহিত্য ও ইতিহাসবিষয়ক বহু গ্রন্থ তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। সহশিক্ষা চালু করা হয়। শরীয়া কোর্টগুলোর স্বাতন্ত্র বিলুপ্ত করা হয়।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে রাশিয়ার প্ররোচনায় সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, গ্রিস ও মন্টিনেগ্রো 'দ্যা বলকান লীগ' নামে একটি সামরিক জোট গঠন করে খিলাফতে উসমানিয়ার ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। এ-যুদ্ধকে বলা হয় প্রথম বলকান যুদ্ধ। লন্ডনচুক্তির মাধ্যমে -যুদ্ধ সাময়িকভাবে বন্ধ হয়। চুক্তি অনুযায়ী খিলাফত গ্রিসকে ক্রিট দ্বীপ ছেড়ে দিতে হয়, এতে রাজধানী কনস্টান্টিনোপল ছাড়া ইউরোপের অন্যান্য সকল অংশই খিলাফতে উসমানিয়ার হাতছাড়া হয়ে যায়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে উসমানিয়া থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এলাকাগুলোর ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে দ্যা বলকান লীগের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। এ-যুদ্ধকে বলা হয় দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকার কিছু পাওয়ার আশায় এ-যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বুখারেস্ট চুক্তির মাধ্যমে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের অবসান ঘটে। এ-যুদ্ধে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বুলগেরিয়া। আড্রিয়ানোপল ও থ্রেসের কিছু অংশ খিলাফতে উসমানিয়ার অধীনে আসে। বলকান যুদ্ধের ফলে বলকান উপদ্বীপে খ্রিস্টান শক্তিগুলোর বিস্তৃতি ঘটে। খিলাফতে উসমানিয়ার প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব আরও সংকুচিত হয়।

১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধের পর কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকারের অধীনে খিলাফতে উসমানিয়ার সর্বময় রাজনৈতিক ক্ষমতা 'তিন পাশা'খ্যাত আনোয়ার পাশা, তালাত পাশা ও আহমদ জামাল পাশার হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়। তাদের মধ্যে আনোয়ার পাশা ছিলেন সামরিক বিষয়ে জার্মানের বার্লিনে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত। তিনি জার্মান পদ্ধতির নৌবহরের অধিনায়ক ছিলেন। এ-সময় আনোয়ার পাশা সেনাবাহিনীর সংস্কারে মনোযোগ দেন। তিনি একদল জার্মান সামরিক বিশেষজ্ঞ এনে সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে সাজান। উসমানী নৌবাহিনীকে পুনর্গঠনের জন্য কাউন্ট রুবিলান্ট, অ্যাডমিরাল গ্যাম্বল ও পরবর্তীকালে এডমিরাল লিম্পসের সহযোগিতা নেন। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে আনোয়ার পাশা সরকারের মন্ত্রীসভায় যুদ্ধমন্ত্রী মনোনীত হন। আনোয়ার পাশাকে উসমানীয়-জার্মান মৈত্রীর স্থপতি বলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮ খ্রি.)

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে ২৮ জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ড বসনিয়া-হারজেগোভিনার রাজধানী সারায়েভো সফরে এসে সার্বিয়ার নিযুক্ত আততায়ীদের হাতে সস্ত্রীক নিহত হন। ফলে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সার্বিয়ার পক্ষে যুদ্ধে নামে রাশিয়া, পরে ফ্রান্স, আরও পরে ইংল্যান্ড। অবশেষে জাপান, ইতালি, চায়না ও ইউএসএ সার্বিয়ার পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। অস্ট্রিয়ার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয় জার্মানি। এ-বিশ্বযুদ্ধে গোড়ার দিকে খিলাফতে উসমানিয়া নিরপেক্ষ থাকে। কিন্তু কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের জার্মানপন্থি আনোয়ার পাশার চাপে কমিটি সরকার জার্মানির পক্ষাবলম্বন করে যুদ্ধে জড়ায়।

খলীফা, মুহাম্মদ আনোয়ার পাশার জার্মাননীতির প্রতি বিরূপ ছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে কমিটি সরকারের সিদ্ধান্তের

পর বাধ্য হয়ে তিনি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ নভেম্বর মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা দেন। এ-ঘোষণা ছিল ইতিহাসের কোনো খলীফা কর্তৃক সর্বশেষ জিহাদের ডাক। এটিই তাঁর একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কাজ হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু এ-বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি সর্বত্র পরাজিত হতে থাকে। খিলাফতে উসমানিয়ার সর্বত্র এমনকি রাজধানী কনস্টান্টিনোপলেও মিত্রশক্তির সৈন্যগণ প্রবেশ করে। এ অবস্থায় খলীফা মুহাম্মদ দখলদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করে খিলাফতে উসমানিয়ার বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা চালান। এতে তিনি দখলদার শক্তির হাতের পুতুলে পরিণত হন এবং জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। ফলে অক্ষশক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেয়া কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। অপসারিত সরকারের নেতৃবৃন্দ অনেকে বন্দী, নির্বাসিত এবং আত্মগোপনে চলে যান। অতঃপর যুদ্ধ শেষ হওয়ার ৪ মাস আগেই খলীফা মুহাম্মদ ৩ জুলাই ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন।

খলীফা ষষ্ঠ মুহাম্মদ

(সময়কাল: ১৩৩৬–১৩৪০ হি./১৯১৮–১৯২২ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, সুলতান, গাযী, ওয়াহীদুদ্দীন মুহাম্মদ খান ইবনে আবদুল মজীদ খান (১২৭৭–১৩৪৪ হি./১৮৬১–১৯২৬ খ্রি.) ছিলেন খলীফা প্রথম আবদুল মজীদের চতুর্থ পুত্র এবং খলীফা পঞ্চম মুরাদ, খলীফা দ্বিতীয় আবদুল হামীদ ও খলীফা পঞ্চম মুহাম্মদের ছোট ভাই।

শুরু থেকেই ইয়াং তুর্কস ও কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের রাজনৈতিক দর্শনের সাথে ইহুদি ফ্রি ম্যাশন আন্দোলনের একটা যুগসূত্র ছিল। এদের প্রতি ইহুদিবাদের পুরোপুরি পৃষ্ঠপোষকতাও ছিল। বস্তুত ইহুদিবাদের কুমন্ত্রে কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেসের সরকারের নেতৃবৃন্দ খিলাফতে উসমানিয়াকে অক্ষশক্তির পক্ষে বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে ছিলেন এবং এর মাধ্যমে খিলাফতে উসমানিয়ার পতন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ইঙ্গ-ব্রিটিশের প্রতি মুসলিম উম্মাহর প্রাণকেন্দ্র খিলাফতে উসমানিয়াকে ভেঙে ফেলার জন্য ইহুদিবাদের প্ররোচণা ছিল। বিশ্বযুদ্ধে অস্ট্রিয়া-জার্মানি-খিলাফতে উসমানিয়ার সম্মিলিত অক্ষশক্তি পরাজিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইহুদিবাদের দোসর ব্রিটেন তাদের দীর্ঘদিনের লালিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সক্ষম হয়।

খলীফা পঞ্চম মুহাম্মদ ভেবে নিয়েছিলেন, দখলদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতার মাধ্যেমে খিলাফতে উসমানিয়ার বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। খলীফা ওয়াহীদ উদ্দীন মুহাম্মদও সে-নীতি বজায় রাখেন। সে-অনুযায়ী ৩০ অক্টোবর ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে উসমানিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যে অস্ত্রবিরতিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যুদ্ধবিরতি চুক্তি সত্ত্বেও১৩ নভেম্বর ৪টি গ্রিক যুদ্ধজাহাজসহ বিজয়ীদের ৫৫টি জাহাজ ইস্তাম্বুলে নোঙর করে, যা ছিল চুক্তির বিপরীত। ৮ ডিসেম্বর তারা একটি সামরিক প্রশাসন চালু করে। নগরের গ্রিক, ইহুদি ও আর্মেনিয়ানরা তাদেরকে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অভিনন্দন জানায়। ফ্রেঞ্চ জেনারেল একটি সাদা ঘোড়ার পিড়ে চড়ে বিজয়ী সম্রাটের মতো ইস্তাম্বুলের রাজপথ দিয়ে ফরাসি দূতাবাসে আগমন করেন। এভাবে সাময়িক অস্ত্রবিরতিস্বাক্ষরের পর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক দখল করে নেয়।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে ফেব্রুয়ারিতে মিত্রবাহিনীর সৈন্যরা ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করে। ২৯

এপ্রিল ইতালির বাহিনী আনাতোলিয়া অবতরণ করে। ব্রিটিশরা দার্দেনিলাস ও অন্যান্য কৌশলগত এলাকা দখল করে। পূর্ব আনাতোলিয়ায় একটি কুর্দি রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করা হয়। আর্মেনিয়ানগণ দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে একটি আর্মেনিয়ান রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কৃষ্ণসাগর এলাকায় গ্রিকরা পুরানো গ্রিক রাজ্য পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গ্রিকনেতা ভেনি জিলাস ও অন্যান্য গ্রিকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল প্রাচীন কনস্টান্টিনোপলকে কেন্দ্র করে বৃহত্তর বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পুনপ্রতিষ্ঠা করা। এ-লক্ষ্যে ১৫ মে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে গ্রিকবাহিনী খিলাফতের অন্তর্গত স্মারনা দখল করে মুসলমানদের ওপর ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও লুটতরাজ চালায়।

এ-ঘটনায় আনাতোলিয়ায় মুসলিম, ধর্মনিরপেক্ষ, জাতীয়তাবাদী এমনকি ইয়াং তুর্কস সমর্থকদের মধ্যেও আক্রমণকারী দখলদারদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আগুন জ্বলে ওঠে। তারা গ্রিসের আক্রমণ থেকে স্মারনা রক্ষা করতে না পারায় খলীফা মুহাম্মদের কড়া সমালোচনা করে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এ-বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ইয়াং তুর্কসের রিফাত রউফ বে ও আলী ফুয়াদ পাশা। মুস্তাফা কামাল পাশা (১৮৮১–১৯৩৮ খ্রি.) তখন সামরিক বাহিনীর একজন অফিসার। খলীফা মুহাম্মদ তাকে সামরিক ইনস্পেক্টর জেনারেল পদে উন্নীত করে আনাতোলিয়ায় ইয়াং তুর্কসের বিদ্রোহ দমন করতে প্রেরণ। সেখানে গিয়ে মুস্তাফা কামাল পাশা বিদ্রোহীদের দলে ভিড়ে যান।

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইয়াং তুর্কস আনাতোলিয়ায় অ্যাসোসিয়েশন ফর ডিফেন্স অব রাইট ফর আনাতোলিয়া অ্যান্ড রুমেলিয়া নামে একটি দল গঠন করে। এ-দলের চেয়ারম্যান হন মুস্তাফা কামাল পাশা এবং মেম্বার ছিলেন রিফাত রউফ বে, বেকীর সামী বে, রুস্তম বে, মাজাহার বে এবং হায়দার বে। এ-দল আনাতোলিয়ার শাসনভার গ্রহণ করে এবং আংকারাতে রাজধানী স্থাপন করে কার্যক্রম শুরু করে। অবস্থার নাজুকতা উপলব্ধি করে খলীফা ষষ্ঠ মুহাম্মাদ দেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। এ-নির্বাচনে মুস্তাফা কামাল পাশার দল ডিফেন্স অব রাইট ফর আনাতোলিয়া অ্যান্ড রুমেলিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আলী রেজার নেতৃত্ব গঠিত হয় উযীর পরিষদ।

১২ জানুয়ারি ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে উযীর পরিষদের চতুর্থ ও শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উযীর পরিষদ মুস্তফা কামাল পাশার মিসাকে মিল্লী (জাতীয় চুক্তি) অনুমোদন করে। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল তুরস্ক জাতীয় স্বাধীনতার ঘোষণা। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স এ-ঘোষণা মেনে নিতে পারেনি। জেনারেল মিলানের নেতৃত্বে মিত্রশক্তিগুলোর সৈন্যগণ ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে রাজধানী ইস্তাম্বুল দখল করে। ১২ মার্চ ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশদের চাপের মুখে খলীফা মুহাম্মদ পার্লামেন্ট বাতিল করতে বাধ্য হন। এমনকি শায়খুল ইসলামের নিকট থেকে ফতওয়া আদায় করা হয় এ-মর্মে যে, জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহী এবং তাদের হত্যা করাই কর্তব্য। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তখন একটি সেনাবাহিনীও গঠন করা হয়। ইস্তাম্বুলে মার্শাল ল ঘোষণা করা হয়। ৪০ জন জাতীয়তাবাদী নেতাকে বন্দী করে মাল্টায় নির্বাসনে পাঠানো হয়।

এমন প্রেক্ষাপটে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এপ্রিলে মুস্তাফা কামাল পাশা আঙ্কারায় জাতীয়

সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন। এ-সংসদের নাম দেওয়া হয় গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। মুস্তফা কামাল পাশাহন এ-অ্যাসেম্বলির সভাপতি। এভাবে আঙ্কারা ও ইস্তাম্বুলে সমান্তরালে দুইটি সরকারের দ্বৈত শাসন কায়েম হয়। এর ফলে খিলাফতে উসমানিয়া মূলত দু'ভাগে বিভক্তি হয়। ১০ আগস্ট ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে খলীফা মুহাম্মদ মিত্রশক্তির চাপের নিকট নতি স্বীকার করে সেভার্স চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সেভার্স চুক্তি অনুযায়ী ঈজিয়ান সাগরের কয়েকটি দ্বীপ ও থ্রেস খিলাফতে উসমানিয়ার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে গ্রিসকে দেয়া হয়। মিসর, সুদান, সাইপ্রাস, ইরাক, ফিলিস্তিন ও হিজায (আরব উপদ্বীপ) ইংল্যান্ডের কর্তৃত্বাধীনে দেওয়া হয়। লেবানন, সিরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া প্রভৃতি পেল ফ্রান্স। ইস্তাম্বুল ও আলেকজান্দ্রিয়া প্রভৃতি উসমানী নৌ-বন্দরগুলো আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। খিলাফতে উসমানিয়ার বিমানবহর মিত্রশক্তির হাতে চলে যায়।

এ-অন্যায় চুক্তির পর জনবিক্ষোভ বৃদ্ধি পায় এবং জনগণ তাদের দেশকে বিদেশি আগ্রাসী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। মুস্তফা কামাল পাশা দেশের স্বাধীনতার জন্য একটি জাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে গ্রান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির প্রতি আহ্বান জানান। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে জিএনএ বাহিনী মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে জিএনএর সামরিক বাহিনী আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করে। ১৯২১ সালের ৫ আগস্ট জিএনএ মুস্তফা কামাল পাশাকে প্রধান সেনানায়ক হিসেবে নিযুক্ত করে। ২৩ আগস্ট সাকারইয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং গ্রিকরা এতে পরাজিত হয়। এ-বিজয়ের পর ১৯ সেপ্টেম্বর গ্র্যান্ড ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি মুস্তাফা কামালকে মার্শাল হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া ও গাযী উপাধিতে ভূষিত করে। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে মুস্তফা কামাল পাশা গ্রিকদের ওপর ব্যাপক আক্রমণ শুরু করেন এবং ৯ সেপ্টেম্বর গ্রিক বাহিনীকে পরাজিত করে তাদেরকে স্মারনা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

এসব সামরিক বিজয় আঙ্কারার জিএনএ সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে। কমিউনিস্ট রাশিয়া আঙ্কারা সরকারকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। ফ্রান্স এ-সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে সিলিসিয়া থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়। ইতালিও আঙ্কারা সরকারকে স্বীকৃতি দিয়ে আদালিয়া ছেড়ে দেয়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গ্রিস আঙ্কারা সরকারের সাথে মুদানিয়া চুক্তি স্বাক্ষর করে স্মারনা এবং পূর্ব থ্রেসের ওপর তার দাবি ত্যাহার করে। অতঃপর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আঙ্কারার জিএনএ সরকার এক ঘোষণায় সালতানাত বিলুপ্ত ঘোষণা করে। এ-ঘোষণার পর খলীফা মুহাম্মদ ক্ষমতা ছেড়ে ইংল্যান্ড চলে যান।

৩৬. খলীফা দ্বিতীয় আবদুল মজীদ

(সময়কাল: ১৩৪০–১৩৪২ হি./১৯২২–১৯২৪ খ্রি.)

খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন, আবদুল মজীদ খান ইবনে আবদুল আযীয খান (১২৮৪–১৩৬২ হি./১৮৬৮–১৯৪৪ খ্রি.) ছিলেন খলীফা আবদুল আযীযের চতুর্থ পুত্র। খলীফা আবদুল মজীদ মুসলিম উম্মাহর সর্বশেষ খলীফা এবং উসমানী বংশের শেষ সুলতান।

১ নভেম্বর ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে আঙ্কারার জিএনএ সরকার খলীফা আবদুল মজীদকে খলীফা ঘোষণা করে। রিফাত পাশা আঙ্কারার জিএনএ সরকারের পক্ষে ইস্তাম্বুলের

শাসনভার গ্রহণ করেন।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে আঙ্কারার জিএনএ সরকারের চাপে সেভার্স চুক্তি বাতিল করে লুজানচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ-চুক্তির ফলে ইংল্যান্ড ইস্তাম্বুল, আনাতোলিয়া ও পূর্ব থ্রেস খিলাফতে উসমানিয়ার অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে মেনে নেয়। এভাবে ইংল্যান্ড ও ইউরোপীয় শক্তিগুলো অবশিষ্টাংশ খিলাফতে উসমানিয়ার অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা মেনে নেয়।

২৩ অক্টোবর ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতে উসমানিয়াকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুস্তফা কামাল পাশা হন এর প্রেসিডেন্ট এবং ইসমত ইনুনু হন এর প্রধানমন্ত্রী। খলীফা পদ তখনও প্রতীকী পদ হিসেবে অবশিষ্ট ছিল।

অতঃপর ৩ মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে খিলাফত বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। খলীফা আবদুল মজীদ পদচ্যুত হন এবং তাঁকে সপরিবারে তুরস্ক থকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আবদুল মজীদ ইন্তিকাল করেন।

খিলাফতের বিলুপ্তি

১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে মুস্তাফা কামাল পাশা একটি আইনের মাধ্যমে খিলাফতের উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি খিলাফতে উসমানিয়াকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তুরকির রাজধানী ইস্তাম্বুল থেকে আঙ্কারা সরিয়ে আনেন।

৩ মার্চ ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সাথে একীভূত করে সেসব থেকে কুরআন পাঠ ও ধর্মী য় শিক্ষা বন্ধ করে দেন। এসবের পরিবর্তে দেশের সর্বত্র সেকুলার স্কুল-কলেজ স্থাপিত হয়। ২ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে সরকার দেশের সকল সূফি কার্যক্রম ও খানকাহসমূহ বন্ধের আদেশ জারি করে। মুস্তফা কামাল পাশা খানকাহগুলোকে জাদুঘরে রূপান্তরের আদেশ দেন। সূফিবাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রদর্শন তুরস্কে বেআইনি ঘোষিত হয়। দেশে সেকুলার পত্রপত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সেকুলার ও সমাজতান্ত্রিক বই-পুস্তক ব্যাপক হারে প্রকাশিত হয়। যুবসমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। বেহায়াপনা উলঙ্গপনা বৃদ্ধি পায়। মদখোরের সংখ্যা বাড়তেই থাকে। ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ হতে থাকে। আলেম সমাজ ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়। বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিদেরকে নানাভাবে নাজেহাল ও নির্যাতন করা হয়। মুস্তফা কামাল পাশা রিপাবলিকান পিপলস পার্টি গঠন করেন। বহুকাল পর্যন্ত এটিই ছিল তুরস্কের একমাত্র রাজনৈতিক দল।

১৯২৫ সালে মুস্তফা কামাল তুর্কিদেরকে আধুনিক ইউরোপীয় পোষাক পড়তে উৎসাহ দেন। পাগড়ি বা ফেজটুপি পরা নিষিদ্ধ করেন এবং পাগড়ি-টুপির মতো ধর্মীয় পোষাকের পরিবর্তে সরকারি চাকুরেদের জন্য আধুনিক পশ্চিমা স্যুট, নেকটাই ও হ্যাট পরিধান করা বাধ্যতামূলক করেন। সালাম পরিত্যক্ত হয়। আরবিতে আযান দেওয়া নিষিদ্ধ হয়। আরবি বর্ণমালার পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করা হয়। মুস্তফা কামাল পাশা পর্দাপ্রথার বিলোপ সাধন করেন। একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সহশিক্ষা প্রবর্তন করেন। মুস্তফা কামাল পাশা চরম ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। ১ মার্চ ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ইতালীয় দণ্ডবিধির ওপর ভিত্তি করে গঠিত তুরস্কের দণ্ডবিধি পাস হয়। কিছু ইসলামি আইন তখনও প্রচলিত ছিলো সেসব বাদ দিয়ে তিনি সুইস কোড প্রবর্তন করেন। সে-বছরের ৪ অক্টোবর শরীয়া আদালতগুলো বন্ধ করে দেন তিনি।

১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে স্টেট আর্ট অ্যান্ড স্কাল্পচার মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদিন ধরে তুরস্কে ইসলামি আদর্শের সাথে মিল রেখে ভাস্কর্যেরচর্চা খুবই কম ছিল। মুস্তফা কামাল পাশা সেলজুক ও উসমানীয় সভ্যতার পূর্বের তুর্কি সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির ওপরও জোর দেন এবং ইসলামি সংস্কৃতিচর্চার প্রতি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন। ১ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে নতুন তুর্কি বর্ণমালা চালু ও আরবি বর্ণমালার ব্যবহার বিলুপ্ত করা হয়। খিলাফতে উসমানিয়ার শাসনামলে তুর্কি ভাষার জন্য আরবি বর্ণমালা ব্যবহার করা হতো। এতে প্রচুরপরিমাণে আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার ছিল। উগ্র তুরকি জাতীয়তাবাদের মুস্তফা কামাল পাশা আরবির প্রতি অনর্থক বিদ্বেষবশত আরবি বর্ণমালা বাতিল করে ল্যাটিন বর্ণমালার প্রবর্তন করেন।

তথ্যঋণ

১. *ড. মুহাম্মদ ফরীদ বেগ আল-মাহামী, তারীখুদ দাওলাতিল আল্লিয়া আল-উসমানিয়া, দারুন নাফায়িস, বয়রুত, লেবনান (প্রথম প্রকাশ: ১৪০১ হি. = ১৯৮১ খ্রি.)*

২. *ইযযেতলু ইউসুফ বেগ আসাফ,তারীখুদ সালাতীনে বনী উসমান: মিন আওয়ালি নশআতিহিম হাত্তাল আন, মাকতাবাতু মাদবূলী, কায়রো, মিসর (প্রথম প্রকাশ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)*

৩. *ড. আবদুল হাদী মুহাম্মদ, ড. ওয়াফা মুহাম্মদ রাফআত ও আই আলী আহমদ লাবান, সাফহাতুম মিন তারীখিদ দাওলাতিল উসমানিয়া, দারুল ওয়াফা, বয়রুত, লেবনান (প্রথম প্রকাশ: ১৪১৫ হি. = ১৯৯৫ খ্রি.)*

৪. *সুলায়মান ইবনে সালিহ আল-খারাশী, কায়ফা সাকাতাত আদ-দাওলাতুল উসমানিয়া, দারুল কলম, রিয়াদ, সাউদি আরব (প্রথম প্রকাশ: ১৪২০ হি. = ২০০০ খ্রি.)*

৫. *ইবরাহীম বেগ হালীম, তারীখুদ দাওলাতিল উসমানিয়া আল-আল্লিয়া, মুওয়াসসাসাতুল কিতাব আস-সাকাফিয়া, বয়রুত, লেবানন (প্রথম প্রকাশ: ১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.)*

৬. *ড. আলী মুহাম্মদ মুহাম্মদ আস-সুল্লাবীয়্যাদ-দাওলাতুল উসমানিয়া: আওয়ামিলুন নুহূয ওয়া আসবাবুস সুকূত, দারুত তাওযীহ ওয়ান নাশরিল ইসলামিয়া, কায়রো, মিসর (প্রথম প্রকাশ: ১৪২১ হি. = ২০০১ খ্রি.)*

৭. *মুহাম্মদ যফর ইকবাল,সুলতানতে উসমানিয়া: তুরকিইউঁ কি মুফাস্সল সিয়াসী তমদ্দুনী আওর তাহযীবী তারীখ, যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর-করাচি, পাকিস্তান (প্রথম প্রকাশ: ১৪২৮ হি. = ২০০৮ খ্রি.)*

৮. *একেএম নজির আহমদ, উসমানী খিলাফতের ইতিকথা, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার,*



ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনের ইতিহাস
পতনের কারণ ও সমকালীন ভাবনা

মুহাম্মাদ আবদুর রাজ্জাক

ভারতের সঙ্গে আরবের সংযোগ

ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আরব বণিকগণ বাণিজ্যের জন্য ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোতে যাতায়াত করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি এ উপমহাদেশের আদি নাম সিন্দ ও হিন্দ পর্যন্ত আরবদের দেয়া। আরব বণিকরা মালাবার হয়ে চীনের পথে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করতেন। চট্টগ্রাম ও মেঘনা তীরের চাঁদপুর ছিল নদীবন্দর। এখান থেকে তারা চন্দন কাঠ, মসলা, উন্নতমানের কাপড় ইত্যাদি ক্রয় করে নিয়ে যেতেন। ইতিহাসে এসেছে, হযরত ঈসা আ. এর জন্মের কয়েক হাজার বছর আগেও দক্ষিণ আরবের সাবা কওমের ব্যবসায়ীরা পালতোলা জাহাজে করে এদেশে আসত। ওই সাবা কওমের নামানুসারে নামকরণকৃত শহর সাবাউর (উর অর্থ শহর)অর্থাৎ সাবাদের শহর। যা আজও ঢাকার অদূরে সাভার নামে পরিচিত হয়ে এদেশে সাবা কওমের আগমন স্মৃতি বহন করছে। এছাড়া বাররুল হিন্দ (ইন্ডিয়ার ভূখণ্ড) বা বরেন্দ্র ভূমির কথা তো সর্বজনবিদিত। ঈসায়ী ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রথম ইতিহাস লিখেন মাওলানা মিনহাজুদ্দীন সিরাজ। তিনি উত্তর বাংলাদেশকে 'বাররিন্দ' বলে উল্লেখ করেছেন। যা পরে 'বরেন্দ্র' নামে পরিচিত হয়েছে। এ অঞ্চলকে 'বাররিন্দ' বলার কারণ ছিলো এই যে, আরবরা বিশাল সাগর-মহাসাগর পাড়ি দিয়ে জাহাজে ভেসে ভেসে বহুদিন পর বঙ্গদেশে তদানীন্তন হিন্দের মাটি বা স্থল দেখে অনন্দে নেচে উঠে চিৎকার করে বলল, 'বাররি হিন্দ' অর্থাৎ হিন্দের মাটি। যা পরবর্তীকালে বাররিন্দ বা বরেন্দ্রতে পরিবর্তিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইরানের সম্রাট সাইরাস (যুলকারনাইন) উপমহাদেশে আর্যদের অন্যতম রাজ্য গান্ধারা জয় করেন। এ সময় তার তাওহীদি জীবন দর্শনের ছটা এ অঞ্চলব্যাপী পরিবাহিত হয়েছিল। যার পরোক্ষ প্রভাব পরবর্তীকালে সংঘটিত ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিল বলে ধারণা করা হয়।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মের ক্রম বিকাশ

আর্যরা ইরান থেকে এসে বসতি গড়ে তুলেছিলো ভারতবর্ষের মাটিতে। আর্য হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিলো তখন এ অঞ্চলে। তবে যে আদর্শের ওপর হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন হয়েছিলো, তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হতে থাকে। এক সময় শ্রেণিবৈষম্যের নির্মম যাতাকলে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সুযোগ পেয়ে বৌদ্ধরা সাম্যের বাণী দিয়ে জনগণকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে বৌদ্ধরাই রাজ্য ক্ষমতা দখল করে নেয়। ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মাঝে দীর্ঘ সাম্প্রদায়িক বিরোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কালক্রমে বৌদ্ধরা কৃচ্ছতার মহৎ শিক্ষা থেকে দূরে সরে পড়ে এবং এ ধর্মের অনুসারীরা স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। এ কারণে বৌদ্ধধর্ম নিজ আবেদন হারিয়ে ফেলে। এবার হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা ঘুরে দাঁড়ায় এবং নেতিয়ে পড়া হিন্দুধর্মের সংস্কার করে পুনরায় ব্রাহ্মণ্যবাদের গোড়াপত্তন করে। এমনকি তারা বৌদ্ধদের থেকে হৃত ক্ষমতা ছিনিয়ে আনতেও সক্ষম হয়। কিন্তু বাহ্মণ্যবাদীরাও এক সময় আদর্শহারা হয়ে যায়। ধর্মকে পুঁজি করে ব্রাহ্মণরা জনগণের ওপর নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালাতে থাকে। তারা জনগণের প্রতিবাদের ভাষাও কেড়ে নেয়। প্রতিবাদ করলে অভিশাপ দিয়ে স্ব-মূলে ধ্বংস করে দেয়ার ভয় দেখিয়ে মানুষের সর্বস্ব লুটিয়ে নেয়। এরপর আসলো যোগীবাদ। যোগীবাদ আত্মপীড়ন ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণের দীক্ষা, কৃচ্ছ সাধনার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে সুখময় সমাজ গড়ে তোলার শ্লোগান নিয়ে আসলো । তাদের বিশ্বাস ছিলো নারী স্পর্শ মহাপাপ। এজন্য তারা নিজেদেরকে নারীদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখলো। কিন্তু এ কৃচ্ছতার ধর্ম বেশি দিন টিকলো না। কারণ এটা প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ। মানবীয় স্বভাবের তাড়নায় তারা কৃচ্ছতা ভঙ্গ করতে বাধ্য হলো। এভাবে যোগীবাদও মোহনীয় শ্লোগানের আবেদন হারাতে বাধ্য হলো। তখন হিন্দু, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও যোগীবাদের অনুসারীদের পরস্পর বিরোধীতার ফলে গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়লো শ্রেণীবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক আত্মকলহ। যে কারণে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো । উপমহাদেশের মানুষের আদর্শিক জীবনে নেমে আসলো এক চরম হতাশা ও অস্থিরতা। ঠিক এহেন পরিস্থিতিতে শ্বাশ্বত শান্তির বার্তাবাহী ইসলামের আগমন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো।

ভারতে ইসলাম

ঐতিহাসিকদের মতে উপর্যুক্ত প্রেক্ষিতে ইসলামের শুরুর দিকেই আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই এ উপমহাদেশে প্রথম ইসলামের আগমন ঘটে। বাণিজ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলোতে সর্বাগ্রে তারা আগমন করে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, ঢাকার উপকূলীয় অঞ্চল, রংপুর এবং ভারতের দক্ষিণাত্যের এলাকাসমূহে মুলতান, আহমদাবাদ, পাঞ্জাব ও সিন্দুতে এবং সিন্দুর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে যথা দেবল, মানসূরাহ, খোজ্জদার এলাকায় ব্যাপকভাবে তারা দাওয়াতী কার্যক্রম চালায়। লোকজন তাদের দাওয়াতে ইসলামে দীক্ষিত হতে থাকে।

যতদূর জানা যায়, ভারত থেকে কতেক লোক মদীনায় গিয়ে রাসূল সা. এর সংস্পর্শ

লাভেও ধন্য হন। তাদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায়, বাবা রতন আল-হিন্দ অথবা রতন আবদুল্লাহ আল-হিন্দ মদিনায় গিয়ে রাসূল সা. এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে সাহাবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন বলে জানা যায়। শুধু তাই নয়, মালাবারের অনুগত চেরদেশের রাজা চেরম রাসূল সা. এর কাছে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলেও জানা যায়। পরবর্তীতে বহু সূফী-দরবেশ ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। তাদের উত্তম চরিত্র, সৌহার্দপূর্ণ আচার-ব্যবহার, স্বচ্ছ লেন-দেন, তাকওয়া, পরহেযগারী দেখে লোকজন ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং ব্যাপকভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়।

হযরত উমর রা. কর্তৃক পারস্য বিজয়ের পর উপমহাদেশীয় অঞ্চলসমূহকে খিলাফতভূক্ত করার প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়। হযরত উমর রা. কর্তৃক নিযুক্ত বাহরাইন ও ওমানের শাসনকর্তা প্রখ্যাত সাহাবী হযরত উসমান বিন আবদুল আস-সাকাফী রা. স্বীয় ভ্রাতা আল-হাকামকে সিন্ধুর বরুচ অঞ্চলে এবং অপর ভ্রাতা মুগীরা বিন আবুল আসকে দেবল অভিযানে প্রেরণ করলে তারা তথাস্থ ক্ষমতাসীনকে পরাজিত করে ভারতের সীমানায় প্রথম ইসলামের বিজয় কেতন উড্ডীন করেন। এসময়ে আগত সাহাবীদের মাঝে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন-আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ ওতবান, আশ-ইয়াম বিন আমর তামীমী, সোহার বিন আল আবদী, সুহাইল বিন আদি প্রমূখ।

হযরত উসমান রা. এর শাসনামলেও ভারতবর্ষে সিন্ধুনদসহ সিন্ধু অঞ্চলের বহু এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ইসলামের ছায়াতলে আনতে সক্ষম হন।

হযরত আলী রা. এর খিলাফতকালে সিন্ধুর উত্তর পশ্চিমাঞ্চল মুসলিম সাম্রাজ্যভূক্ত হয়েছিলো। হযরত মুআবিয়া রা. এর যুগে প্রথমে আবদুল্লাহ বিন সাওয়ার আবদীর নেতৃত্বে অতঃপর সিনান বিন সালমাহ হুযাইলীর নেতৃত্বে ভারত সীমান্তে আক্রমণ চালানো হয়। ৪৪ হিজরীতে প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ বিন আবু সুফরাহ ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে পাঞ্জাবের লাহোর ও বান্না এলাকা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু মুআবিয়া রা. এর পরবর্তীকালে মুসলমানদের ঘরোয়া সমস্যার কারণে তারা ভারতবর্ষের প্রতি মনযোগ দিতে পারেননি।

বাংলাদেশে ইসলাম

নবীযুগেই বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ঘটে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. এর জীবদ্দশায় তাঁর চাচাত মামা হজরত আবু ওয়াক্কাস উহাইদ বিন মালেকসহ ৪ জন সাহাবা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মিয়ানমারের আরাকান এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা এখান থেকে চীন পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করেছিলেন। চীনের ক্যান্টন সমুদ্রতীরে অবস্থিত সাহাবী আবু ওয়াক্কাস মালিক বিন ওহাইবের মসজিদ ও কবর সে সাক্ষ্যই দেয়। অষ্টম-নবম শতাব্দীতে সন্দ্বীপ, রামুসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বণিক ও মুবাল্লিগরা ইসলাম প্রচার করেছিলেন বলে ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন আরব লেখকদের বর্ণনায় সামরূপ (কামরূপ-আসাম) ও রাহমি রাজ্যের কথা এসেছে, যা ৮ম-১২শ শতাব্দীর পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। রাজশাহী পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার ও কুমিল্লার

ময়নামতিতে প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সম্প্রতি লালমণিরহাটে (সদর উপজেলার পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের মজদের আড়া গ্রামে) ৬৯ হিজরীতে নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। রংপুরে ২০০ হিজরীর মুসলিম সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। উপকূলীয় চট্টগ্রাম ও নোয়াখালীর বিভিন্ন স্থানের নাম ও ভাষায় আরবী অপভ্রংশের প্রচুর উপস্থিতি এসব নিদর্শনকে আরও সপ্রমাণিত করে। ইসলাম প্রচারের কাজে এদেশে প্রচুর সংখ্যক আরবি, ইরানি ও তুর্কি মুসলমান ও সুফি দরবেশের আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা ব্যাপকভাবে এদেশে বসতি স্থাপন করেন। তাদের বংশবৃদ্ধির মাধ্যমেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়। সুতরাং এ কথা পরিস্কারভাবে বলা যায় যে, এদেশের মুসলমানরা সবাই ঢালাওভাবে হিন্দু বংশধর নয়। হিন্দুদের মধ্য থেকে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তাদেরও অনেকেই ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য। অন্যদিকে, আরবরা এদেশে এসেছেন ব্যবসায়ী হিসেবে। আর সে সময় ব্যবসায়ী অর্থাৎ সওদাগররা ছিলেন সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি। চট্টগ্রামে ঐ সময় একটি মুসলিম রাজ্যও স্থাপিত হয়েছিলো বলে অনুমান করা হয়।

সুতরাং বলা যায় যে, হিজরী প্রথম দিকেই বাংলায় ইসলামের আগমন ঘটেছিল। তবে ঐ সময় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে এতদঞ্চলে যারা আগমন করেন তাদের বিস্তারিত বর্ণনার ক্ষেত্রে ইতিহাস নিরব। পরবর্তীকালে আগতদের মাত্র কয়েকজনের নাম জানা যায়, যারা মূলতঃ মধ্যএশিয়া ও পারস্য থেকে এ দেশে আগমন করেন। শাহ মুহাম্মাদ সুলতান বলখী (১০৪৭ খ্রি.-বগুড়ার মহাস্থান), শাহ মুহাম্মাদ সুলতান রূমী (১০৫৩ খ্রি.- নেত্রকোণা), বাবা আদম শহীদ (১১১৯ খ্রি.-মুন্সীগঞ্জ), শাহ মখদুম রুপোশ (১২৮৯ খ্রি.-রাজশাহী), শাহ নিয়ামত উল্লাহ বুতশিকন (১১২০ খ্রি. ঢাকা), জালালুদ্দীন তাবরীযী (১২০৫ খ্রি.), তাকীউদ্দীন আল-আরাবী (১২৫০ খ্রি.-ধামুরাইরহাট, নওগাঁ), শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (১৩০০ খ্রি.- সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ), শাহজালাল (১৩০৩-সিলেট) প্রমুখ মুবাল্লিগের নাম ইতিহাসে এসেছে যাদের দাওয়াতী তৎপরতায় বর্ণবৈষম্যে অত্যাচারিত ও শাসক নিপীড়নে বিপর্যস্ত হিন্দু ও বৌদ্ধরা ব্যাপকহারে দলে দলে ইসলামের শান্তি ও ন্যায়বার্তা গ্রহণ করেছিলো। শুধু তাই নয়, এ সময় অনেক শাসক ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্যাপক সহযোগিতা করেন। ১২০৩ সালে কুতুবুদ্দীন আইবেক এর সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বাংলা অঞ্চলে সর্বপ্রথম মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক শাসক ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করে মুবাল্লিগদের বিতাড়িত করার জন্য অস্ত্রধারণ করে। অনেক মুবাল্লিগ এ সময় তাদের হাতে প্রাণ হারান, যাদের মধ্যে বাবা আদম শহীদের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় মুবাল্লিগ ও নওমুসলিমরাও সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলে এসব রাজাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৩০৩ সালে বিখ্যাত শাহজালাল ইয়ামানী রহ. ৩৬০ জন সঙ্গীসহ রণপ্রস্তুতি নিয়েই দিল্লি থেকে সিলেটে আগমন করেছিলেন এবং অত্যাচারী রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করেন। তাঁর উন্নত চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলার হাজার হাজার হিন্দু-বৌদ্ধ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো।

উমাইয়া শাসনামলে ভারতবর্ষে মুসলিম কর্তৃত্ব

অভিযান প্রেরণ ঃ উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালীদের শাসনামলে সর্বপ্রথম অভিযান প্রেরণ করা হয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ সেই অভিযান প্রেরণ করেন। তখন হাজ্জাজ ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশসমূহের গভর্নর। হাজ্জাজ মোট তিনটি অভিযান প্রেরণ করেন। পর পর দুটি অভিযান উবায়দুল্লাহ বুদাইলের নেতৃত্বে। তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন, স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা, সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ সেনাপতি, মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে।

অভিযান প্রেরণের কারণ

প্রথমত- পারস্যের যুদ্ধে হাজ্জাজ যখন শত্রুদের সঙ্গে বাঁচা-মরার লড়াইয়ে প্রাণপণ লড়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাজা দাহির শত্রুপক্ষকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

wØZxqZ- হাজ্জাজের শাসনাধীন এলাকার কতিপয় যুবক বিদ্রোহ করে ভারতের সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশ করে। রাজা দাহির তাদেরকে আশ্রয় দেয়। হাজ্জাজ বিদ্রোহী পলাতকদের প্রত্যার্পণের দাবি জানিয়ে রাজা দাহিরের নিকট পত্র পাঠিয়ে ছিলেন। কিন্তু রাজা দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন।

ZZxqZ- যেসব আরব বণিক সিংহলে মারা যায় তাদের পরিজনকে স্বদেশে পাঠাবার জন্য সিংহলের রাজা সু-ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং হাজ্জাজের জন্য বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ আটটি জাহাজ প্রেরণ করেন। সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দর দাইবুলের নিকট তথাস্থ জলদস্যুরা জাহাজগুলো লুণ্ঠন করে এবং আরোহী যাত্রীদের ওপর নির্যাতন করতঃ বন্ধী করে। বন্দীদের মুক্তি ও তৎসহ লুণ্ঠিত সকল সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া এবং জলদস্যুদের শায়েস্তা করার জন্য হাজ্জাজ রাজা দাহিরকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র পাঠান। কিন্তু রাজা দাহির এতে অস্বীকৃতি জানান।

PZ_Z- জাহাজ ভর্তি ইরাকী মুসলিম রমণীদের গণহারে ধর্ষণ করে তাদেরকে হত্যা করে, ফলে হাজ্জাজ রাজা দাহিরের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে।

cÂgZ- হাজ্জাজ পরপর দুটি অভিযানে ব্যর্থ হয়ছিলেন। পরাজিত মুসলিম বন্ধিদেরকে নির্মমভাবে ভারতীয়রা হত্যা করে। এসব কারণে রাজা দাহিরের দৃষ্টতার সমুচিত শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

মুহাম্মদ বিন কাসিম ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন ছয় হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উষ্ট্র বাহিনী সঙ্গে নিয়ে। পথে সাহায্য হিসেবে পেয়ে যান মারকানের অধিপতির পক্ষ থেকে আরও এক দল সৈন্য। এছাড়া হিন্দু শাসকদের দুঃশাসনে অতিষ্ঠ ও বিক্ষুব্ধ জাঠ ও মেঠদেরকেও তিনি তার সহযোগী হিসেবে পেয়ে যান। ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী এ কাফেলা ৭১১-৭১২ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময়ে দুবাইন বন্দরে এসে পৌঁছেন। সেখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে তুমুল লড়াই হয়। লড়াইয়ে মুসলমানরা বিজয়ের গৌরব অর্জন করেন। অতঃপর মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযান অবিরাম চলতে থাকে। তিনি পর্যায়ক্রমে হায়দারাবাদের নিকটস্থ নিরুননগরী, সিওয়ান ও সিসাম এলাকাসমূহ আয়ত্বে নিয়ে আসেন। হিন্দুরাও প্রাণপণে লড়াই করেছিলো তবে তারা পরাজিত হয় এবং রাজা দাহির নিহত হয়।

রাজা দাহিরের স্ত্রী-পুত্ররা রাওয়ার নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আগুনে আত্মহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়। মুহাম্মদ বিন কাসিম বাহ্মণ্যবাদ, আলোর, মুলতানসহ রাজা দাহিরের সমগ্র রাজ্য দখল করে নেন। মুসলমানদের দৃঢ় ঈমান ও মহান আল্লাহর ওপর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাস, উন্নত চরিত্র, নৈতিকতা, সুষ্ঠু পরিচালনা, আক্রমণ কৌশল ও রণদক্ষতা দেখে হিন্দু শাসক কর্তৃক নির্যাতিত-নিপীড়িত জনতা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

কিন্তু মুসলমানদের এ বিজয় বেশি দিন টেকেনি। পরাজয়ের গ্লানি বহন করতে হয়েছিলো মুসলিম বাহিনীকে। মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত অনেক এলাকাই হস্তচ্যুত হয়ে যায়।

বিজয়ের পর পরাজয় কেন?

ঠিক এমন এক সময় দামেস্কের শাসন ক্ষমতায় রদবদল হয় যখন মুহাম্মদ বিন কাসিম মুলতান বিজয়ের পর কনৌজ দখলের অভিপ্রায়ে সৈন্য প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এমনকি সেনাপতি আবু হাকিমের নেতৃত্বে দশ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী প্রেরণের আয়োজনও করেন। নবনির্বাচিত উমাইয়া খলীফা সুলায়মান সিংহাসনে বসেই মুহাম্মদ বিন কাসিমকে তলব করে দামেস্কে নিয়ে যায় এবং কারাগারে নিক্ষেপ করে। সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মুহাম্মদ বিন কাসিমের মৃত্যুর পর খলীফা সুলায়মান ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাবকে সিন্ধু দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

এখানে গোত্রীয় প্রতিহিংসা বশতঃ যোগ্য ও আদর্শিক নেতৃত্বকে অবমূল্যায়ন করে তার প্রতি জুলুম করার কারণেই মুসলিম বাহিনী বিজয়ের পর পরাজয়ের গ্লানি বরণ করতে বাধ্য হয়।

পুনরায় ঘুরে দাঁড়ানো

ইয়াযিদ বিন মুহাল্লাব অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। অতঃপর তার ভাই হাবীব শাসন ক্ষমতায় আসেন। তারপর (৭২৪ খ্রিস্টাব্দে) অত্যন্ত বীরদর্পী শাসক জুনায়েদ, হাবীবের স্থলে শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। জুনায়েদ রাজ্য সম্প্রসারণনীতি গ্রহণ করার মাধ্যমে মুহাম্মদ বিন কাসিমের বিজিত এলাকা পুনরুদ্ধার করেন। এমনকি ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের অনেক এলাকা জয় করেন এবং বিপুল জনসমর্থন লাভ করেন।

আবার পরাজয়বরণ ও তার কারণ

জুনায়েদের মৃত্যু হয়ে যায়। তখন আরবের শাসনকর্তা ছিলেন তানিম। জুনায়েদের উত্তরাধিকারীরা ছিলো দুর্বল। তানিমের শাসনকালে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দেই মুলতান ব্যতিত ভারতের সমগ্র এলাকা মুসলমানদেরকে হারাতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং সিন্ধুর এই অঞ্চল তখন কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনতা মুক্ত হয়ে অনেকগুলো ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। আবার পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজন্যবর্গের চাপের মুখে হিজরী তৃতীয় শতকে এ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোও বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে শিয়া মতাবলম্বী বাতেনিয়্যাহ সম্প্রদায়ের লোকদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে দীর্ঘ দিনের জন্য

ভারতীয় অঞ্চলের সাথে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর এ পরাজয় ও ব্যর্থতার একমাত্র কারণ মুসলিম নেতৃত্বের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা।

রাজনৈতিক পরাজয় ও সুলতান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণপূর্ব প্রেক্ষাপট

হিজরী তৃতীয় শতকে মুসলমানরা ভারতবর্ষে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হবার পর হিজরী পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে সুলতান মাহমুদ গজনভীর আক্রমণের আগ পর্যন্ত, আরব ও ভারতে মুসলমানরা পারস্পরিক গমনাগমনের মাধ্যমে দীনি শিক্ষা ও দীন বিস্তারের কাজ চালিয়ে যান।

ভারতে নও মুসলিমরা আরবীয় অঞ্চলে গিয়ে দীন শেখায় ব্রত হন। আর আরবীয় অঞ্চলের লোকেরা এ দেশে অবস্থান করে স্ব-ধর্ম ইসলামের প্রচার ও ইসলামী শিক্ষা, সাংস্কৃতির বিস্তারে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

এ সময় অনেক তাবেঈ ভারতবর্ষে এসেছিল এবং বহু ভারতীয় মুসলমান সাহাবীদের সান্নিধ্য লাভ করে তাবেঈ হবার গৌরব অর্জন করেন। প্রথম দিককার অভিযানগুলো যদিও রাজনৈতিকভাবে কোন দীর্ঘস্থায়ী সুফল বয়ে আনতে পারেনি। তবুও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এ সব অভিযানকে কেন্দ্র করে বহু সাহাবী ও তাবেঈ এ দেশে স্থায়ীভাবে বসতী স্থাপন করেন এবং এ সব সাহাবী ও তাবেঈদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় অনেক মানুষ মুসলমান হয়ে মক্কা মদীনায় গমন করে তাবে-তাবেঈনের গৌরব অর্জন করেন। আবার কেউ কেউ আরবে বসতীও স্থাপন করেন। তাদের মাঝে মাশার নজীহ সিন্ধির নাম উল্লেখযোগ্য।

আব্বাসীয় খলিফাদের আমলে মুসলমানদের ভারত শাসন

উমাইয়া খিলাফতের পতন ঘটে ৭৫০ খ্রিস্টাব্দে। অতঃপর আব্বাসীয় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭৫৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আব্বাসীয় খলীফাগণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে সিন্ধু দেশে শাসনকর্তা নিয়োগ করতেন।

কেন্দ্রের পক্ষ থেকে খলীফা মানসুরের শাসনামল থেকে শুরু করে খলীফা মামুনের শাসনামল পর্যন্ত এ দেশে শাসনকর্তা নিয়োগ করা হতো।

৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সময় সিন্ধু দেশীয় শাসনকর্তা কেন্দ্রীয় খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহে সে সফল হতে পারেনি। যে কারণে তার স্থলে ইয়াহইয়া বিন খালিদ বার্মাকী শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ইয়াহইয়া স্বীয় পুত্র আরমানকে শাসন ক্ষমতা দানের মাধ্যমে শাসনকর্তার পদকে বংশানুক্রমিক করে যান।

আধিপত্যহারা হবার কারণ

শাসনকর্তা আরমানের পর আরব্য আধিপত্যের সুস্পষ্ট কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ৭৮১ সালে এদেশে মুসলমানগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মুলতান ও মনসুরায় পৃথক পৃথক দুটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। যার ফলে হিন্দুগণও শাসনকার্যে ভাগ বসায়। এ কারণে অনেক এলাকা পুনরায় হিন্দু শাসকদের হাতে চলে যায় এবং খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্র আত্মপ্রকাশ করে।

আব্বাসীয় খলিফাদের পতন ও আধিপত্য হারা হবার কারণ হলো, তারা শেষ সময়ে

আরামপ্রিয় হয়ে ওঠেন। যে কারণে তাদের তুর্কী দেহরক্ষীগণ ক্রমেই তাদের ওপর প্রবল হয়ে ওঠে এবং খলিফাদেরকে খেলার বস্তু জ্ঞান করতে থাকে।

গজনী বংশের ভারত শাসন

৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলাপতিগীণ গজনীতে উপস্থিত হন এবং সেখানকার শাসনকর্তা আবু বকর লাইককে পরাজিত করে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। সে সময় থেকেই গজনী বংশের শাসন কালের সূচনা হয়। আলাপতিগীন সাসানি বংশের পঞ্চম রাজা আব্দুল মালিকের কৃতদাস ছিলেন। ইতোপূর্বে আলাপতিগীন তার প্রভুর আনুগত্যের মাধ্যমে খোরাসানের শাসনকর্তার পদে উন্নীত হয়েছিলেন। তিনি ১৪ বছর পর স্বীয় সন্তান আবু ইসহাকের হাতে শাসনভার অর্পণ করে ইন্তেকাল করেন। আবু ইসহাক খুব অল্প সময় শাসনকার্যের দায়িত্ব পালন করেন। ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে পীরাই সিংহাসনে সমাসীন হন। কিন্তু পীরাই শাসনকার্য জনগণের মনঃপুত হয়নি। একারণে জনগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। জনগণ ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতায় বসান আলাপতিগীনের কৃতদাস সুবক্তগীনকে।

গজনী বংশের সর্বপ্রথম অধিকার

আলাপতিগীনের কৃতদাস সুবক্তগীন ক্ষমতায় থাকাকালীন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম এলাকায় হিন্দুরাজ জয়পাল রাজত্ব করতেন।

৯৭৯ সালে সুবক্তগীন শক্তিশালী এক বাহিনী নিয়ে অভিযান শুরু করেন এবং ঘুজাত নামক স্থানে জয়পাল বাহিনীর মুখোমুখি হন। জয়পাল পরাজিত হয়ে সন্ধি চুক্তি করতে বাধ্য হন।

কিন্তু পরে চুক্তি ভঙ্গ করে এবং মুসলিম বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। আর এ লক্ষ্যে আশে পাশের হিন্দু রাজাদের সহযোগীতা নিয়ে সম্মিলিত বাহিনী গড়ে তোলে। ৯৯১ সালে এই সম্মিলিত বাহিনীও সুবক্তগীনের কাছে পরাজিত হয়। যার ফলে লাখবান ও পেশোয়ার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলোও গজনীর অধিকারে চলে আসে। বলতে গেলে এটাই গজনী বংশের সর্বপ্রথম ভারত অধিকার।

সুলতান মাহমুদ গজনভীর ভারত অভিযান

সুলতান মাহমুদ গজনভী ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ভারতবর্ষে সর্বমোট ১৭ বার অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি ছিলেন সুবক্তগীনের কনিষ্টতম পুত্র। সুলতান মাহমুদের বারংবার ভারত আক্রমণের ফলে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গজনী শাসনের অধিকারে আসে। সুলতান মাহমুদের বাহিনীতে শুধু ১৬৭০ টি প্রশিক্ষিত হাতি ছিলো। যার প্রমাণ বায়হাকীর লেখা 'তারিখে বায়হাকী'র ৩৪৯ পাতায় রয়েছে। তাঁর সময় সার্কাসের ঘোড়ার মত সুদক্ষ ট্রেনিং প্রাপ্ত ঘোড়া ছিলো এক লাখ বিশ হাজার। সুলতান মাহমুদ ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করতেন। তাঁর বিশেষ কয়েকটি গুণ হলো-

(ক) সুলতান মাহমুদের গঠনমূলক প্রতিভা ছিলো অধিক। (খ) তার রাজ্য বিস্তৃত ছিলো দু'হাজার মাইল লম্বা পূর্ব-পশ্চিমে আর উত্তর-দক্ষিণে চৌদ্দশত মাইল। (গ) তাঁর রাজ্যে প্রত্যেকে সুখ ও শান্তির ছায়ায় আরামে থাকতো। (ঘ) সেই যুগে মাহমুদের মত এত ভালো রাজা আর কেউই ছিলো না।

কেমব্রিজ হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়ার দ্বিতীয় খণ্ডের ৫৭৪ পাতায় স্যার জন মার্শাল লিখেছেন "মহামতি মাহমুদ তাঁর অব্যবহিত পরবর্তী সুলতানদের আমলে স্থাপত্যের আড়ম্বরে গজনী খিলাফতের সমস্ত নগরের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে দাঁড়ায়"। মিস্টার কেনী বলেছেন, মাহমুদ যেমন বিরাট রাজ্য জয় করেছেন তেমনি বিজ্ঞতার সঙ্গে সুশাসন করতেও সক্ষম হয়েছেন"।

গজনী শাসনের পতন

সুলতান মাহমুদের পর একমাত্র পাঞ্জাব ব্যতিত অন্য সব এলাকাই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো এবং সেসব এলাকায় হিন্দু শাসকরা ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠেছিলো। মাহমুদের পর দীর্ঘ একশত পঞ্চাশ বছর যাবৎ তার উত্তরাধিকারীগণ গজনীতে রাজত্ব করলেও তাদের মাঝে কেউই উল্লেখযোগ্য ছিলো না। তারা ক্ষমতা নিয়ে কলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে তাদের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে।

এখানেও পতনের মূল কারণ আত্মকলহের প্রবণতা এবং যোগ্যতার অভাব।

ঘুর বংশের ভারত শাসন

সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী ১১৭৩ খ্রিস্টাব্দে গজনী বংশের শেখ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত করে গজনী ক্ষমতা দখল করেন। এর মাধ্যমে গজনী শাসনের পতনও ঘটে। গজনী অধিকার করার পর পরই মুহাম্মদ ঘুরী ভারত অভিযানে মনোনিবেশ করেন। অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তিনি দিল্লি, আজমীর, সিন্ধু, কনৌজ, গুজরাট, বিহার ও বাংলা অধিকার করেন। তবে ভারত অভিযানে কুতুবুদ্দীন আইবেকের সাহসিকতা মুখ্য ভূমিকা রেখেছিলো। আর কুতুবুদ্দীন ছিলেন মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতদাস ও সেনাপতি।

ঘুর বংশের পতন

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে খোখার বংশীয় জনৈক ব্যক্তির হাতে মুহাম্মদ ঘুরী অত্যন্ত নির্মমভাবে নিহত হন। অতঃপর তারই ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঘুরী শাসনের পতনের কারণ হলো, মাহমুদের উত্তরাধীকারীগণের ক্ষমতা নিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করা। মাহমুদের উত্তরাধীকারীদের গোলযোগ দেখে খাওয়ারিজমের শাহ ঘুর রাজ্যে আক্রমণ করে তা দখল করে নেয়।

দিল্লীর প্রথম সুলতান

ঐতিহাসিকদের ধারণা মতে কুতুবুদ্দীন আইবেক হলেন দিল্লীর প্রথম শাসক। মুহাম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর বছরই কুতুবুদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশ ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তিনি চার বছর দিল্লীর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। কুতুবুদ্দীন মারা যান ১২১০ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তিনি চৌগান বা পলো খেলতে গিয়ে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা যান।

কুতুবুদ্দীনের রাজ বংশকে দাস বংশ বলার কারণ

কুতুবুদ্দীন আইবেক যেহেতু সুলতান মুহাম্মদ ঘুরীর কৃতদাসরূপে জীবন শুরু করেছিলেন তাই তার প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশকে কোন কোন ঐতিহাসিক দাস বংশ নামেও আখ্যা দিয়েছেন।

দিল্লীর মসনদে তুর্কী বংশের দীর্ঘস্থায়ী সম্রাট

দিল্লীর মসনদে তুর্কী বংশের দীর্ঘমেয়াদী শাসক ছিলেন সুলতান ইলতুৎমিশ। তিনি ছিলেন কুতুবুদ্দীন আইবেকের জামাতা ও বাদায়ুনের শাসনকর্তা। ইলতুৎমিশ ১২১১ সালে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রায় ২৫ বছর দিল্লীর সিংহাসনের অধিপতি ছিলেন। দীর্ঘ এ শাসনকালে তিনি অনেক এলাকা অধিকার করেন।

ন্যায় পরায়ণতা ও উদারতার মাধ্যমে জনমনে সৎ শাসক হিসেবে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি। ১২৩৫ সালে এ মহান শাসক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তার কন্যা রাজিয়াকে পরবর্তী শাসক ঘোষণা করেন। ১২৩৬ সালে তিনি ইহদম ত্যাগ করেন। কিন্তু সম্রাটের এ মনোনয়ন আমীর-উমারাদের মনঃপুত হয়নি। তাই তারা সম্রাটের পুত্র বাদায়ুনের শাসনকর্তা রুকুন উদ্দীন ফিরোজকে বলপূর্বক দিল্লীর মসনদে বসান। কিন্তু রুকুন উদ্দীন ছিলো অদক্ষ শাসক। যার ফলে বিদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুযোগ বুঝে রাজিয়া পুনরায় দিল্লীর মসনদ দখল করে নেয় এবং রুকুন উদ্দীনকে হত্যা করে। রাজিয়া যখন পুনরায় ক্ষমতা দখল করে তখন ১২৩৭ সাল। রাজিয়া ক্ষমতা দখল করে রাজ্যে শৃঙ্খলা আনার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি ১২৪০ সাল পর্যন্ত শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

সুলতানা রাজিয়ার মৃত্যু পরবর্তী

১২৪০ সালে রাজিয়া ও তার স্বামী এখতিয়ার উদ্দীন আলতুনিয়া এক হিন্দু আততায়ীর হাতে নিহত হন। রাজিয়ার মৃত্যুর পর তার ভ্রাতা বাহরামশাহ মসনদে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র দুই বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। নিজের অযোগ্যতার দরুণ সংঘবদ্ধ আমীর দল কর্তৃক "শ্বেতদুর্গে" অবরুদ্ধ হয়ে নিহত হন। অতঃপর ১২৪২ সালে ইলতুৎমিশের পৌত্র মাসুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মাসুদ দুঃশাসন ও ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণে সম্রাট হিসেবে অযোগ্য বিবেচিত হন। যার ফলে ১২৪৬ সালে তাকেও ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

সুলতান নাসির উদ্দীন মাহমুদ

১২৪৬ সালে নাসির উদ্দীন মাহমুদকে ক্ষমতায় বসানো হয়। নাসির উদ্দীন মাহমুদ দরবেশ, আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১২৬৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বাদশাহ গিয়াস উদ্দীন বলবন

সুলতান গিয়াস উদ্দীন বলবন ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। নাসির উদ্দীন মাহমুদ তাঁকে মৃত্যু পূর্বে স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনিত করে যান। গিয়াস উদ্দীন বলবন ছিলেন নাসির উদ্দীন মাহমুদের প্রধানমন্ত্রী ও শশুর। তিনি শাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজান। অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমন করেন। বহির্শক্তি প্রতিহত করেন, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সুলতান ইলতুৎমিশের পর তুর্কী সালতানাতে তিনি ছিলেন সফল রাষ্ট্রনায়ক।

তিনি ২২ বছর রাজত্ব করেন। শরীয়তের আইন প্রতিষ্ঠা করেন। ন্যায়বিচার ও

সু-শাসন কায়েম করেন।
সুলতান বলবনের দুই পুত্রের মাঝে একজন আগেই মারা যান। তার নাম মুহাম্মদ। দ্বিতীয় পুত্র বুগরাখানকে বলবনের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। ১২৮৭ সালে যখন বলবন মারা যান তখন বুগরাখান ছিলো বঙ্গদেশের শাসনকর্তা। তিনি দিল্লী শাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বঙ্গদেশে ফিরে আসেন।
তাই অভিজাতগণ বাধ্য হয়ে বুগরাখানের ১৮ বছরের সন্তান কায়কোবাদকে সিংহাসনে বসান। কায়কোবাদের ক্ষমতা গ্রহণের পর রাজ্যে অশান্তি দেখা দেয়। দরবারীদের মাঝে তুর্কী অভিজাত সম্প্রদায় ও খিলজীগণ বিভক্ত হয়ে পড়ে। খিলজীগণ ক্রমেই প্রবল হয়ে ওঠে। এ দিকে কায়কোবাদও পঙ্গু হয়ে পড়েন।

তুর্কী শাসনের পতন

কায়কোবাদ পঙ্গু হয়ে পড়ার পর তুর্কীগণ নিজস্ব সাম্রাজ্যের প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ১২৮৯ সালে কায়কোবাদের তিন বছর বয়স্ক সন্তান কাইমুর্সকে সিংহাসনে বসান। এতে করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে যায়। এক পর্যায়ে খিলজী সম্প্রদায়ের নেতা ফিরোজ খিলজী দিল্লীতে প্রবেশ করে এবং অল্প বয়স্ক সুলতানকে অবরোধ করে ফেলে এবং নিজেকে দিল্লীর সুলতান ঘোষণা করে জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। তখন ছিল ১২৯০ সাল।

খিলজী বংশের শাসন

সুলতান জালাল উদ্দীন ফিরোজ শাহ এর ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে খিলজী শাসনের সূচনা হয়। তিনি প্রায় ছয় বৎসর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১২৯৬ সালে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীনের চক্রান্তে তিনি নিহত হন । জালাল উদ্দীনকে হত্যা করে আলাউদ্দীন খিলজী নিজেকে দিল্লীর সুলতান ঘোষণা করেন। তিনি ক্ষমতায় আরোহণ করার পর মঙ্গলদের দমন, অর্থনৈতিক সংস্কার ও রাজ্য সম্প্রসারণের প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি তার শাসনামলে উত্তর ভারতের গুজরাট, দক্ষিণাত্যের দেবগিরী, বরঙ্গল, মেবারসহ অনেক অঞ্চল দিল্লী সাম্রাজ্যের আওতাভুক্ত করেন। আলাউদ্দীন খিলজী দীর্ঘ ২০ বছর পর্যন্ত অত্যন্ত দাপটের সাথে রাজ্য পরিচালনা করেন। তিনি ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

খিলজী শাসনের পতন

আলাউদ্দীনের অন্তিমকালে তাঁর মন্ত্রী মালিক কাফুর ক্ষমতা দখলের লালসায় ষড়যন্ত্র করেন। সে আলাউদ্দীনের দুই সন্তান, খিজীরখাঁন ও সাহদিখাঁনকে বন্ধি করতে বাধ্য করেন এবং শিশু সন্তান সিহাবউদ্দীনকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে জোরপূর্বক বিবাহ করে নিজেই শাসনকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিন পর প্রাসাদের জনৈক দেহ রক্ষীই মালিক কাফুরকে হত্যা করে ফেলে।
অতঃপর সেহাব উদ্দীনের বড় ভাই মোবারক খাঁন তার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তবে কিছু দিন পর মোবারক খাঁন তার ছোট ভাই সেহাব উদ্দীনের চোখ উপড়ে ফেলে এবং তাকে সিংহাসনচ্যুত করে। মোবারক খাঁন ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে। সে নিজেকে আমোদ-প্রমোদে ভাসিয়ে দেয়। যার ফলে ১৩২০

সালে দাক্ষীণাত্যের শাসনকর্তা খসরুখাঁন সুলতান মোবারক খাঁনকে হত্যা করে এবং সিংহাসন অধিকার করেন। খসরুখাঁন ক্ষমতার অপব্যবহার করার কারণে অভিজাত সম্প্রদায় তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এই সুযোগে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা গাজী মালিক দিল্লী আক্রমণ করেন। গাজী মালিক ১৩২০ সালে খসরুখাঁনের শিরোচ্ছেদ করে দিল্লীর কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিপতি হয়।

তুঘলক বংশীয় শাসন

গাজী মালিক সিংহাসনে আরোহণের সময় গিয়াসউদ্দীন তুঘলক উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। এ সময় তিনি বহু এলাকা দিল্লী শাসনের অধিনে আনেন। এই সূত্র ধরেই তিনি বঙ্গদেশ বিজয় করেন। বঙ্গদেশ জয় করার পর গিয়াস উদ্দীনের সন্তান জুনাখাঁন উরফে উলুখখাঁন পিতার সংবর্ধনার জন্য এক বিরাট কাষ্ঠগৃহ নির্মাণ করেন। ১৩২৫ সালে গিয়াস উদ্দীন তুঘলক দেশে ফিরলে সে গৃহের নিচে চাপা পড়ে মারা যান। পিতার মৃত্যুতে উলুখখাঁন সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুহাম্মদ বিন তুঘলক খাঁন নাম ধারণ করেন। তিনি ২৬ বছর যাবত শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মুহাম্মদ বিন তুঘলক একজন অভিজ্ঞ শাসক ছিলেন। তার শাসনের শেষ দিকে কিছুটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। ১৩৫১ সালে তিনি গুজরাটে বিদ্রোহ দমন করতে গেলে সেখানেই মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর তার চাচাত ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলক সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ধর্মপরায়ণ শাসক ছিলেন। এ জন্য স্বীয় বিচার বিভাগকে ইসলামী চাঁছে গড়ে তোলেন।

প্রায় ৩৭ বছর শাসনকার্য পরিচালনার পর ১৩৮৮ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তুঘলক শাসনের পতন

ফিরোজশাহ তুঘলকের মৃত্যুর পর তার পৌত্র তুঘলকশাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করে দ্বিতীয় গিয়াস উদ্দীন উপাধি ধারণ করেন। তবে অল্প কিছু দিনের মাঝে ১৩৮৯ সালে তিনি তদিয় চাচাত ভাই আবু বকরের হাতে নিহত হন। আবু বকর তাকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে। তবে অল্প কিছু দিনের মাঝে বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি গদিচ্যুত হন। সুযোগ বুঝে ফিরোজশাহ তুঘলকের কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ 'মুহাম্মদ' নাসির উদ্দীন মুহাম্মদ নাম ধারণ করে ক্ষমতায় বসেন। তখন ছিল ১৩৯০ সাল। তিনি মাত্র চার বছর ক্ষমতায় থাকার পর ১৩৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তার ছেলে হুমায়ুন ক্ষমতায় বসে। কয়েক মাসের মাঝে তিনিও মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর মুহাম্মদের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদ নাসির উদ্দীন 'মাহমুদ' তুঘলক নাম ধারণ করে ক্ষমতায় বসেন। তার শাসনামলে বিভিন্ন গোলযোগ দেখা দেয় এবং ফিরোজ শাহ এর বংশধরের মাঝে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এ সুযোগে তুর্কী চাখতায় বংশের তুরখাই এর পুত্র তৈমুরলঙ্গ ১৩৯৯ সালে এক বিরাট বাহিনী নিয়ে ভারত আক্রমণ করে দিল্লী দখল করে নেয়। কিন্তু তৈমুরলঙ্গ মাত্র ২৫ দিন দিল্লীতে অবস্থান করার পর অসংখ্য দাস-দাসি ও লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেন। যাওয়ার পথে তিনি খিজীরখাঁনকে লাহোর ও আশপাশের এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর নাসির উদ্দীন মাহমুদ

তুঘলক পুনরায় দিল্লীতে ফিরে এসে সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন। পুনরায় ক্ষমতায় বসে ১৪১১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

সৈয়্যদ বংশীয় শাসন

১৪১৪ সালে তৈমুরলঙ্গ এর প্রতিনিধি মুলতানের শাসনকর্তা খিজিরখাঁন, দৌলতখাঁন লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ দখল করে। নাসির উদ্দীন মাহমুদ তুঘলক এর মৃত্যুর পর লোদীকে আমীর উমারাগণ ক্ষমতায় বসিয়ে দিলেন। খিজিরখাঁন আরব বংশদ্ভুত হওয়ায় সে নিজেকে সৈয়দ বংশীয় বলে দাবি করতেন। এ কারণে তার প্রতিষ্ঠিত রাজ বংশকে সৈয়দ বংশীয় শাসন বলা হয়। খিজিরখাঁন আট বছর শাসনকার্য পরিচালনা করেন। ১৪২১ সালে তার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র মোবারক শাহ ক্ষমতায় আসেন। মোবারক শাহ ১৪৩৪ সালে জনৈক ব্যক্তির হাতে নিহত হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র ক্ষমতায় বসেন। মুহাম্মদ শাহ ১১ বছর ক্ষমতায় থাকার পর ১৪৪৪ সালে নিহত হন।

সৈয়দ বংশীয় শাসনের পতন

মুহাম্মদের পর তার পুত্র আলাউদ্দীন ক্ষমতায় আসেন। সে ছিল সৈয়দ বংশের দুর্বল শাসক। তার রাষ্ট্র পরিচালনায় পারদর্শিতা ছিলো না। এ কারণে ১৪৫১ সালে স্বেচ্ছায় বাহলুল লোদীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। যার ফলে দিল্লীর সালতানাতে সৈয়দ বংশের অবসান ও লোদী বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

লোদী বংশের শাসন

বাহলুল লোদীর ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে লোদী শাসনের সূচনা হয়। বাহলুল লোদী একজন বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি প্রায় ৩৭ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। ১৪৮৯ সালে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। লোদীর মৃত্যুর পর তার দ্বিতীয় ছেলে 'নিজাম খাঁন' সিকান্দার লোদী নাম ধারণ করে ক্ষমতায় বসেন। তিনি ২৮ বছর শাসনকার্য পরিচালনা করে ১৫১৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। সিকান্দার লোদীর মৃত্যুর পর তার ছেলে ইবরাহীম লোদী ক্ষমতায় আসেন।

লোদী শাসনের পতন

ইবরাহীম লোদী ক্ষমতায় আসার পর দরবারীদের একটি দল রাজ্যের মাঝে ভাঙন সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। এ লক্ষ্যে তারা ইবরাহীম লোদীকে গদিচ্যুত করে তার ছোট ভাই জালাল খাঁন লোদীকে ক্ষমতায় বসাতে চেষ্টা চালায়। ইবরাহিম লোদী তাদের এই কুট কৌশল বুঝতে পেরে জালাল খাঁনকে হত্যা করে। এক পর্যায়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁন কাবুলের আমীর মোঘলবংশদ্ভুত বাবরকে ভারত আক্রমণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং ইবরাহিম লোদীকে উৎখাত করার আহ্বান করেন। বাবর এমন সুযোগের অপেক্ষায় ওৎপেতে ছিলো। বাবর ১৫২৬ সালের ২১ এপ্রিল ভারত আক্রমণ করেন। ইবরাহীম লোদীকে পরাজিত করেন এবং দিল্লী অধিকার করেন। এতে করে তিনশত বছরেরও অধিককাল ধরে চলে আসা সুলতানী শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটে।

মোঘল শাসন

ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে মোঘল শাসনামল খুবই গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায়। মোঘল

সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান এ উপমহাদেশে বলতে গেলে এক নবযুগের সূচনা। বাবরের ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে মোঘল শাসনের সূচনা হয়। বাবরের মৃত্যুকালে তার জৈষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন। ১৩ জন মোঘল সম্রাট প্রায় ২৭৯ বছর (১৫২৬-১৮০৩) পর্যন্ত ভারত শাসন করেছেন।

(1) বাবর ১৫২৬ থেকে ১৫৩০, **(2)** হুমায়ুন ১৫৩০ থেকে ১৫৫৬, **(3)** আকবর ১৫৫৬ থেকে ১৬০৬,

(4) জাহাঙ্গীর ১৬০৬ থেকে ১৬২৭, **(5)** শাহ জাহান ১৬২৭ থেকে ১৬৫৮, **(6)** আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ থেকে ১৭০৬, **(7)** বাহাদুর শাহ ১৭০৬ থেকে ১৭১২, **(8)** জাহান্দার শাহ ১৭১২ থেকে ১৭১৩, **(9)** ফররুখ সিয়ার ১৭১৩ থেকে ১৭১৯, **(10)** মুহাম্মদ শাহ ১৭১৯ থেকে ১৭৪৮, **(11)** আহমদ শাহ, **(12)** দ্বিতীয় আলমগীর, **(13)** শাহ আলম দ্বিতীয় শাসকত্রয় ১৭৪৮ থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত।

সম্রাট হুমায়ুন

বাবরের পুত্র সম্রাট হুমায়ুন ২৩ বছর বয়সে পিতাকে হারান। হুমায়ুনও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। তার চেহারা ও পোশাক-পরিচ্ছদ পিতার মতই ছিলো। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মদ সা. তথা ইসলামী চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। ১৫৩০ থেকে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাদশাহ ছিলেন। তিনি একজন পরহেজগার মুসলমান ছিলেন। কিন্তু তাকে আফিমখোর বলে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি একজন বিশিষ্ট বীর ও নিরপেক্ষ শাসক ছিলেন। কঠিন রোগমুক্তির পরেই পিতার মৃত্যুতে শোকার্ত হুমায়ুন দেখলেন, গুজরাটে বাহাদুর শাহ নামে এক প্রতাপশালী রাজা নিজ শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্যসীমা বৃদ্ধিতে চলমান। অন্যদিকে বিহারে পাঠানবীর শেরশাহ আফগানী প্রবল শক্তিতে দণ্ডায়মান। বাহাদুরের বিরুদ্ধে হুমায়ুন যুদ্ধ করে তাকে পরাস্ত করলেন। তারপর ১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দে চৌসার যুদ্ধে শেরশাহ আফগানীকে পরাস্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু নিজেই পরাজিত হলেন। আসলে ঐ যুদ্ধ ধর্মের জন্য বা শৃঙ্খলার জন্য ছিলো না, যুদ্ধ ছিলো শুধু বংশীয় মর্যাদা রক্ষার জন্য। তাই ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে আবার উভয়ে যুদ্ধ করলেন এবং শেরশাহ আফগানী দিল্লী ও আগ্রা দখল করলেন। একথা সঠিক যে, শেরশাহ আফগানীর ধর্মগুণ, বিরত্ব, মহত্ব, চরিত্র, কুটনীতি ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হুমায়ুন অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলো না বরং উৎকৃষ্টই ছিলো। যাই হোক হুমায়ুনকে পারস্যে পলায়ন করতে হয়। ঐ দূরাবস্থার মধ্যে অমরকোট নামক স্থানে তার 'আকবর' নামের পুত্রের জন্ম হয়।

পারস্য সম্রাটের সাহায্য পেয়েই হুমায়ুন ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত আক্রমণ করলেন এবং দিল্লি ও আগ্রা দখল করে পূর্ব মর্যাদায় ফিরে আসলেন। বিজয় হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি তার লাইব্রেরিতে সিঁড়ি থেকে নামতে গিয়ে পড়ে যান এবং আহত হন। আল্লাহর নাম বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। আর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে করতে ইহদম ত্যাগ করেন। সেটা ছিলো ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ।

সম্রাট শেরশাহ

১৫৩৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৪৫ পর্যন্ত শেরশাহ রাজত্ব করেন। এ অল্প সময়ের মধ্যেই শুধু যুদ্ধ নয়, সর্ব বিষয়ে তিনি যে রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, তা অত্যন্ত

চমকপ্রদ। গোটা রাষ্ট্রকে কতগুলো প্রদেশে ভাগ করেছিলেন। প্রত্যেক প্রদেশকে কয়েকটি সরকার, প্রত্যেক সরকারকে আবার কয়েকটি পরগণায়। প্রত্যেক পরগণা কিছু সংখ্যক গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো। প্রদেশের শাসককে বলা হতো ইকতেদার। ইকতেদারের অধিনে ছিলেন, সিকদার-ই-সিকদারান। রাজস্ব ও বিচার বিভাগের নেতা ছিলেন মুনসিফ-ই-মুনসিফান। এভাবে মুনসিফ, পোতাদার, কারকুন, আমীন, দেওয়ান প্রভৃতি প্রচুর পদ বিন্যাস করেছিলেন। আর সবার উপরে ছিলেন শেরশাহ স্বয়ং। তার চার জন বিশিষ্ট মন্ত্রী ছিলেন চারটি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত। চারজনই ছিলেন নিজের বিভাগে সুপণ্ডিত এবং সৃজনী শক্তিধর। ১. দেওয়ান-ই-ওজারত বা রাজস্বমন্ত্রী ২. দেওয়ান-ই-রিসালাত বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৩. দেওয়ান-ই-আরজ বা সামরিক বিভাগের মন্ত্রী ৪. দেওয়ান-ই-ইনসা বা দলীল ও ভূ-মন্ত্রী।

সমগ্র রাষ্ট্রের জমি জরিপ, প্রজাদের পাট্টা এবং কবুলিয়াত দান, শস্য হতে কর প্রদানের সুবিধা দান এবং ভারতে চিঠিপত্র আদান-প্রদান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রথম চালু হয় এই শেরশাহের আমলেই। ভারতীয় মুদ্রা তঙ্কাকে রুপিয়া নাম তারই দেয়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, শেরশাহ নিচুতলা থেকে উপর তলা পর্যন্ত যে শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন তা আজও শুধু ভারতে নয়, সারা বিশ্বের কোথাও সামগ্রিকভাবে আবার কোথাও বা আংশিকভাবে প্রচলিত রয়েছে। শেরশাহের শাসনব্যবস্থা এত সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ ছিলো যে, তখন নিরাপত্তার জন্য কাউকে ঘরে খিল লাগাবার বা তালা লাগাবার প্রয়োজন হতো না। রাস্তায় লুটপাট বা ছিনতাই তিনি বন্ধ করেছিলেন। ছোট বড় অনেক রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন। কলকাতা থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত নির্মিত বিখ্যাত রাস্তার ধারে ধারে বরাবর হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য পৃথক পৃথক সরাইখানা স্থাপন করেছিলেন। 'চেপে রাখা ইতিহাস' এর লেখক বলেন- সেই রাস্তার ধারে বসেই তিনি চেপে রাখা ইতিহাস লিখেছেন। এই ঐতিহাসিক রাস্তাটির নাম শেরশাহ রোড না হয়ে ইতিহাসের পাতায় তার ইংরেজি নাম হয়েছে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড-যেখানে শেরশাহ নামের চিহ্ন মাত্র নেই।

তিনি একবার বলেছেন, যদি আমার হায়াৎ (আয়ু) আল্লাহ আরও বাকি রাখেন, তাহলে আমি এমন একটা রাস্তা তৈরি করতে চাই যেটা ভারত হতে স্থলপথে একেবারে আরব দেশে মক্কা শরীফ পর্যন্ত লম্বা হবে, যেটার উপর দিয়ে আমার ভারতীয় যে কোন বোন যেন নির্ভয়ে একাকী হাঁটতে হাঁটতে হজে যেতে পারেন। কিন্তু তার সেই স্বাদ পূরণ হয়নি। হঠাৎ একদিন বারুধের স্তুপে আগুন লেগে যায় এবং তিনি তাতেই মৃত্যু বরণ করেন। শেরশাহ হুমায়ুন অপেক্ষা আরও শক্তিশালী ও রাজনীতিক ছিলেন। তাঁর মৃত্যু না হলে মোগল ইতিহাসের ধারা অন্য পথে প্রবাহিত হতো।

বাদশাহ আকবর

ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দীতে আকবরের পিতা হুমায়ুন শেরশাহের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্ত্রী হামিদা বানুসহ পলায়ন করেন। পিতা-মাতার নির্বাসিত জীবনকালে ১৫৪২ সালের ২৩ নভেম্বর আবুল ফাতাহ জামালুদ্দীন মুহাম্মদ আকবরের জন্ম হয়। মাত্র তের বছর বয়সে আকবর ১৫৫৬ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী

দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর ছিলেন একজন বিজ্ঞ শাসক, সাহসী বীর, অসাধারণ সামরিক প্রতিভাসম্পন্ন সেনাপতি ও সামরিক সংস্কারক, বাহ্যিক দিক বিবেচনায় শতাব্দির শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক। তার রাজত্ব কাল ছিলো ৫০ বছর। তবে দীন-ই-এলাহীর প্রবর্তন করে তিনি ইসলামের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করেন এবং মুসলিম উম্মাহর কাছে চির ধিকৃত হয়ে আছেন। উপমহাদেশে মুসলিম শাসকদের মাঝে বাদশাহ আকবরই ইসলামের ক্ষতি করেছেন সবচেয়ে বেশী। ক্ষমতা লোভী এ সম্রাট সভাসদদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দীন-ই-এলাহী নামে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তণ করে ইসলামের অস্তিত্ব ও আদর্শকে বিপন্ন করেছিলো মারাত্মকভাবে।

আকবরের প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস

প্রাথমিক জীবনে আকবর একজন সাদাসিধে মুসলমান ছিলেন। তিনি আলিম সমাজ, পীর-বুযুর্গদের সম্মান করতেন। ইলম ও ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াদি জানতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতেন। হজ ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতেন।

আকবরের ধর্মনীতি পরিবর্তনের কারণ

১. ক্ষমতার অন্ধমোহ। ২. ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতা। ৩. ধর্মে ধর্মে বৈরিতা ও বিদ্বেষ রাজ ক্ষমতায় যে কোন সময় প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে এ আশংকায় শঙ্কিত থাকা। ৪. সে মনে করতো ধর্ম সমূহের পারস্পরিক ব্যবধান উঠিয়ে সর্ববাদী একটি ধর্মের প্রবর্তন করলে, ধর্মে ধর্মে বৈরিতা ও বিদ্বেষ এর আশঙ্কা থাকবে না। ৫. আকবরের সভাকবি আবুল ফজলের বাবা শেখ মোবারক ছিলেন ভাববাদী দর্শনের একজন প্রচারক। আবুল ফজলও সে চিন্তা-চেতনা নিয়ে গড়ে উঠেছিলো। সে ভাববাদী মতাদর্শের পক্ষে আকবরকে কাজে লাগানোর মানসে তারা অক্ষরজ্ঞানহীন সম্রাটকে সর্ববাদী ধর্মের স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন। ৬. সকল ধর্মানুসারীদের পৌরহিত্যের আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে ক্ষমতার মসনদকে নিষ্কণ্টক করে তোলার মোক্ষম পন্থা ভেবেছিলেন।

নতুন ধর্মের জন্য যে নীতি অবলম্বন করেছেন

১. সকল ধর্মের সারবস্তু অনুধাবন করার জন্য বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদেরকে নিজ দরবারে আহ্বান করেছেন।

২. সব ধর্মের সারবস্তু জেনে নিয়েছেন।

৩. সব ধর্মের সারবস্তুকে সমন্বয় করে দীন-ই-এলাহীর নকশা তৈরী করেছেন।

৪. হিন্দু রাজপুত্রদের সাথে অবাধ ওঠা-বসার কারণে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একেশ্বরবাদী ইসলামকে বহুশ্বরবাদী ধর্মসমূহের সাথে সংমিশ্রণ করেছেন।

দীন-ই-এলাহীর প্রবর্তিত কিছু নীতি

১. এ ধর্মের কালিমা ছিলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-আকবার খলীফাতুল্লাহ'।

২. জন্মবার্ষিকী পালন এবং বিভিন্ন উৎসবে স্ব-ধর্মীদের ভোজের আমন্ত্রণ করতে হতো।

৩. তার অনুসারীরা পরস্পর সাক্ষাতকালে নতুন প্রথায় সম্ভাষণ করতো । প্রথম ব্যক্তি বলতো, "আল্লাহু আকবার"। দ্বিতীয় ব্যক্তি "জাল্লা-জালালুহু" বলে তার প্রতি

উত্তর দিতো।
৪. মদ, জুয়া, সুদ এ ধর্মে বৈধ ছিলো।
৫. সম্রাট আকবরকে সিজদা করা ও দাড়ি মুণ্ডানোকে বৈধ মনে করা হতো।
৬. পর্দা প্রথাকে রহিত করা হয়েছিলো এবং কেউ মুসলমান হতে পারবে না এ মর্মে নির্দেশ জারি করা হয়েছিলো।
৭. কসাই, জেলে প্রভৃতি নিম্ন জাতের লোকদের সাথে মেলামেশা পরিহার করার নির্দেশ ছিলো।
৮. অগ্নিকে পবিত্র মনে করা হতো এবং সব ধর্মকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার বিধান ছিলো।
৯. ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ যাকাতের বিধান রহিত করা হয়েছিলো।
১০. শুকর এবং কুকুর নাপাক হওয়ার হুকুম রহিত করা হয়েছিলো।
১১. ইসলামের পঞ্চস্তম্ভ হজব্রত পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো।
১২. হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিলো।
এককথায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দুদের প্রথা অনুসরণ করা হতো। এগুলো ছাড়াও দীন-ই-এলাহীর অনুসারীদের জন্য আরও অনেক আচার-অনুষ্ঠানের রীতিনীতি পালন করতে হতো। যারা তার অনুসারী ছিলো তাদেরকে চারটি জিনিস যথা-ধন, জীবন, সম্মান ও ধর্ম সম্রাটের জন্য উৎসর্গ করতে হতো।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী

ভারতীয় উপমহাদেশের দুর্দণ্ড খেয়ালী শাসক বাদশাহ আকবর এর শাসনামলে শতাব্দীর এ মহান সংস্কারক জন্মগ্রহণ করেন। বাদশাহ আকবরের শাসনকাল ছিলো ১৫৫৬ থেকে ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর শেখ আহমদ শেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী জন্ম লাভ করেছেন, ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৯৭১ হিজরী ১৪ শাওয়াল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রে। তার পিতার নাম শেখ আবদুল আহাদ। পৈত্রিক দিক থেকে তিনি ফারুকী বংশের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সংস্কার আন্দোলন

পড়া-শোনার সমাপ্তির পর তিনি সাধারণ মানুষের মাঝে শুরু করেন তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রম। তাঁর সময়ে যেসব বিষয়গুলো ইসলামী চিন্তাধারা ও মূল্যবোধকে কার্যত স্থবির ও বিকৃত করেছিলো সেগুলো মোটামুটি চার ধরণের।
(ক) আকবরের দীন-ই-এলাহীর প্রভাবে সৃষ্ট আকীদা ও বিশ্বাসের বিকৃতি, ইসলামের বিধি-বিধান ও আইন-কানুনের পরিবর্তন, সাধারণ মানুষের আমলী অধঃপতন এবং ব্যাপক নৈতিক অবক্ষয়।
(খ) স্বার্থান্বেষী আলেম নামধারী ব্যক্তিদের সৃষ্ট নানা ধরণের ধর্মীয় কু-সংস্কার।
(গ) আধ্যাত্মবাদী সূফীদের জ্ঞান-দীনতার কারণে ইসলামের নির্মল আধ্যাত্ম দর্শন প্রাচ্য দেশীয় বিভিন্ন ধর্মের ভ্রান্ত দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়া।
(ঘ) ভাববাদী দর্শনের নামে আত্মপ্রকাশ করা আরেক নতুন ফিৎনা। যে ফিৎনার মূল কথা হলো, সকল ধর্মের সারকথা একই। হিন্দুদের রাম ও মুসলমানদের রহীমের মাঝে মূলত কোন পার্থক্য নেই।

শায়খ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. ইসলামের স্বকীয় চিন্তাধারার আলোকে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন ইসলামের শ্বাশ্বত জীবনধারাকে। তিনি উম্মতের সামনে টেনে দিলেন হক্ব ও বাতিলের পার্থক্যরেখা। চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সমাজে চলমান ভ্রান্তচিন্তা ও বিশ্বাসগুলো এবং বলে দিলেন কোনটি সুন্নাত ও কোনটি বিদআত। তিনি মানুষকে বোঝালেন, বনী আদমের উন্নত শির একমাত্র আল্লাহর সম্মুখে নত করা যেতে পারে। অন্য কোন শক্তি বা শক্তিধরের সম্মুখে নয়। ক্রমান্বয়ে সত্যান্বেষী মানুষের কাফেলা তাঁর পাশে এসে সমবেত হতে শুরু করে। তাঁর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে ও চিন্তা-চেতনায় মুগ্ধ হতে থাকলো সত্যসন্ধানী ও আলোর প্রত্যাশী মানুষ। এই মর্দে মুমিনকে কেন্দ্র করে হক্ব ও হক্বানিয়াতের কাফেলা ভারি হতে দেখে স্বার্থান্বেষী, তোষামোদি ও চাটুকার দরবারীরা নিজেদের দুর্দিনের সুস্পষ্ট আভাস অনুভব করতে শুরু করলো। কায়েমী স্বার্থের প্রাসাদ এই চেতনার ধাক্কায় একদিন ধ্বসে পড়বেই এ আতঙ্কে তারা শিহরিত হয়ে উদিয়মান এ সূর্যকে প্রভাতেই ডুবিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো।

ইতোমধ্যে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে ইতিহাসের বিতর্কিত সম্রাট আকবর ইন্তেকাল করেন। তখন আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর ক্ষমতায় আরোহণ করেন। এসময় মুজাদ্দেদে আলফে সানীর বয়স ৪৩ বছর। এতদিনে তিনি তাঁর আন্দোলনকে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তাঁর আন্দোলনের ভয়ে একদিকে যেমন শাহী দরবারের চাটুকার আলেমরা ক্ষেপা ছিলেন অপরদিকে আকবরের চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকারী জাহাঙ্গীরও জ্বলে উঠেছিলেন। কারণ জাহাঙ্গীর তার পিতার আদর্শকে শুধু টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছিলেন না; বরং ক্ষেত্রবিশেষ আকবরকেও ডিঙ্গিয়ে গিয়েছিলেন। ইউরোপিয়ান ও খ্রিস্টানদের প্রতি তার অতি আসক্তিই পরবর্তীকালে ভারতের পরাধীনতার দ্বার খুলে দেয়।

মুজাদ্দিদে আলফে সানীর কারানিবাস

বাদশাহ জাহাঙ্গীর দরবারীদের উস্কানিতে বিভ্রান্ত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানীকে দরবারে ডেকে পাঠান। তেজদীপ্ত এ সংগ্রামী পুরুষ এসে হাজির হলেন দরবারে। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে প্রচলিত সম্রাটকে সেজদাহ করার শিরকী প্রথার বিরুদ্ধে জিহাদ হিসেবে সুন্নাত ত্বরীকায় 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে তিনি অভিবাদন জানালেন সম্রাটকে। এতে সম্রাট রেগে জ্বলে উঠলেন এবং বন্দী করে পাঠিয়ে দিলেন তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে এবং তাঁর সব সহায়-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে দিলেন। কিন্তু ঐশী চেতনায় প্রদীপ্ত প্রাণকে জেল-জুলুম ও হত্যার ভয় দেখিয়ে অবদমিত করা যায় না। তিনি দুর্গে বন্দী অন্যান্য লোকদের মাঝে প্রচার করতে শুরু করলেন ইসলামের অমীয় বাণী। ইসলামের সঠিক ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনার কথা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন তাদেরকে। তাঁর কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক বলিষ্ঠ উপস্থাপনা ও চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে কয়েদিরা তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করতে লাগলেন এবং সংস্কারবাদী এ দীক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করলেন। চোর-ডাকাত, ব্যভিচারাসক্ত, মদ্যপ, ঘাতক, খুনী, লুটেরা সব ধরণের কয়েদী তাঁর শীষ্যত্ব গ্রহণ করে অল্প দিনেই পাল্টিয়ে ফেলল জীবনের গতিধারা। জিন্দানখানা

পরিণত হলো ইবাদতখানায়।

কারামুক্তি ও সম্রাটের প্রতি তাঁর সাত দফা দাবি

তাঁকে জেলে বন্দী করার কারণে সারা দেশে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। দু'বছর যাবৎ জেল জীবন কাটানোর পর শুরু হলো তাঁকে মুক্ত করার দুর্বার আন্দোলন। দুর্গপতি সম্রাটকে লিখে পাঠালেন নবাগত এ বন্দীর প্রভাবে এখানকার পশুগুলো মানুষে আর মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে। রিপোর্ট পাঠে সম্রাট ঘাবড়ে গেলেন, অভিভূতও হলেন এবং তাকে মুক্তি দিয়ে স্ব-সম্মানে দিল্লী নিয়ে আসার হুকুম দিলেন। যুবরাজ শাহজাহান গেলেন সংবর্ধনা দিতে। দরবারে পৌঁছলে সম্রাট নিজেই তাকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু এবারও কুর্ণিশের পরিবর্তে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললেন তিনি। রাজঅতিথি হিসেবে দরবারে আসার এ সুযোগকে কাজে লাগালেন তার সংস্কার আন্দোলনের পক্ষে। সম্রাটের কাছে তিনি সাত দফা দাবি পেশ করলেন।

১. সম্রাটকে সেজদাহ করার নীতি সম্পূর্ণরূপে রহিত করতে হবে।
২. মুসলমানদের গরু জবাই করার অনুমতি দিতে হবে।
৩. বাদশাহ ও তার সভাসদদেরকে জামাতের সাথে নামাজ আদায় করতে হবে।
৪. শরীয়াহ বিভাগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতঃ কাজীর পদ পুনঃবহাল করতে হবে।
৫. সকল প্রকার বিদআত ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে।
৬. ইসলাম বহির্ভূত সকল আইন রহিত করতে হবে।
৭. ভগ্ন ও বিধ্বস্ত মসজিদসমূহ পুনঃসংস্কার করতঃ সেগুলো আবাদ করতে হবে।

সম্রাট তার এসব দাবি মেনে নিয়েছিলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এ মর্মে শাহী ফরমানও জারী করেছিলেন। এটা ছিলো মুজাদ্দিদ রহ. এর জন্য সফলতার বিরাট এক মাইল ফলক।

রাজ দরবারে নজরবন্দী জীবন ও সংস্কার মিশন

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. ভাবলেন, সম্রাট পরিবর্তনের মাঝে সফলতা নেই যদি না সম্রাটের মন-মানসিকতা পরিবর্তন হয়। তাই তিনি সম্রাট ও তার সভাসদদের মন-মানসিকতা বদলানোর পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁর অভিনব চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে দাবি দাওয়া মেনে নিলেও দরবারীদের অপকৌশলে আবার তাকে রাজ দরবারের সেনা ছাওনীতে নজরবন্দী করে রাখেন। নজরবন্দী জীবনে মুজাদ্দিদ রহ. স্বীয় মিশন বাস্তবায়নে আরও বেশি অগ্রসর হতে লাগলেন। আল্লাহ যেন নিজ হাতেই এই সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি বাদশাহর সাথে বৈঠকে ইসলামের সঠিক চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, নিয়ম-নীতিসহ সূফিবাদের জটিল বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ তুলে ধরলেন। স্বীয় পুত্রের কাছে লেখা এক পত্রে তিনি এটা উল্লেখও করেছেন যে, এখানকার অবস্থা সন্তোষজনক। বাদশাহর সাথে এক একটি বৈঠকের আলোচনার বিবরণ দিতে গেলে এক একটি বইয়ের প্রয়োজন। বৈঠকগুলোতে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য, ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধান, শরীয়তের বোধগম্যতা কেবল জ্ঞান ও আকলের ওপর নির্ভরশীল নয়, নবুয়তের সমাপ্তি, প্রত্যেক যুগের মুজাদ্দিদ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা

ইত্যাদি বিষয়াদি তিনি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। বাদশাহ ও তার সভাসদবর্গ ধৈর্যসহকারে এসব শুনেছেন। নজরবন্দী জীবনেই আমীর-উমারা ও সভাসদ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করে জীবনের গতিধারা পাল্টে ফেলেন। তিনি এ মিশনে এতটা সফল হয়েছিলেন যে, তখন থেকে বাদশাহ আওরঙ্গজেব পর্যন্ত রাজা ও রাজকর্মচারীরা নকশবন্দী তরীকার মুরীদ ছিলেন।

বিদআত ও কু-সংস্কার বিরোধী আন্দোলন

বিদআত ও কু-সংস্কারের মূলোৎপাটনে তিনি যে মূলনীতি গ্রহণ করেছেন তা হলো, সরাসরি বিদআতের বিরোধীতায় না গিয়ে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে নববী সুন্নাতের প্রচলন ঘটানো।

সূফীবাদীদের সংস্কার

মুজাদ্দিদ রহ. সূফীদের আমূল সংস্কার সাধন করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, যে কাজের সঙ্গে নববী আদর্শের কোন সঙ্গতী নেই তা যে নামেই করুক, যে কোন উদ্দেশ্যেই করুক তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

সারকথা

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা., সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ী, তবে তাবেয়ীনের যুগ থেকেই আরব বণিকদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইসলামের আলো পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরায়ের পর এদেশে ইসলাম শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছে। তবুও একথা বলতে হয় যে, ভারতবর্ষে মুসলিমসাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পত্তন হয়েছিলো তুর্কী ও আফগান বংশের বিভিন্ন খান্দান ও শাসকদের হাতে। এজন্য শুরু থেকেই এখানে ধর্মের প্রভাব ছিলো গভীর এবং এর প্রকৃতি ছিলো সহজ সারল্যে ভরপুর। যা ছিলো তুর্কী ও আফগান মন-মানস ও রুচির বৈশিষ্ট্য। শুরু থেকেই এখানে তরীকায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং হানাফী মাযহাবের প্রতি আনুগত্য চলে আসছে এবং শুরু থেকে সেটাই রাষ্ট্রের সংবিধান ও আইন হিসেবে অনুসৃত হচ্ছে। এখানে "ফাতাওয়া-ই-তাতারখানী" এবং "ফাতাওয়া-ই-কাযীখান" এর ন্যায় হানাফী ফিকাহ এর কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কিতাব প্রণীত হয়। আর এটা "ফাতাওয়া-ই-আলমগীরী" সংকলনের বহু পূর্বেই সংকলিত হয়ে মুসলিম বিশ্বে খ্যাতি লাভ করে এবং "ফাতাওয়া-ই-হিন্দিয়া" নামে মিসর, সিরিয়া ও ইরাকে খ্যাত হয়।

ভারতবর্ষে মুসলিম ইতিহাসের কয়েকজন বাদশাহকে কুরআন-সুন্নাহ ও ইসলামী শরীয়তের প্রতি সমর্থন, কুফর ও ধর্মদ্রোহিতা সম্পর্কে অসন্তোষ ও বিরূপ মনোভাব, বিদ'আত ও গর্হিতকর্মের বিরোধীতা ও তা দূরীকরণ এবং ধর্মীয় মর্যাদাবোধের ক্ষেত্রে নিবিষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মুহাম্মদ তুগলক ও ফিরোজ তুগলক এবং দশম শতাব্দীতে সুলতান সিকান্দার লোদীর নামোল্লেখই এক্ষেত্রে যথেষ্ঠ । "তাবাকত-ই-আকবরী", "তারীখ-ই-ফিরিশতা" এবং "তারীখ-ই-দাউদী"-এর গ্রন্থকারের বর্ণনা মুতাবিক সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে ধর্মের প্রতি আনুগত্য এমনভাবে সৃষ্টি হয়ে ছিলো যে, মনে হচ্ছিল একটি নতুন পন্থা জন্ম লাভ করেছে। তিনি নিজের চাইতেও

ইসলামকে বেশি ভালবাসতেন। তাঁদের ভাষায়, সুলতান তাঁর জীবনের প্রথম থেকেই ধর্মের প্রতি অতিমাত্রায় অনুরক্ত ছিলেন। ইলম চর্চায় বাদশাহ ছিলেন প্রবল আগ্রহী। সে যুগে গজিয়ে ওঠা বহু কবরের জায়গায় খাল খনন করতঃ তিনি সে সবের নাম-নিশানাও মুছে ফেলেন। লোদী বংশ তাদের পাঠান বংশ ও ঐহিত্যের কারণে ইসলামে নিবেদিত এবং হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু ৯৬৩ হিজরীতে আকবর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পূর্ণ অর্ধশতাব্দী যাবত দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন এবং ইসলামের মূলে আঘাত করে একেশ্বরবাদীর পরিবর্তে বহুশ্বরবাদী ধর্মের প্রবর্তন করেন। তার নতুন ধর্মের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যান মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ.। মুজাদ্দিদ সাহেবের যমানাতে যখন আকবরের ইন্তেকাল হয় তখন তাঁর বয়স ছিলো ৪৩ বছর। অতঃপর নূরুদ্দীন জাহাঙ্গীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তারই শাসনামলে মুজাদ্দিদ সাহেব ইনতিকাল করেন। তিনি আমৃত্যু যে সংস্কার আন্দোলন করে গিয়েছিলেন তার সারকথা হলো, 'বিদআতের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লাভ নেই যদি জনসাধারণের মাঝে সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা করা না যায়। নাস্তিক্যবাদ ও ইলাহবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে লাভ নেই যদি প্রজাদের মাঝে তাওহীদি বিশ্বাস ও ঈমানী চেতনা জাগ্রত করা না যায়। শাসক পরিবর্তন করে কোন লাভ নেই যদি শাসকের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা ও নীতি-নৈতিকতা পাল্টানো না যায়। এটা এমন যেন "শুধু নেতা নয়-নীতির পরিবর্তন চাই"।

গ্রন্থসূত্র-

১. উলামায়ে হিন্দকা শানদার মাযী।
২. তাবাকত-ই-আকবরী।
৩. তারীখ-ই-ফিরিশতা।
৪. তারীখ-ই-দাউদী।
৫. তারীখ-ই-দা'ওয়াত ওয়া আযীমত।
৬. চেপে রাখা ইতিহাস।
৭. দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান।
৮. উইকিপিডিয়া।

.....

লেখক পরিচিতি

বিশিষ্ট লেখক ও গ্রন্থপ্রণেতা

জাতীয় শিশু-কিশোর পত্রিকা
মাসিক নকীব

কিশোরদের হৃদয়ে ঝড়তোলা
প্রিয় পত্রিকা মাসিক নকীব
সর্বদা থাকছে আপনার হাতের নাগালে
নিত্য নতুন সাজে...
মজার সব লেখা নিয়ে...

যোগাযোগ
মাসিক নকীব
৫৫/বি, পুরানা পল্টন, ৩য় তলা, ঢাকা-১০০০
০১৯৬৬১১০৮৩৩

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. থেকে সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.
যুগে যুগে মহামনীষীদের বিপ্লবী কর্মধারা

শেখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম

ভূমিকা

হিজরী দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীকে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের চরম অবনতির যুগ বলে গণ্য করা হয়। শেষ শক্তিমান মুগল সম্রাট মুহিউদ্দিন আলমগীর আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১১১৮ হি.) পর বিশাল মুগলসাম্রাজ্য মারাত্মক বিচ্ছিন্নতার শিকার হয়। দিল্লীর সম্রাটদের দুর্বলতার সুযোগে সুবে-বাংলা, অযোধ্যা, দাক্ষিণাত্য, হায়দারাবাদ প্রভৃতি একে একে দিল্লীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। অপরদিকে দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিমে মারাঠা এবং উত্তর-পশ্চিমে শিখ জাতি দুর্দমনীয় হয়ে ওঠে। এই দু'টি প্রবল শক্তির মূল লক্ষ্য ছিল দিল্লীর মসনদ দখল করে উপমহাদেশের মুসলিম শক্তির বিলুপ্তি ঘটানো। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিপর্যয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রেও চরম অবক্ষয় ঘটেছিল। মুসলমানদের এহেন ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করে এর থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করেন ইতিহাসের সফল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংস্কারক, ইমাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.। তিনি ক্ষুরধার লিখনী এবং সাংগঠনিক কর্মপ্রচেষ্টার দ্বারা মুসলিম সমাজে জাগরণের ঢেউ সৃষ্টি করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. ছিলেন উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রজ্ঞাগত জীবনে একজন প্রাণপুরুষ। সমসাময়িক ধর্মীয় চিন্তাধারাতে তাঁর প্রভাব ছিল অপরিসীম।

শাহ ওয়ালীউল্লাহর পরিচয়

উপমহাদেশে মুসলিম জাগরণের অগ্রপথিক হযরত আবুল ফায়াজ আহমদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. ১৭০৩ খ্রি. মুতাবিক ১১১৪ হিজরীর ৪ শাওয়াল বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সময় ভারতের মুজাফফরনগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হযরত শাহ আবদুর রহিম রহ. তৎকালের একজন সু-প্রসিদ্ধ আলিম ও শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ছিলেন। শাহ সাহেব হযরত ওমর ফারুক রা. এর বংশধর ছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে শাহ সাহেবকে মকতবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে হিফজ শেষ করেন। পনের বছর বয়সে ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করেন। শাহ সাহেব তাঁর মুহতারাম পিতার কাছেই চৌদ্দ বছর বয়সে বায়আত গ্রহণ করেন। সতের বছর বয়সে পিতা শাহ আবদুর রহিম রহ. ইন্তেকাল করেন। ইন্তিকালের পূর্বে পুত্র ওয়ালীউল্লাহকে ইজাযত ও খিলাফত দান করেন। পিতার ইন্তেকালের পর তাঁর বাবার প্রতিষ্ঠিত মাদ্‌রাসায়ে রাহীমিয়াতে বার বছর অধ্যাপনা করেন। অত:পর

১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে হজ্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমায় গমন করেন। সেখানে দুই বছর অবস্থান করেন। ১৭৩৩ সালে সমাজ সংস্কারের এক মহান চেতনা নিয়ে তিনি দিল্লী ফিরেন। দেশে ফিরে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে এক বৈপ্লবিক আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন।

সংস্কার আন্দোলন

হযরত শাহ সাহেব অর্ন্তদৃষ্টির দ্বারা বুঝতে পারলেন যে, পতনোন্মুখ মুগলসাম্রাজ্য দ্বারা মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সম্ভব নয় অনাগত রাজনৈতিক কঠিন সমস্যার মুকাবিলা করা। তাই তিনি ঘুণেধারা নিষ্ক্রিয় এ সমাজ কাঠামোকে ভেঙে নতুন সমাজ কাঠামো বিনির্মাণের লক্ষ্যে সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের মূল দাবী ছিল 'ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থা ভেঙে দাও এবং নতুন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোল।' এ দাবীকে সামনে রেখে তিনি তাঁর সংস্কার কর্মসূচি পেশ করেন। তাঁর সংস্কার আন্দোলনের পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক। সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. বলেন- 'হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. কর্তৃক সূচিত সংস্কার আন্দোলনের পরিধি ছিল অনেক ব্যাপক। দীনের সঠিক ধারণা জাগ্রত করা, ইলমে নববীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার, সমাজ মানসিকতায় বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ব্যাপক অবদান তিনি রেখেছেন বিগত ইতিহাসে এর নমুনা বিরল।'

সংস্কারমূলক ও বিপ্লবী কর্মসূচি

১. আকীদার সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত।

২. হাদীস ও সুন্নাতের ব্যাপক প্রচার-প্রসার।

৩. ইসলামী শরীয়তকে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপন।

৪. ইসলামী খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা এবং ইসলামে খিলাফতের আবশ্যকতা প্রমাণ।

৫. সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধারের জন্য জিহাদী ভূমিকা গ্রহণ।

৬. উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বশ্রেণিকে সংশোধন ও বিপ্লবের দাওয়াত প্রদান।

৭. তারবিয়াত ও প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে ভবিষ্যত আন্দোলনের যোগ্য ব্যক্তিগঠন।

আন্দোলন পরিচালনা পদ্ধতি

১. জনমত গঠন ও সচেতনতা সৃষ্টি

হযরত শাহ সাহেব রহ. জানতেন যে, জনমত গঠন ও জনসচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া কোন বিপ্লব সাধন করা সম্ভব নয়। আর জনগণের মানসিকতা তৈরী না হলে জিহাদ সফল করা সম্ভব নয়। তাই তিনি জনমত গঠনের ওপর গুরুত্ব দেন এবং জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন-

ক. জনসম্মুখে ওয়াজ-নসিহত ও গ্রন্থ প্রণয়ন

শাহ সাহেব বুঝতেন যে, জিহাদ ব্যতিত উপমহাদেশের মুসলিম সাম্রাজ্যের পতন এড়ানো নম্ভব নয়। তাই তিনি সর্বপ্রথম জনগণের মানসিকতা গঠনের লক্ষ্যে দিল্লীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ওয়াজ-নসিহত শুরু করেন। পাশাপাশি তাঁর

বৈপ্লবিক চেতনাকে বিভিন্ন গ্রন্থের মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেন।

খ. ইসলামী শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষাদান

শাহ সাহেব তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা দ্বারা কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী শরীয়তকে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এবং জনগণের মাঝে ইসলামের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক এককথায় ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দিক তুলে ধরেন এবং তা বাস্তবায়নে সবাইকে আহ্বান জানান।

২. ব্যক্তিগঠন

শাহ সাহেব তাঁর সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার জন্য ব্যক্তিগঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি তাঁর সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন মক্কার ইসলামী আন্দোলনের আদর্শকে সামনে রেখে। তিনি তাসাউফের বাইআতকে রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী না হয়ে শুধুমাত্র অস্ত্রের সাহায্যে কেউ হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে পারেনা। অস্ত্রবলে হয়ত হুকুমত উচ্ছেদ করা যেতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষিত লোকের সংস্থাপন না হলে নতুন সরকার টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবেনা।

৩. জিহাদের প্রশিক্ষণ দান

শাহ সাহেব তাঁর অনুসারীদেরকে আত্মশুদ্ধির পাশাপাশি জিহাদের প্রশিক্ষণ দান করতেন। তিনি রূহানিয়াত ও জিহাদের সমন্বয়ে সাহাবায়ে কিরাম রা. এর ন্যায় একদল মর্দে মুজাহিদ গড়ে তোলেন।

৪. মজবুত সংগঠন

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. তার হাতে গড়া ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে একটি মজবুত সংগঠন গড়ে তোলেন। তিনি নিজেই এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা স্থির করেন। একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করে সারা দেশে এর শাখা ছড়িয়ে দেন। এভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. কর্তৃক একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। শাহ সাহেবের জীবদ্দশায় তিনি এ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র সিরাজুল হিন্দ শাহ আবদুল আযীয রহ. এ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।

ইন্তেকাল

৬১ বছর বয়সে ১১৭৬ হিজরীর ২৯ মুহাররম মুতাবিক ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট শনিবার যোহরের সময় শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. ইন্তেকাল করেন।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এর ইন্তেকালের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয রহ. (জন্ম ১৭৪৬ খ্রি., মৃত্যু ১৮২৩ খ্রি.)। তিনি শাহ সাহেব রহ. কর্তৃক সূচিত তাজদীদ ও সংস্কার আন্দোলনকে ব্যাপকতা দান করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞাতার নির্যাস স্বরূপ জিহাদ ও সংস্কার আন্দোলনের যে দর্শন দিয়েছেন, শাহ আবদুল আযীয রহ. তা ময়দানে বাস্তবায়ন করেন। তিনি আন্দোলনকে একটি পূর্ণ গতিশীল প্রক্রিয়ায় স্থাপন করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহর বিপ্লবী ঘোষণা- "সকল ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থা ভেঙে দাও এবং একটি সুষ্ঠু সমাজ নির্মাণ কর" এর সফল উদ্যোগ সূচিত হয় তাঁরই জীবনে।

শাহ আবদুল আযীয রহ. এর গৃহীত কর্মসূচি

১. পবিত্র কুরআনের আবেদন সার্বজনীনভাবে প্রচার ও প্রসার।

২. ইলমে হাদীসের ব্যাপক প্রচার।
৩. হকের প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের খণ্ডন।
৪. জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা ও জাগরণ সৃষ্টি।
৫. রূহানিয়াতের প্রশিক্ষণ দান ও কর্মী বাহিনী গঠন।
৬. জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহকে পুনর্জীবিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের দিগন্ত উন্মোচন করা।

দারুল হরবের ফতওয়া ঘোষণা

শাহ ওয়ালীউল্লাহর ইন্তিকালের পর ভারতবর্ষের অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন ইংরেজরা পলাশীর ময়দানে সিরাজুদ্দৌলাকে, ২৩ অক্টোবর ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বকসারের ময়দানে শুজাউদ্দৌলাকে পরাজিত করে। ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে শহীদ টিপু সুলতান পাটন ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন।

সুলতান শহীদের লাশ দেখে জেনারেল হ্যারিস তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল- 'আজ ভারতবর্ষ আমাদের'। ১৮০৫ সালে ইংরেজরা দিল্লী দখল করে ঘোষণা করল- এখন থেকে ভারতবর্ষের শাসননীতি হবে- 'সৃষ্টি সৃষ্টার, সাম্রাজ্য সম্রাটের আর কর্তৃত্ব থাকবে কোম্পানীর হাতে।' একদিকে ইংরেজদের আধিপত্য অন্যদিকে দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম দিকে সমগ্র পাঞ্জাব, কাশ্মীর, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শিখদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। শিখেরা তাদের দখলকৃত এলাকাগুলোতে মুসলমানদের ওপর নানা ধরণের নির্যাতন চালায়। অনেক সমৃদ্ধ জনপদ হতে মুসলমানদের উৎখাত শুরু হয়। এহেন বিভিষিকাময় পরিস্থিতিতে হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. দিল্লীর হাদীসের মসনদ থেকে ঘোষণা করলেন, 'এখন থেকে ভারতবর্ষ দারুল হারব' (শত্রু কবলিত এলাকা) সুতরাং প্রতিটি ভারতবাসীর কর্তব্য হলো একে স্বাধীন করা। দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ফতওয়ার এ ঘোষণা। জ্বলে উঠলো স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের বহ্নিশিখা। মূলত তাঁর এই ফতওয়াকে ভিত্তি করেই পরবর্তী দীর্ঘকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুভ সূচনা ঘটে। আর এ কারণেই তাঁকে উপমহাদেশের আযাদী সংগ্রামের জনক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল স্থপতি বলা হয়।

জিহাদ আন্দোলন

উপমহাদেশের মুসলিম জনসাধারণের মাঝে সৃষ্ট নানা প্রকার ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ এবং মুসলমানদেরকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বলে বলীয়ান করে বৈরী পরিবেশে তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা ও বিলুপ্ত রাজনৈতিক শক্তির পুনরুদ্ধার, বিশেষ করে- শিখদের দখলকৃত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব মুক্ত করে মুক্তাঞ্চলে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে উপমহাদেশের অবশিষ্ট অঞ্চল হতে 'বিদেশী ফিরেঙ্গী শাসন' উৎখাত করার লক্ষ্যে শাহ আবদুল আযীয রহ. জিহাদ আন্দোলনের সূচনা করেন। এ আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ গঠন করেন। এ পরিষদের সদস্য ছিলেন হযরত ইসমাঈল শহীদ, সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং মাওলানা আবদুল হাই। নবগঠিত এ পরিষদের আমীর ছিলেন শাহ মুহাম্মাদ ইসহাক রহ.। সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ. ছিলেন সংগ্রাম বিভাগের আমীর।

এ পরিষদের দায়িত্ব ছিল-

১. সারাদেশে সফর করে গণমানুষের মাঝে জিহাদের চেতনা সৃষ্টি করা।
২. স্বেচ্ছাসেবক ও মুজাহিদদের জন্য সামরিক ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা।
৩. যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করা।
৪. বহির্দেশের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।
৫. সশস্ত্র জিহাদ পরিচালনা করা।

অন্যদিকে শাহ আবদুল আযীয রহ. শাহ ওয়ালীউল্লাহর কর্মসূচি অনুযায়ী তালিম-তারবিয়াত ও তাজদীদের কাজ অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ময়দানে যুদ্ধরত মুজাহিদদের পক্ষে জনসমর্থন তৈরি, রসদ যোগাড়, অর্থ সাহায্য প্রেরণ ও শক্তি বৃদ্ধি করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেন।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ.

শাহ আবদুল আযীয রহ. কর্তৃক গঠিত জিহাদ আন্দোলনের প্রাণপুরুষ হযরত সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. (জন্ম সফর ১২০১হিজরী মুতাবিক নভেম্বর ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ) এর কর্মতৎপরতা মুসলমানদের মাঝে এক অকল্পনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর কার্যক্রম

১. দাওয়াত ও ইসলাহী তৎপরতা।
২. স্বাধীনতার লক্ষ্যে জিহাদী চেতনা সৃষ্টি ও মুজাহিদ সংগ্রহ।
৩. সংস্কারমূলক তৎপরতা।
৪. জিহাদের ময়দানে সশস্ত্র তৎপরতা।

এ কর্মসূচি বাস্তবায়নে আহমদ শহীদ রহ. ইমাম শাহ আবদুল আযীয রহ. এর নির্দেশক্রমে তিনবার গোটা দেশ সফর করেন। এ তিনটি সফর তাঁর সংগ্রামী জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

প্রথম সফরে তিনি মুসলিম সর্ব সাধারণের আকীদা ও আমল বিশুদ্ধ করতে সচেষ্ট হন এবং জানমাল দিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণের ওপর বায়আত নেন। সফরে বায়আত গ্রহণকারী মুজাহিদদেরকে ত্যাগ ও কুরবানীর আদর্শ শিক্ষাদান এবং সাংগঠনিক নীতি প্রক্রিয়া অনুশীলনের জন্য তাদেরকে নিয়ে ২য় সফরে হজ্বে যান। জিহাদ শুরু করার আগে বায়তুল্লাহর যিয়ারত দ্বারা রূহানী শক্তি সঞ্চয় করা ছিল এ সফরের প্রধান উদ্দেশ্য। তৃতীয় বারের সফরে তিনি আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করার মহান উদ্দেশ্যে জিহাদে বেরিয়ে পড়েন। এ সফরই ছিল শেষ সফর। এ সফর থেকে তিনি আর বাড়ি ফিরে আসেননি।

প্রথম সফর

১৮১৮ সালে তিনি মাত্র পঞ্চাশ জন সহযাত্রীসহ দিল্লী থেকে সফর শুরু করেন। চার মাস ব্যাপী এ সফরের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল:

১. রূহানিয়াত ও জিহাদের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. একটি সুদূর প্রসারী আদর্শিক বিপ্লবের পথ তৈরি করার লক্ষ্যে গণমানুষকে আদর্শিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কর্মসূচি হাতে নেন। তিনি

মানুষকে ইসলামের সুমহান আদর্শের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে আত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের জিহাদে অংশগ্রহণের দাওয়াত দিতে থাকেন। পাশাপাশি স্বদেশকে মুক্ত করতে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যও দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। সফরে তিনি মানুষের কাছ থেকে জিহাদ ও আত্মশুদ্ধির বায়আত গ্রহণ করতেন।

মূলত: সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর কর্মধারার মূল বৈশিষ্ট্যই ছিল- তিনি তরীকতের বায়আত ও জিহাদের বায়আত একত্রে গ্রহণ করতেন।

সে সময় আধ্যাত্মবাদী সুফীরা তরীকতের ধারাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, জিহাদকে তারা তাসাউফের পরিপন্থী মনে করত। হযরত শহীদ রহ. এ ধারার অপনোদন করেন। তিনি আত্ম-সাধনা ও জিহাদের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে প্রচলিত ধারার বিপরীতে একটি স্বতন্ত্র ধারার সূচনা করেন। তিনি তার নাম দিয়েছেন- 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়্যাহ'। তিনি বায়আত করানোর সময় 'আওর মুহাম্মাদিয়্যাহ' বলে জিহাদী চেতনার প্রতি ইঙ্গিত করতেন।

মারকায গঠন

মুরিদদের ইসলাহ, তারবিয়াত দান ও জিহাদী কার্যক্রম সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়ার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে মারকায তৈরি করেন। তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করার পর মানুষের মাঝে যে দীনি জযবা ও ঈমানী চেতনা সৃষ্টি হতো তাকে ধরে রাখার জন্যই এসব কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয় সফর

১৮২১ সালে হযরত শহীদ রহ. হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় সফর শুরু করেন। আটশ সঙ্গীসহ সাত হাজার মাইলের এ সফর ছিল তাঁর জীবনের বৃহত্তম সফর। এ ঐতিহাসিক সফরের কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিল। তা হলো-

১. বাতিলপন্থী আলেমদের মিথ্যা ফতওয়ার আমলী জবাব দেয়া। কারণ পথের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে তৎকালীন বাতিলপন্থী আলেমরা ভারতীয়দের জন্য হজ্ব ফরজ নয় বলে ফতওয়া দিত। তিনি হজ্বের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য বিরাট এক কাফেলা নিয়ে হজ্বে গমন করেন।

২. বায়তুল্লাহ যিয়ারতের মাধ্যমে জিহাদ সূচনার পূর্বে রূহানী শক্তি অর্জন করা এবং জিহাদের দৃঢ় শপথ গ্রহণ করানো। তিনি ঐতিহাসিক "আকাবা" প্রান্তরে যেখানে আনসারদের প্রথম দল রাসূল সা. এর হাতে হাত দিয়ে বায়আত হয়েছিলেন, সেখানে তাঁর অনুসারীদের থেকে ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর জন্য সর্বার্থক জিহাদের বাইয়াত গ্রহণ করেন।

৩. ইউরোপীয় আগ্রাসনের বিপরীতে এশিয়ার শক্তিগুলোর মাঝে সংহতি কায়েম।

হযরত শহীদ রহ. দীর্ঘ দুই বছর দশ মাস অবস্থানের পর ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ৩০ এপ্রিল স্বদেশে ফিরে আসেন।

উল্লেখ্য যে, হজ্বের সফরে যাওয়া ও আসার পথে কয়েক মাস কলিকাতায় অবস্থানের সময় বাংলার বহু মুজাহিদ সাইয়্যেদ সাহেবের সাথে সাক্ষাত করে জিহাদী আন্দোলনে শরীক হন। বাংলার এক অবিস্মরণীয় মুজাহিদ মাওলানা ইমামুদ্দীন শুরু থেকেই সাইয়্যেদ সাহেবের সাথী ছিলেন। সাইয়্যেদ সাহেবের কলিকাতায় অবস্থানের সময় ইমামুদ্দীন সাহেবের দাওয়াতে ৪০জন বিশিষ্ট ব্যক্তি কলিকাতায়

গিয়ে সাইয়্যেদ সাহেবের মুরীদ হন। তাঁদের অনেকেই বালাকোটের যুদ্ধে শহীদ হন।

তৃতীয় সফর

১২৪১ হিজরী মুতাবিক ১৭ জানুয়ারি ১৮২৬ সনে হযরত শহীদ রহ. এর তৃতীয় সফর শুরু হয়। এটি ছিল তাঁর জিহাদে যাত্রার সফর এবং তাঁর জীবনের শেষ সফর। তিনি তাঁর অভিযান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শুরু করার অভিপ্রায়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অভিমুখে রওয়ানা হন।

ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা

হযরত শহীদ রহ. এর কাফেলা সীমান্তে পৌঁছার পর বৃটিশ সমর্থক শিখদের সাথে লড়াই শুরু হয়। অতর্কিত কোনো পরিস্থিতিতে সামরিক শৃঙ্খলা যেন নষ্ট না হয় এবং বিজিত অঞ্চলসমূহে শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য একটি সুশৃঙ্খল সরকার গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে ১২৪২ হিজরীর ১২ জমাদিউস সানী মুতাবিক ১৩ জানুয়ারি ১৮২৬ খ্রি. সর্বসম্মতভাবে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর হাতে হাত রেখে তাঁরই ইমামত ও খিলাফতের আনুগত্যের ওপর বায়আত করানো হয়। তাঁর নামে খুতবা ও মুদ্রার প্রচলন হয়। হযরত শহীদ রহ. আমীর নির্বাচিত হওয়ার পর গোটা এলাকায় শরীয়তী ব্যবস্থাপনা চালু করে দেন। এ স্বাধীন ইসলামী খিলাফত ১৮৩১ খ্রি. পর্যন্ত টিকে ছিল।

নবগঠিত সরকারের অগ্রযাত্রায় ভীত ও শংকিত হয়ে তিনটি শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেল। তারা হল- শিখ সম্প্রদায়, স্বার্থান্বেষী পাঠান, কুটনীতিবাজ ইংরেজ। শহীদ রহ. এর ইমামত প্রতিষ্ঠার কারণে ছোট-বড় সর্দারদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব প্রায় নিঃশেষ হয় যায়। ফলে তারা তাঁকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে যান। কিন্তু পেশোয়ারের শাসক সুলতান মুহাম্মদ খানের ষড়যন্ত্রে সেখানকার কাযী ও তহশীলদারদের গণহারে হত্যা করা হয়। এতে ব্যথিত হয়ে তিনি পেশোয়ার ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে শিখেরা তাঁর গতিরোধ করে। উভয়ের মধ্যে ছোট ছোট লড়াই চলতে থাকে। অগ্রসর হয়ে হযরত শহীদ রহ. বালাকোট গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে শিখরাজা রঞ্জিত সিংহ এর ছেলে শেরসিংহ এর বিশাল বাহিনীর সাথে মুজাহিদদের মুকাবিলা হয়। অবশেষে কতিপয় সর্দাদের বিশ্বাসঘাতকতায় বিজয় শিখদের পক্ষে চলে যায়। দিনটি ছিল ১২৪৬ হিজরীর ২৪ জিলক্বদ মুতাবিক ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে শুক্রবার। যুদ্ধে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ., হযরত ইসমাঈল শহীদ রহ. সহ তিনশতাধিক মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেন। হযরত শহীদ রহ. বালাকোট প্রান্তরে নিজের বিপ্লবী খুন ঢেলে দিয়ে বিপ্লবের যে রক্তপিচ্ছিল পথ দেখিয়ে গেছেন, এ দেশের নব্য বিপ্লবীদের শিরায়-উপশিরায় প্রবাহিত খুন আজও সে পথের সন্ধান করে।

বাংলায় জিহাদী আন্দোলন

হাজী শরীয়ত উল্লাহ রহ.

হযরত শাহ আব্দুল আযীয রহ. এর দারুল হরব ঘোষণায় প্রভাবিত হয়ে হাজী শরীয়তউল্লাহ বঙ্গদেশকে দারুল হরব ঘোষণা দেন। যেহেতু দারুল হরবে জুমা ও ঈদের নামাজের বিধান নেই, একারণে তিনি এদেশে ঈদ ও জুমার নামাজ বিধি

সম্মত নয় বলে ফতওয়া প্রদান করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৭৮১ খ্রিস্টাব্দে বর্তমানে মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার বাহাদুরপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮ বছর বয়সে হজ্ব করতে গিয়ে দীর্ঘ ২০ বছর আরব দেশে অবস্থান করে শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। ১৮১৮ সালে দেশে ফিরে স্বদেশের মানুষের হিদায়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী আদর্শের পূর্ণ বাস্তবায়ন, নির্যাতিত মানুষের মাঝে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ , পরাধীনতার শৃংঙ্খল থেকে মুসলমানদের মুক্তকরণই ছিল তাঁর মিশনের মূল উদ্দেশ্য। ইসলামের যে সকল ফরজ বিধান মানুষ ছেড়ে দিয়েছিল, সেগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে তিনি অধিক গুরুত্বারোপ করতেন। এজন্য তাঁর আন্দোলন 'ফরায়েজী আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর অব্যাহত কর্মতৎপরতার ফলে সারা দেশের মুসলমানদের মাঝে নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। ১৮৪০ সালে এই সমাজ সংস্কারক মর্দে মুজাহিদ ইন্তেকাল করেন।

শহীদ তিতুমীর রহ.

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর আন্দোলনের বঙ্গদেশীয় অঞ্চলের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন শহীদ তিতুমীর রহ.। জমিদার ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও নারিকেলবাড়িয়ায় তাঁর ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছেন। ১৭৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলায় শহীদ তিতুমীরের জন্ম হয়। ১৮২২ সালে তিনি মক্কায় হজ্ব করতে যান। সেখানে তিনি স্বাধীনতার অন্যতম পথপ্রদর্শক সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর কাছ থেকে জিহাদী চেতনার দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৭ সালে তিনি দেশে ফিরে এসে জনগণকে স্বাধীনতার পক্ষে উজ্জীবিত করতে থাকেন। মুসলমানদের ঈমান ও আমলের হিফাজতের জন্য একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। দলে দলে লোক তাঁর এই চেতনাকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ হয়। তিতুমীর চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ফরিদপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। মিসকীন খাঁকে প্রধানমন্ত্রী ও গোলাম মাসুদ খাঁকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করা হয়। ইসলামী রাষ্ট্রের হেফাজতের জন্য ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে ২৩ অক্টোবর বারসাতের কাছে নারিকেলবাড়িয়ায় তারা বাশেঁরকেল্লা নির্মাণ করেন। স্থানীয় জমিদার ও বৃটিশ বাহিনীর সাথে শহীদ তিতুমীরের কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। ১৮৩৯ সালের ১৪ নভেম্বর ইংরেজদের সাথে চূড়ান্ত লড়াই হয়। তিতুমীর তাঁর বাহিনীসহ একমাত্র অস্ত্র বাশেঁর লাঠি নিয়ে ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ইংরেজদের কামানের গোলায় তাঁর বাঁশেরকেল্লা বিধ্বস্ত হয়ে যায়। ১৪ নভেম্বর তিতুমীর ও তাঁর চল্লিশ জন সহচর শহীদ হন। তাঁর বাহিনীর প্রধান গোলাম মাসুদকে ফাঁসি দেওয়া হয়। মহান শহীদ তিতুমীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করেছেন, কিন্তু আপোষ করেননি।

বালাকোট পরবর্তী আন্দোলন

বালাকোট ময়দানে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. ও হযরত ইসমাইল শহীদ রহ. এর শাহাদাত বরণ করার পর এ আন্দোলনের কর্মী বাহিনী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। তখন আন্দোলন তিনটি কেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়। দিল্লীতে ছিল মূলকেন্দ্র, এর নেতৃত্ব ছিল শাহ ইসহাক রহ. এর ওপর। তাঁর হিজরতের পর শাহ আব্দুল গনী

রহ., এরপর মাওলানা মামলুক আলী রহ., তারপর হাজী ইমদাদউল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এই কেন্দ্রে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল পাটনায়, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী ও ফরহাত আলী রহ.। আরেকটি কেন্দ্র সিত্তানা দূগর্কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা ফয়েজ আলী, ইয়াহইয়া আলী ও আকবর আলী প্রমূখ।

সিপাহী-জনতার বিপ্লব

এসকল কেন্দ্র থেকে ইংরেজবিরোধী গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চলতে থাকে। সারা দেশে ইংরেজশাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ দানা বাঁধতে থাকে। বিদ্রোহের এ চেতনা সেনাবাহিনীতেও সম্প্রসারিত হয়। ফলে ১৮৫৭সালে সিপাহী-জনতার বিপ্লব সংগঠিত হয়। মূলত ১৮৫৭ সালের বিপ্লব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিলনা। বালাকোটের চেতনায় এ বিপ্লব সংগঠিত হয়। উলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। প্রখ্যাত লেখক সত্যেন সেন বলেন-'বস্তুত পক্ষে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে থেকেই স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীর সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ সাল হতে অর্ধ শতাব্দী ধরে বৃটিশের বিরুদ্ধে যে জিহাদ চালিয়ে আসছিলেন, তাকে অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলতে হবে।' সিপাহী বিপ্লবের সময় নিম্নের শ্লোগান খুবই প্রিয় ছিল "খালকে খোদা, মুলকে বাদশাহ, হুকুমতে সিপাহী"। ১৮৫৭ সালের ইংরেজবিরোধী এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মূলত দুইটি কেন্দ্র থেকে। এর একটি ছিল দিল্লীর সন্নিকটে থানাভবনে আর অপরটি ছিল আম্বালায়। থানাভবনের নেতৃত্বে ছিলেন হাজী ইমদাদউল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী রহ. ও কাসেম নানুতবী রহ.। তাঁরা সে অঞ্চলে একটি স্বাধীন সরকারের ঘোষণা দেন। হাজী সাহেবকে আমীর, রশীদ আহমদকে প্রধান বিচারপতি ও কাসেম নানুতবী রহ. কে প্রধান সেনাপতি করে এ সরকারের অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ইংরেজদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে এই ইসলামী রাষ্ট্র টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। কানপুরে আহমদ শহীদ রহ. এর অন্যতম খলীফা মাওলানা আযীমুল্লাহ খাঁনের নেতৃত্বে স্বাধীন সরকারের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৮৫৭ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকার লালবাগে সিপাহী-জনতা সম্মিলিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এভাবে সারা ভারতবর্ষজুড়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ সংগঠিত হয়। কিন্তু ইংরেজদের বিশাল সৈন্যবাহিনী, অত্যাধুনিক মরণাস্ত্র ও দেশীয় গাদ্দারদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ অভ্যুত্থান সফল হয়নি। বিদ্রোহ দমনের পর ইংরেজ বিদ্রোহের কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে দেখতে পেল, এ গণবিদ্রোহ ছিল মুসলমানদের আন্দোলন, আর এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আলেম সমাজ। সুতরাং শুরু হল আলেম-ওলামা ও মুসলমান নিধনের অভিযান। ১৮৫৭ সালের ১৮ নভেম্বর দিল্লীর জামে মসজিদের আঙ্গিনায় এক দিনেই ২৭ হাজার মুসলমানকে শহীদ করা হয়। প্রতিদিন হুগলী নদীর স্রোতে হাজার হাজার মুসলমানের লাশ ভেসে যেতো। আর নরপিচাশ ইংরেজরা উদ্যানে বসে মুসলমানের লাশ দেখে আনন্দ উপভোগ করতো। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে দু'লাখ মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে আলেমদের সংখ্যাই ছিল ৫১,৫০০। শেরশাহ গ্রান্ড ট্রাংক রোডের এমন কোন বৃক্ষ ছিলনা যেখানে শহীদদের লাশ ঝুলিয়ে রাখা হয়নি। আলেম কাউকে দেখলেই

নির্বিচারে হত্যা করা হত। আলেম-উলামা নিধনের এই অভিযানের কারণে নেতৃত্ব দেওয়ার মত আলেমতো দূরের কথা, কাফন-দাফনের মত কোন আলেম খুঁজে পাওয়া যেতনা। সুতরাং স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন লোক তৈরীর পরিকল্পনার ভিত্তিতে শুরু করা হয় একাডেমিক আন্দোলন। প্রতিষ্ঠা করা হয় দারুল উলুম দেওবন্দ। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ৩০ মে মুতাবিক ১২৮৩ হিজরীর ১৫ মহররম, ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক স্থানে সাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গণে ডালিম গাছের ছায়ায় হযরত কাসেম নানুতবী রহ. প্রতিষ্ঠা করেন দারুল উলুম দেওবন্দ। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে দারুল উলুমের প্রথম ছাত্র, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. বলেন, '১৮৫৭ সালের ব্যর্থতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল'। এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তালীমের পাশাপাশি একটি বিরাট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও এ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পিছনে বলিষ্ঠভাবে কাজ করেছে।

শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ.

১৮৫৭ সালের সাময়িক বিপর্যয়ের পর হযরত নানুতবী রহ. আন্দোলনের গতিধারা পরিবর্তন করেন। নানুতবী রহ. এর ভাষায়ঃ 'ময়দানের আন্দোলনকে আমি প্রতিষ্ঠানের নিরাপদ পোষাকে আচ্ছাদিত করেছি।' যোগ্য ব্যক্তি তৈরীর যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী রহ. হলেন তাঁর প্রথম ফসল। হযরত নানুতবী রহ. এরপর তিনি আযাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। দারুল উলুম দেওবন্দের হাদিসের মসনদ থেকে এ সিংহ পুরুষ গোটা আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করেন। আন্দোলনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও অবিচলতা এত বেশী ছিল যে, 'তিনি বলতেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করাকে আমি আমার ঈমানের অংশ মনে করি।' শায়খুল হিন্দ সম্পর্কে ইংরেজ গভর্নর স্যার স্পিনস্টন বলেছিলেন 'এই ব্যক্তিকে যদি পুড়ে ছাই করা হয়, তাহলে তার দগ্ধ ছাইগুলো পর্যন্ত এমন গলিতে যাবেনা যেখানে কোন ইংরেজ বাস করে।'

শায়খুল হিন্দ রহ. এর রাজনৈতিক তৎপরতা

তৎকালিন পরিবেশ-পরিস্থিতি বিবেচনায় শায়খুল হিন্দ রহ. সর্বাত্মক আন্দোলন পরিচালনার জন্য তিনটি মূলনীতি নির্ধারণ করেন। এক. উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। দুই. সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ। তিন. প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জন্য নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি পালনের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা। তিনি আন্দোলন পরিচালনার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

১. দারুল উলুম দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে সেক্রেটারী করে ১৯০৯ সালে জমিয়াতুল আনসার নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলেন।

২. আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে কোরআনের জীবনাদর্শের সাথে পরিচিত করে তোলার জন্য এবং ইসলাম সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা দূর করে আন্দোলনের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজে লাগানোর জন্য ১৯১৩ সালে নাযযারাতুল মা'আরিফ নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

৩. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও শায়খুল হিন্দের তৎপরতা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সালে শুরু হয়ে ১৯১৮ সাল নাগাদ চলতে থাকে। এ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে গোটা বিশ্ব দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বৃটেনের মিত্রশক্তি ছিল ফ্রান্স, ইটালী, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া ও জাপান, অন্যদিকে কেন্দ্রীয়শক্তি হিসেবে তাদের বিপরীতে ছিল জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। পরিস্থিতির বিচারে শায়খুল হিন্দ রহ. ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজদের বিতাড়নের ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আফগান সরকারের সাথে আলাপ-আলোচনার জন্য মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে আফগানিস্তান প্রেরণ করেন এবং তুর্কি সরকারের সাথে আলোচনা করার জন্য নিজেই হিজাযের পথে রওয়ানা হন। সিন্ধি রহ. কাবুলে পৌঁছার পর একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠন করা হয়। তিনি অস্থায়ী সরকারের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মনোনীত হন।

রেশমী রুমালের ঘটনা

এদিকে শায়খুল হিন্দ রহ. মাওলানা খলীল আহমদ সাহরানপুরী রহ. কে সাথে নিয়ে ১৯১৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তুরস্কের উদ্দেশ্যে হিজাযের পথে রওয়ানা হন। হিজায তথা মক্কা-মদীনা তখন তুর্কি খিলাফতের অধীনে ছিল। হেজায পৌঁছে তিনি জানতে পারেন, তুর্কী সরকারের যুদ্ধমন্ত্রী আনোয়ার পাশা রওযা মুবারক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসছেন। অতএব তাঁর তুরস্কে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কিছু দিন পরে আনোয়ার পাশা মদীনায় আসলে শায়খুল হিন্দ রহ. তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। পাশা তাঁকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তাঁদের মাঝে এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শায়খুল হিন্দ রহ. পাশার কাছ থেকে আফগান সরকারের জন্য একটি চিঠি লেখিয়ে নেন। যার মর্ম ছিল এরূপ যে, 'আফগান সরকারের সম্মতি থাকলে ১৯১৭ইং সালের ১৯ ফেব্রয়ারী তুর্কি বাহিনী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ-ভারত আক্রমণ করবে এবং ভারতের অভ্যন্তরেও বিদ্রোহ ঘটবে।' এ পত্রটি মাওলানা হাদী হাসান হিজায থেকে বহন করে আফগানিস্তানে অবস্থানরত অস্থায়ী ভারত সরকারের কাছে পৌঁছে দেয়। কাবুলে অবস্থানরত মাওলানা সিন্ধি রহ. আফগান সরকারের সাথে সাক্ষাত করে এবং তাদের মাঝে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মাওলানা সিন্ধি চুক্তির ভাষ্যটি আরবিতে রূপান্তর করে একটি রেশমী রুমালে সুতার সাহায্যে অংকিত করে শায়খুল হিন্দের নিকট পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। এই অভিনব পদ্ধতি অবলম্বনের কারণ ছিল বৃটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কড়া তল্লাশি এড়ানো। কিন্তু পথিমধ্যে আফগান আমীর হাবিবুল্লাহ খানের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরেজদের নিকট তা ফাসঁ হয়ে যায়।

শায়খুল হিন্দের গ্রেফতারী

শায়খুল হিন্দ রহ. যখন হিজাযে পৌঁছেন তখন তা তুর্কি খিলাফতের অধীনে ছিল। কিন্তু ইংরেজরা আরব জাতীয়তাবাদের ধোঁয়া তোলে শরীফ হোসাইন নামে এক ব্যক্তিকে তুর্কি খিলাফতের বিরুদ্ধে দাঁড় করায়। ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯১৬ সালে ১০ জুন তুর্কি খিলাফতের অবসান ঘটিয়ে শরীফ হুসাইন হেজাযের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ইংরেজদের নির্দেশে শায়খুল হিন্দ রহ. কে মদীনা থেকে গ্রেফতার করা হয়। সেখান থেকে হযরত মাদানীসহ তাঁকে ১৯১৭ সালের ১৭ ফেব্রয়ারী ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ মাল্টায় নির্বাসনে পাঠানো হয়। দীর্ঘ তিন বছর চার মাস মাল্টায় অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে বন্দী জীবন কাটিয়ে ১৯২০ সালের ২০ মার্চ মাল্টা

থেকে ছাড় পেয়ে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। স্বদেশের আযাদী চেতনা তাঁর এতই প্রবল ছিল যে, জাহাজ থেকে নেমেই তিনি খিলাফত কনফারেন্সে যোগ দেন।

খিলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের প্রতিষ্ঠা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তুরস্কের খিলাফতের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা এবং তুরস্কের সাহায্যে মুজাহিদ প্রেরণ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে উৎখাত করে স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহরের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় খিলাফত আন্দোলন। আর ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার নিশ্চিত করা ও বৃটিশ বিতাড়নে উলামায়ে কিরামের তৎপরতাকে বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যেও ১৯১৯ সালের ২৮ ডিসেম্বর সর্ব ভারতীয় উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত হয় জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ। শায়খুল হিন্দ রহ. জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি খিলাফত ও জমিয়তের সাংগঠনিক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। কিন্তু দীর্ঘ কারাভোগের কারণে তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১৯২০ সালের ৮ ডিসেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন।

শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ রহ.

শায়খুল হিন্দ রহ. এর ইন্তেকালের পর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন তাঁরই হাতে গড়া হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.। তিনি ১৮৭৯ ইং মুতাবিক ১২৯৬ হিজরীতে ভারতের ফায়জাবাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতাপিতা উভয়েই হযরত হুসাইন রা. এর বংশধর ছিলেন। হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. হিজরী ১৩১৫ সালে দেওবন্দ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এসময় তাঁর পিতা ইংরেজদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সপরিবারে মদীনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন। হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী মদীনায় যাওয়ার পূর্বে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. এর কাছে বায়আত এবং তাঁর থেকে খিলাফত লাভ করেন। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. মদীনায় পৌঁছলে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী তাঁর সাথে আন্দোলনী তৎপরতায় যুক্ত হন এবং শায়খুল হিন্দের সাথে স্বেচ্ছায় মাল্টায় কারাবরণ করেন। হযরত শায়খুল হিন্দের পর হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী এ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা আন্দোলন সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তিনি ১৯২১ সালের করাচীতে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে ঘোষণা করেন 'বৃটিশ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা সম্পূর্ণ হারাম'। এ ফতওয়া ছাপিয়ে সারাদেশে প্রচার করা হয়। এ ফতওয়ার কারণে ১৮ সেপ্টেম্বর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯২৩ সালে তিনি জেল থেকে মুক্ত হন। ১৯২৩ সালে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন। এর ছয় বছর পর ভারতীয় কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করে। ১৯২৭ সালে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. সর্বপ্রথম সাইমন কমিশন বর্জনের ডাক দেন। কংগ্রেস তা বর্জন করে ১৯২৯ সালে। ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইনে' নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হলে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ মুসলিম লীগের সাথে নির্বাচনী ঐক্য গড়ে তোলে। 'বৃটিশ-তোষা সামন্ত শ্রেণীর লোকদের প্রাধান্য দেওয়া হবেনা এবং ধর্মীয় যে কোন ব্যাপারে জমিয়তে উলামার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত ' এ শর্তে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী মুসলিম লীগকে সমর্থন করেন। কিন্তু নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার পর মি. জিন্নাহ শর্ত ভঙ্গ করেন। তখন জমিয়তে উলামা মুসলিম লীগ

থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।

পাকিস্তান প্রস্তাব

১৯৪০ সালের ২২,২৩,২৪ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সম্মেলনে মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবশ্য নবুয়তী আদর্শের আলোকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলা ছিল উলামায়ে কিরামের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। মাওলানা আব্দুল মজিদ দরিয়াবাদী রহ. বলেন: '১৯২৮ সালের জুন মাসে আমি হযরত থানভী রহ. এর খিদমতে হাজির হলে তিনি বলেন, নির্ভেজাল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ছাড়া এদেশে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার করা সম্ভাব নয়। এ লক্ষ্য অর্জনে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখণ্ড ও একজন আমিরুল মুমেনীন প্রয়োজন।' এ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত থানভী রহ. পাকিস্তানের একজন স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বরে চৌধুরী রহমত আলীও মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির দাবী জানান। ১৯৩০ সালের ২৯ ডিসেম্বর এলাহবাদে অনুষ্ঠিত অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের এক জনসভায় সভাপতির ভাষণে ড. ইকবালও মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমির দাবী জানান।

বিভক্ত ও অবিভক্ত ভারত প্রশ্নে উলামাদের বিভক্তি

হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. এর ওফাতের পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত উলামায়ে কিরাম একই সঙ্গে আন্দোলন করে আসছেন। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের দুই বছর পূর্বে আন্দোলনের দুই সিপাহসালার মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর মধ্যে পাকিস্তান সমর্থন করাকে কেন্দ্র করে বিভক্তির সূচনা হয়। ১৯৪৫ সালের ২০-২৯ শে অক্টোবর কলিকাতার মুহাম্মাদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পাকিস্তান সমর্থক আলেমদের সমন্বেয়ে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' গঠিত হয়। মূলত: উলামায়ে কিরাম পাকিস্তান প্রস্তাবকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ভেবে আবেগময় চেতনা নিয়ে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়। ১৯৪৫ সালের ২৬ অক্টোবর মাওলানা জাফর আহমদ ওসমানী রহ. এক নির্বাচনী বক্তৃতায় বলেন, 'যদিও বর্তমানে সমগ্র ভারতবর্ষকে ইসলামী হুকুমতের আওতায় আনা মুশকিল তবুও অন্তত যে সকল প্রদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেগুলোতে ইসলামী শাসন চালু করা আবশ্যক।' ১৯৪৫ সালের ৩রা নভেম্বর কলিকাতায় 'আসরে জাদীদ' পত্রিকায় মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর একটি বক্তৃতা ছাপা হয়। তাতে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান প্রস্তাব হল কেবল একটি প্রাথমিক উদ্যোগ, ইসলামী হুকুমত পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা হওয়া হল এর শেষ গন্তব্য।' এ সকল বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্যই মূলত উলামায়ে কিরাম পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেন। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এই আবেগময় প্রেরণা নিয়ে তাঁরা সারা দেশের মানুষকে পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনে মুসলিম লীগকে ভোট দেওয়ার আহবান জানায়। আলেমদের সমর্থন ও নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তাদের সমর্থনে নির্বাচনে মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ফলে ১৯৪৭ সালের ৩রা জুন মাউন্টব্যাটেন পাকিস্তান প্রস্তাব

মেনে নিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করেন। পরিস্থিতির চাপে ১৪ জুন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদ থেকেও মুসলিম লীগের প্রস্তাব সমর্থন করা হয়। অবশেষে টু নেশন থিওরী বা দ্বি-জাতি তত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান এ কারণে বাংলাদেশ ভৌগলিক দিক থেকে ভারতের নিকটবর্তী হওয়া সত্বেও পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার শুভলগ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিতে প্রথম পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেন মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী আর পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় পতাকা উত্তোলন করেন মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী।

হযরত মাদানী রহ. এর দৃষ্টিভঙ্গি

হযরত মাদানী রহ অবিভক্ত ভারতের পক্ষে অবস্থান নেন। হযরত মাদানী রহ এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- প্রথমত: মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয়েও এদেশের শাসন ক্ষমতায় টিকে ছিল প্রায় সাতশত বছর। ইতোমধ্যে মুসলমানরা এদেশে তাদের আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু ইংরেজরা তাদের এই ক্রমাগ্রগতির পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং এদেরকে উৎখাত করা হলে মুসলমানরা আবার তাদের পূর্বাবস্থানে ফিরে আসতে পারবে। দ্বিতীয়ত: গুটি কতক অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে অবশিষ্ট অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা মুসলমানদের ভবিষ্যত দূর্দশা চরমে পৌঁছবে এবং শত শত বছরের প্রচেষ্টার ফলে গোটা ভারতজুড়ে ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের যে সুউচ্চ সৌধ নির্মিত হয়েছে তা ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। এজন্য তিনি অবিভক্ত ভারতের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

তাৎপর্যপূর্ণ পরিণাম

দেশ বিভক্তির এই কঠিন মূহুর্তে হযরত থানভী রহ. এর ইশারা এবং হযরত মাদানীর অটল অবস্থান ছিল অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। একটি প্রবাদ আছে- 'আন্দোলন স্রোতের ন্যায় নিজেই নিজের পথ তৈরী করে নেয়।' ১৯৪৫ সালে পাকিস্তান কায়েমের বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। এই মূহূর্তে পাকিস্তান আন্দোলনে আলেমগণ জড়িত না থাকলে মুসলিম প্রধানদেশ পাকিস্তানের পরবর্তী রাজনীতি আলেমগণের নেতৃত্বহীন হয়ে পড়তো। অন্যদিকে যেহেতু অনিবার্য কারণে বহুসংখ্যক মুসলমান ভারতেই থেকে যাবে, কাজেই মুসলমানদের পৃথক হওয়ার পর ভারত তাদের জন্য হবে সম্পত্তি নিয়ে যাওয়া মায়ের বাবার বাড়ি তুল্য। অতএব, বলা যায় বিভক্তি ও অবিভক্তির প্রশ্নে কারোর সিদ্ধান্তই তাৎপর্যবিহীন নয়। উভয়েই আমাদের সম্মানিত আকাবির। আল্লাহ তাঁদেরকে এবং সকল আকাবিরকে উত্তম জাযা দান করুন, আমীন।

৪৭ এর পরবর্তী প্রেক্ষাপট

উলামায়ে কিরামের নেতৃত্বে মুসলমান জনসাধারণের সর্বাত্মক আন্দোলনে পাকিস্তান স্বাধীন হলো। কিন্তু তাঁদের প্রাণের দাবী ইসলামী হুকুমত কায়েম হয়নি। মুসলিম লীগ ওয়াদা ভঙ্গ করলো। 'এ যুগে ইসলামী হুকুমত কায়েম করা কি সম্ভব ? ইসলামপন্থীরা এত ফেরকায় বিভক্ত, আমরা কোন ইসলাম কায়েম করবো?' এধরনের প্রশ্ন সামনে এনে টালবাহানা শুরু করে। তখন পাকিস্তানের সকল মত ও পথের উলামায়ে কিরাম ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৫১ সালে ইসলামী শাসনতন্ত্রের ২২ দফা

মূলনীতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহায় তার বাস্তবায়ন হয়নি। মুসলিম লীগের ওয়াদা খেলাফের কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে উলামায়ে কিরাম মুসলিম লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেন। মাওলানা ভাসানীর আওয়ামী লীগ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও মাওলানা আতহার আলী রহ. এর নেযামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামসহ কয়েকটি দলের সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার নির্বাচনি ইশতেহারের নীতি ঘোষিত হয়েছে এভাবে- 'কোরান ও সুন্নার নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হবেনা এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।' নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয় হয়। লীগের পরাজয় সর্ম্পকে প্রখ্যাত রাজনীতিক মরহুম অলি আহাদ তার 'জাতীয় রাজনীতি ১৯৫৪ থেকে ৭৫' বইয়ে লেখেন-'১৯৪৫ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের মূল কারণ খোলাফায়ে রাশেদীনের পদাংক অনুসরণ করিয়া ইসলামী অনুশাসন মুতাবিক রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রকে রূপায়িত করিবার ওয়াদার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা।' ১৯৫৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়। তাতে কিছু ইসলামী ধারা থাকলেও ইসলাম বিরোধী কিছু আইনও ছিল। ফলে তাকে ইসলামী শাসনতন্ত্র বলা যায়না। ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইস্কান্দার মির্যা সারাদেশে সামরিক শাসন জারী করেন। ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইউব খান ক্ষমতা দখল করে ৫৬ এর শাসনতন্ত্র বাতিল করেন। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন উঠানোর পর পুনরায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের আলিমগণ ইসলামী শাসনতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৬৪ সালে আইউব খান সারাদেশে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করে। নিবার্চনে আইউব খানের বিপরীতে মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করানো হয়। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ নিবার্চনে আইউব খান কিংবা ফাতেমা জিন্নাহ কাউকে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সমর্থনযোগ্য নয় বিবেচনা করে নিজেদের পক্ষ থেকে একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যদিকে 'নিবার্চনে জয়ী হলে ফাতেমা জিন্নাহ নেতৃত্ব থেকে সরে যাবেন এবং ইসলামী শাসনতন্ত্র বাস্তবায়ন করবেন' এই শর্তদ্বয়ের ভিত্তিতে নেযামে ইসলাম পার্টি মুসলিম লীগকে সমর্থন জানায়। নির্বাচনে যেভাবেই হোক আইউব খান বিজয়ী হন। কিন্তু ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন। ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ ইয়াহইয়া খাঁন সামরিক শাসন জারী করেন এবং ৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দেন। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি বিজয়ী হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আসন ছিল ১৬৯ টি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে ছিল ১৪৪ টি, আওয়ামী লীগ ১৪৭টি আসন পায় ও ভুট্টোর পিপলস পার্টি ৮৮টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যেহেতু একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে অতএব তাদের সরকার গঠন করাটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু জেনারেল ইয়াহইয়া ও ভুট্টোর হটকারী সিদ্ধান্তের অনিবার্য পরিণতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য উদিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা

প্রশ্নে উলামায়ে কিরামের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়। যেসব আলেম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর অবিভক্ত ভারতের পক্ষে ছিলেন, তারাসহ অনেক আলেম ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় অবস্থান নেন। তবে 'একটি মুসলিম রাষ্ট্র দ্বি-খণ্ডিত হোক আর ভারত এর থেকে ফায়দা লুটুক' এ আশংকায় অনেকে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয় ছিলেন। অন্যদিকে জামায়াত ও তাদের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রসংঘ' রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি নামে পাকিস্তানী জালেমদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। মুক্তিযুদ্ধে আলেমদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে এর নেতৃত্ব চলে যায় ইসলাম বিরোধীদের হাতে। এক পর্যায়ে তারা মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের বিপক্ষে দাঁড় করায়। এটাকে তারা আদর্শিক লড়াই বলে চালিয়ে দিতে চায়। অথচ, পাকিস্তানিদের সঙ্গে আমাদের কোন আর্দশের লড়াই ছিলনা। ছিল অধিকার আদায়ের লড়াই, ভাষার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, চাকরি-ব্যবসায় সমতার অধিকার। ৭১ সালে আমাদের সংগ্রাম ছিল পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য, ইসলাম থেকে নয়।

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.

স্বাধীনতার পরে এদেশের ইসলামপন্থীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। মসজিদ-মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ বিভিষিকাময় পরিস্থিতিতে ইসলামী রাজনীতিতে দীর্ঘকালের স্থবিরতা চলে আসে। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসার মধ্য দিয়ে এ স্থবিরতা কাটতে শুরু করে। রাজনীতিতে যে বিরাট শূন্যতা বিরাজ করছিল হযরতের দ্বারা তা পূর্ণ হয়েছিল।

নাম ও বংশ পরিচয়

হযরত মুহাম্মাদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর রহ. লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর থানাধীন লুধুয়া গ্রামে ১৩১৩ হিজরী মুতাবিক ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা মরহুম মিয়াজী আকরাম উদ্দীন সাহেব ছিলেন সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা ইমাম উদ্দিন বাঙ্গালী রহ. এর খলীফা।

মৌলিক কর্মসূচী

১.তালীম-তারবিয়াত ২.তাযকিয়া ৩.দাওয়াত ৪.জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ।

হযরতের প্রথম কর্মসূচি ছিল দেশের সর্বত্র ইসলামী শিক্ষার বিস্তার। কারণ দীনি শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির মাঝে জিহাদী চেতনা সৃষ্টি হয়না। এজন্য তিনি জনগণের মাঝে জিহাদী প্রেরণা সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে একটি সফল ইসলামী বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে দেশের সর্বত্র মাদরাসা কায়েমে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচি ছিল তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধির কর্মসূচি। এর মাধ্যমে তিনি ইসলামী আন্দোলনের পরিশুদ্ধব্যক্তি তৈরীর কাজ আঞ্জাম দেন। হযরতের তৃতীয় কর্মসূচি ছিল দাওয়াত-তাবলীগ। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতী সফরের মাধ্যমে জনসাধারণের মাঝে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁর চতুর্থ কর্মসূচি ছিল জিহাদ ও আন্দোলন।

রাজনৈতিক কার্যক্রম

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.এর রাজনৈতিক কার্যক্রমকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১.পরোক্ষ কার্যক্রম। ২.প্রত্যক্ষ কার্যক্রম।

পরোক্ষ কার্যক্রম

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. ১৯৭৮ সালের ২৯ মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি প্রেসিডেন্টের নিকট ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। এরপর ১৯৮৩ সালের ৭ ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এরশাদের কাছে পত্র প্রেরণ করেন।

প্রত্যক্ষ কার্যক্রম

হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. যখন বুঝলেন, বর্তমান শাসকদের মাধ্যমে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। তখন তিনি নিজেই ময়দানে নেমে আসেন। ১৯৮১ সালের ২৯ জুলাই উলামা সমাবেশ আহবান করেন। সেখানে আসন্ন নির্বাচনে অংশ নেওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা পূর্বক বলেন, স্বাধীন পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা হবে, এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমাদের পূর্বসূরী আলেমগণ স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা তাঁদের সাথে প্রতারণা করে। অতএব, এখন আমাদেরকে ইসলামী শাসন কায়েমের লক্ষ্যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। দেশে নির্বাচন আসন্ন। আমার মতে, আলিম সমাজ ও ইসলামী শক্তিগুলোর আগামী নির্বাচনে সম্মিলিতরূপে প্রার্থী মনোনীত করে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার এবং এটা ফরজ কর্তব্য। উলামা সমাবেশে আলোচনা-পর্যালোচনার পর হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোর সিদ্ধান্ত হয়। ১৯৮১ সালের ২৮ আগস্ট হযরত নির্বাচনে অংশ নেয়ার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। অতপর ৮১ সালের ১৫ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। হাজারো অপপ্রচার , জালিয়াতি ও ব্যালট ডাকাতি সত্বেও হযরত প্রায় চার লাখ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। নির্বাচনের পর ৮১ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক শায়েস্তাখান হলে কর্মী সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ খিলাফত আন্দোলন' নামে নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা কামিয়াব। কারণ, অতীতের ভুল পাত্রে ভোট দিয়ে আমরা যে গুনাহ করেছি এবারের ঠিক পাত্রে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে তা মোচন করেছি। দুর্ভাগ্যবশত এবারো যারা পারেনি, তাদের তওবার সুযোগ দানের জন্য এ আন্দোলনের সৃষ্টি।' তিনি আরো ঘোষণা করলেন, 'ইবলিসী খিলাফত উৎখাত করে আল্লাহর খিলাফত কায়েমের জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়। এ জিহাদে আমি শহীদ হলে আমার লাশ নিয়ে তোমরা এগিয়ে যেয়ো।' হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. খিলাফত আন্দোলন প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নবযাত্রা শুরু করেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে হযরত তাঁর আন্দোলনকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেননি। তবে আশার কথা হলো, হযরত যে আন্দোলন শুরু করেছেন তার শেষ এখনো হয়নি। সময়ের ব্যবধানে আন্দোলনের নামের পরিবর্তন হয়েছে, হয়েছে কৌশলের পরিবর্তন, কিন্তু মৌলিক কর্মসূচি অপরিবর্তি থেকে আন্দোলন তার লক্ষ্যপানে এগিয়ে যাচ্ছে। নতুন নামে পরিবর্তিত কৌশলে মৌলিক কর্মসূচি অক্ষুন্ন রেখে ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরই একান্ত শাগরিদ বিপ্লবের ঘনিষ্ট সহযোগী সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.। মূলত; হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এদেশে ইসলামী বিপ্লবের

একটি প্ল্যান তৈরী করেছেন। আর হযরত পীর সাহেব রহ. সে প্ল্যান অনুযায়ী বিপ্লবের ভীত তৈরী করেছেন। বর্তমান মুহতারাম আমীর সেই ভীতের ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করছেন। ইনশাআল্লাহ, অচিরেই সে প্রাসাদের ওপর ইসলামী হুকুমতের পতাকা উড়বে।

সৈয়দ ফজলুল করীম রহ.

হযরত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. নদী বিধৌত বরিশাল জেলার কীর্তনখোলা নদীর কোলঘেষা চরমোনাই গ্রামে ৯ ভাদ্র ১৩৪৪ বাংলা মুতাবিক ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা-মা উভয়েই ছিলেন সৈয়দ বংশীয়। পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক রহ.ও ছিলেন প্রখ্যাত বুযুর্গ ও খ্যাতিমান পীর। পীর সাহেব চরমোনাই রহ. চরমোনাই আহসানাবাদ রশীদিয়া কামিল মাদরাসা থেকে ফাযিল পাশ করার পর ১৯৫৬ ইং সালে ঢাকার লালবাগ মাদরাসায় ভর্তি হন। এরপর ১৯৫৭ সালে কৃতিত্বের সাথে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। লালবাগ মাদরাসায় তিনি মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী রহ., হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. আল্লামা হেদায়েত উল্লাহ সাহেব রহ. আল্লামা আজিজুল হক রহ. প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসগণের কাছ থেকে হাদিসের দরস নেন। তিনি তাঁর পিতা হযরত মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মাদ ইসহাক রহ. এর হাতে বায়আত হন এবং তাঁর কাছ থেকে তরিকার খিলাফত লাভ করেন।

সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. এর কার্যক্রম

১.তালীম-তারবিয়াত ও ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার।
২.তাযকিয়া ও ইসলাহের ময়দানে তৎপরতা।
৩. দাওয়াত-তাবলীগের ময়দানে তৎপরতা।
৪.জিহাদ ও আন্দোলনের ময়দানে তৎপরতা।

তালীম-তারবিয়াত (ইসলামী শিক্ষার প্রচার-প্রসার)

সুশিক্ষাই মানুষকে আলোকিত করে, সত্যের পথ দেখায়। সুষ্ঠু সমাজগঠনের জন্য সুশিক্ষার বিকল্প নেই। সমাজ বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন জনগনের চিন্তার জগতের বিপ্লব। আর ইসলামী শিক্ষা ছাড়া চিন্তার জগতে বিপ্লব আনা সম্ভব নয়। এজন্য হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. শিক্ষার আলো সবখানে ছড়িয়ে দিতে বহুমূখী উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

(ক) শিশু-শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগ

শিশুদের প্রাথমিক ও ধর্মীয় মৌলিক শিক্ষা দানের সুদুর প্রসারী লক্ষ্য বাস্তবায়নে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বাংলাদেশ কোরআন শিক্ষাবোর্ড'। তাঁর স্বপ্ন ছিল বাংলার ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার কোরআনী মক্তব প্রতিষ্ঠা করা। আল-হামদুল্লিাহ, ইতোমধ্যেই কোরআন শিক্ষাবোর্ড হযরতের স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

(খ) কাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. উপমহাদেশের বিখ্যাত ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা-কারিকুলাম অনুযায়ী এদেশে খালেছ দীনি শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরতের অনুসরণে

তাঁর অনুসারীরা দেশের প্রায় সকল জেলা-উপজেলায় কাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার কাজ অব্যাহত রেখেছেন।

(গ) আলিয়া মাদরাসা

হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. কাওমী মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি সহশিক্ষামুক্ত আলিয়া মাদরাসা পরিচালনা করেছেন।

(ঘ) মহিলা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা

আদর্শ সমাজগঠনে নারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। যুগে যুগে আদর্শ মায়েরা আদর্শ সমাজগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. অবহেলিত নারী সমাজকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'জাতীয় মহিলা মাদরাসা।' পরবর্তীতে হযরতের উৎসাহ উদ্দীপনায় ও দিক-নির্দেশনায় তাঁর অনুসারীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন অসংখ্য মহিলা মাদরাসা।

তাযকিয়া ও ইসলাহের ময়দানে তৎপরতা

হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. রাসূল সা. এর কর্মপদ্ধতি অনুসরণে সমাজশুদ্ধির প্রাথমিক পদক্ষেপে হিসেবে ব্যক্তিশুদ্ধির কর্মসূচি হাতে নেন। তিনি চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকার মাধ্যমে ব্যক্তিশুদ্ধির কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন। তিনি তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির মাধ্যমে দীর্ঘ ৩৩ বছর চিশতিয়া সাবেরিয়া তরীকার খেদমত আঞ্জাম দেন।

দাওয়াত-তাবলীগের ময়দানে তৎপরতা

হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. দীনের একজন অক্লান্ত দায়ী ছিলেন। তিনি তাঁর গোটা জীবনটাই দীনের দাওয়াতের পথে ব্যয় করেছেন। তিনি পূর্ণাঙ্গ দীনের দাওয়াত দিতেন। তাঁর দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি সকল মানুষের উপযোগী কথা বলতেন। হযরত তাঁর ৩৪ বছরের দাওয়াতি জীবনে ১৫ হাজারেরও বেশী ইসলাহী বয়ান পেশ করেছেন।

জিহাদ ও আন্দোলনের ময়দানে তৎপরতা

হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. তরীকতের একজন পীর হয়েও দীন ইসলামকে জীবনের সকল পর্যায়ে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠার যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা অবশ্যই বিরল। তাঁর কর্মধারায় সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ. এর কর্মপদ্ধতির প্রতিফলন ঘটেছিল। হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. জিহাদ ও তাসাউফের একটিকে অন্যটির পরিপূরকরূপে গ্রহণ করেছিলেন। আর এটাই ছিল হযরত আহমদ শহীদ রহ. এর কর্মধারা। মূলত; সৈয়দ আহমদ শহীদ রহ. এর প্রভাবে চিশতিয়া সাবেরিয়া তরিকায় আত্মশুদ্ধির সাথে জিহাদের যে কর্মধারা বিদ্যমান ছিল সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. তাঁর কাজে-কর্মে তার সর্বাত্মক প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর আন্দোলন ছিল সকল ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও রাজনৈতিক ভণ্ডামির বিরুদ্ধে। তিনি দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, আটরশি, সুরেশ্বরী, মাইজভান্ডারী ও জামায়াতসহ সকল ভণ্ডের বিরুদ্ধে যেমন আজীবন সংগ্রাম করেছেন তেমনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি সহ সকল রাজনৈতিক ভন্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. যে ইসলামী হুকুমতের স্বপ্ন দেখেছেন, যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. বালাকোটে জীবন দিয়েছেন,

যার স্বপ্ন লালন করেছেন আকাবিরে উম্মাহ, হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্র জীবনেই 'নাছিরে মিল্লাত' নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ছাত্র জীবন সমাপ্ত করে তিনি 'নেযামে ইসলাম' পার্টিতে যোগ দেন। উল্লেখ্য যে, তখন তাঁর সম্মানিত পিতা সৈয়দ ইসহাক রহ. 'নেযামে ইসলাম' পার্টির সহ-সভাপতি ছিলেন। ৮১ সালের নির্বাচনে হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. এর নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। এরপর 'খিলাফত আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি নায়েবে আমীর নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে খিলাফত আন্দোলনে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হলে পীর সাহেব চরমোনাই রহ. নিরবে দূরে সরে পড়েন এবং মুজাহিদ কমিটির কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। পরে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের উদ্যোক্তারা হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ.কেও তাতে যুক্ত করেন এবং ১৯৮৭ সালে ৩রা মার্চ সংবাদ সম্মেলনে তিনিই ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ও আমীর নির্বাচিত হন। তাঁর নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন একটি শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর দাঁড়ায়। হযরতের সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতে শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বময় শাসনতন্ত্র আন্দোলন পরিচিতি লাভ করে। হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. আমৃত্যু ইসলামী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন।

হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর রাজনীতির বৈশিষ্ট্য

১. হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. নীতির পরিবর্তন চেয়েছেন, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও সাংবিধানিক পদ্ধতির পরিবর্তন চেয়েছেন। তাঁর মতে, মানবরচিত মতাদর্শ বহাল রেখে যতই নেতার পরিবর্তন ঘটানো হোক, মানবতার কাঙ্খিত মুক্তি আসতে পারেনা। কাঙ্খিত মুক্তির জন্য চাই নীতির পরিবর্তন, মানবরচিত নীতির পরিবর্তে চাই আল্লাহর দেওয়া নীতির বাস্তবায়ন। হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর নীতির পরিবর্তনের মাঝে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. এর বিপ্লবী ঘোষণার সাদৃশ্যতা রয়েছে।

২. আপোসহীন সংগ্রামী চেতনাই ছিল হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে বাতিলের সাথে কোন আপোস করেননি। উলামায়ে দেওবন্দের আপোসহীন সংগ্রামী চেতনার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে হযরতের বিপ্লবী জীবনে। আজ যখন 'এক শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য অন্য শত্রুর সাথে জোট করতে হবে' এই অসার তত্বে ইসলামী রাজনীতি তার আপোসহীন বৈশিষ্ট্য হারাতে বসেছে, তখনই হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. এর আপোসহীন ভূমিকা আমাদেরকে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ রহ. এর আপোসহীন সংগ্রামী চেতনার কথাই স্বরণ করিয়ে দেয়। হযরত শহীদ রহ. একাধারে শিখ, পাঠান, ইংরেজ এই তিন শক্তির মোকাবেলা করেছেন, কিন্তু কারও সাথেই আপোস করেননি। হযরত শহীদ রহ. এই আপোসহীন বিপ্লবী চেতনা তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. এর মাঝে প্রতিফলিত হয়েছে।

৩. হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ.এর অনুসরণে ইসলামি রাজনীতির স্বতন্ত্র গতিধারায় অগ্রসর হচ্ছেন। হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অন্য দলের লেজুড়বৃত্তির পরিবর্তে ইসলামী রাজনীতির স্বতন্ত্রধারা তৈরী করেছেন। আর হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ.

আজীবন এই নীতিতে অটল ছিলেন।

উলামায়ে দেওবন্দের যোগ্য উত্তরসূরী হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ.

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ. থেকে শুরু করে হযরত পীর সাহেব চরমোনাই রহ. পর্যন্ত এ সকল মহামনীষীর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখবো যে, তাঁদের সকলের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতি ছিল প্রায় অভিন্ন । তাঁরা সকলেই 'আত্মশুদ্ধি ও জিহাদ' এই দুটির একটিকে অন্যটির পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা সকলেই ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। আর তাদের এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে আপোষহীন। ধারায় মূলত; উপমহাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার এ ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের ধারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ., শাহ আব্দুল আযীয রহ., হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ., শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান রহ., শায়খুল ইসলাম হোসাইন আহমদ মাদানী রহ., হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ., হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. হয়ে সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. এর সাথে মিলেছে। আল্লাহর জমীনে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে এ ধারার ঐতিহ্য উপমহাদেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

পরিশেষে সকলের কাছে আহবান, যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ., যে হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য বালাকোটের ময়দানে জীবন দিয়েছেন হযরত আহমদ শহীদ রহ., যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে হযরত উলামায়ে কিরাম পাকিস্তান আন্দোলন নেতৃত্ব দিয়েছেন, যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য বুড়ো বয়সে হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. রাজনীতির কণ্টকাকির্ন পথে পা বাড়িয়েছেন, যে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য পীর সাহেব চরমোনাই রহ. বিপ্লবের দূর্গম পথ পাড়ি দিয়েছেন, সে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করি। আসুন, শহীদ তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার শপথের দ্বারা বিজয়ের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সমাপ্তি ঘটাই।

Z_¨mÎ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ -১৬তম খ. ইসলামীক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
২. সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস-৫ম খণ্ড, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী- মুহাম্মাদ ব্রাদার্স।
৩. ঈমান যখন জাগলো - সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী- মুহাম্মাদ ব্রাদার্স।
৪. সীরাতে সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ (১.২ খ.) সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী, ইফাবা।
৫. আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম- অধ্যাপক আব্দুল গফুর, জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা।
৬. দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান- মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহা. ইয়াহইয়া, কাওমী পাবলিকেশন্স।
৭. তাহরীকে দেওবন্দ- ড. মুশতাক আহমদ, শান্তিধারা প্রকাশনী।
৮. হযরত হাফেজ্জী হুজুর রহ. স্মারক গ্রন্থ, হাফেজ্জী হুজুর রহ. পরিষদ।
৯. সৈয়দ ফজলুল করীম রহ. এর জীবনী- মাওলানা মুহা. ইউনুছ আলী খান, মুজাহিদ প্রকাশনী
১০. জিহাদ ও ইসলামী আন্দোলন যুগে যুগে- মু. তাহির উদ্দিন পাটোয়ারী, মুজাহিদ প্রকাশনী
১১. খিলাফত আন্দোলন কি ও কেন- আখতার ফারুক, আল-আশরাফ প্রকাশনী।
১২. নীতির পরিবর্তন চাই- গাজী আতাউর রহমান, আই.এস.সিএ পাবলিকেশন্স।
১৩. আলোর বাতিঘর- পীর সাহেব চরমোনাই রহ., আল ফাতাহ প্রকাশনী।
১৪. জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫-অলী আহাদ, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.

.....

লেখক পরিচিতি

কেন্দ্রীয় মাদরাসা বিষয়ক সম্পাদক

cover design : ibrahim kobbadi
print : abishkar, dhaka, 01815260469